ডাক্তারী

চিকিৎসাসার

ওলাউঠা।

ঢাকার নবাব [illegible]

[illegible] ফ্যামিলি

ডাক্তার শ্রীকেদারনাথ ঘোষ

প্রণীত।

কলিকাতা।

[illegible] লেন, নবকাব্য প্রকাশ যন্ত্রে

শ্রীদীননাথ মান্না দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩০২ সাল

ভূমিকা।

পুস্তক অপেক্ষা পুস্তকের ভূমিকা লিখা আরও কঠিন। তবে মনে ভাবিলাম যে প্রকৃত কথা লিখাই ভূমিকার উদ্দেশ্য। আমরা চিকিৎসালার পুস্তকের প্রথম বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিবার সময় সমস্ত পুস্তকের বার আনা একেবারে লিখা প্রস্তুত ছিল। কিন্তু মধ্যে ওলাউঠা রোগের অতিশয় প্রাদুর্ভাব হওয়াতে আমাদিগের পুস্তকাকাঙ্ক্ষী [illegible] অনেকে স্বীয় স্বজন প্রথম খণ্ডেতে ওলাউঠার বিস্তারিত চিকিৎসা লিখিতে অনুরোধ করেন। দুর্ভাগ্য বশতঃ আমরা অন্যান্য পীড়ার কথা পূর্ব্বে লিখিয়া ছিলাম কিন্তু ওলাউঠার কথা পরে ভাল করিয়া লিখিব বলিয়া তখন লিখি নাই। যাহাহউক এইরূপ অনুরুদ্ধ হইয়া ওলাউঠার কথাই প্রথম লিখিতে বাধ্য হইলাম। এই পৃথিবীর কোন কার্য্যেই সকল লোককে সমভাবে সন্তুষ্ট করা যায় না, আমাদিগের অদৃষ্টেও তাহাই ঘটিল। যাহারা ওলাউঠার চিকিৎসার বিষয় জানিতে চাহেন, তাঁহারা আপ্যায়িত হইবেন বটে, কিন্তু এ দিগে পুস্তক প্রকাশ হইতে বিলম্ব হওয়ায় অনেক লোকে আমাদিগের প্রতি বিরক্ত হইবেন। পুস্তক প্রকাশে বিলম্ব জন্য আমরা সাধারণের নিকট দুঃখিত। কিন্তু আমরা এই মাত্র বলিতে পারি যে, এ পুস্তকের প্রথম খণ্ড প্রকাশ করিতে যেরূপ বিলম্ব হইল, পরের খণ্ড সমস্ত প্রকাশ করিতে আর এরূপ বিলম্ব হইবে না। সমস্ত পুস্তকই প্রায় লিখা প্রস্তুত আছে। এমন কি, সুযোগ হইলে মাসে মাসে এক এক খণ্ড করিয়া প্রকাশ হইতে পারিবে।

বর্ত্তমান ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ বঙ্গদেশে ওলাউঠার প্রাদু-

নহি। আমার "ডাক্তারি চিকিৎসাসার" পুস্তক খানি লিখি-বার প্রধান উদ্দেশ্য এই যে আমার ৩০।৩৫ বৎসরের চিকিৎসায় বা আমার জ্ঞানতঃ অন্যের চিকিৎসায় যে যে ঔষধ ফলপ্রদ দেখিয়াছি সেই সমস্ত ঔষধের বিষয়ই এই পুস্তকে লিখিত হইবে। ওলাউঠার হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাই উৎকৃষ্ট, অন্য প্রকার চিকিৎসায় কেবল অনিষ্ট উৎপাদন করে, সেই জন্যই ওলাউঠার কেবল হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাই লিখিলাম। ফলতঃ এই পুস্তকে হোমিওপ্যাথি ঔষধ ও আছে, য়্যালপ্যাথি ঔষধও আছে, কবিরাজীও আছে, হেকেমিও আছে, গিন্নিগুন্নিদের টোটকা ঔষধও আছে, এমন কি, স্বপ্নাদিষ্ট ঔষধের কথা ও ভাল হইলে এ পুস্তকে উপেক্ষা করা হয় নাই। যে প্রকার পুস্তক অনেক আছে সেরূপ পুস্তক লিখা বা চর্ব্বিত চর্ব্বণ করা আমার চিরসংস্কারের বহির্ভূত কার্য্য। যাহা নাই তাহাই পৃথিবীতে আবশ্যক, যাহা অনেক আছে তাহার তত আবশ্যক নাই, তত আদরও নাই। বাস্তবিক এরূপ পুস্তক যদি আর একখানি থাকিত, তাহা হইলে আমার এই বৃদ্ধ বয়সে এ দুরূহ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার কোন কারণই ছিল না।

এ পুস্তক লিখিতে য়্যালপ্যাথি হোমিওপ্যাথি, ইত্যাদি বহুবিধ পুস্তক অধ্যয়ন করিতে হইয়াছে। এই সকল পুস্তকের নাম এ স্থলে উল্লেখ অনাবশ্যক। তবে আমার প্রিয় বন্ধু রামচন্দ্র ঘোষ এই পুস্তক লিখা সম্বন্ধে অনেক সাহায্য করিয়াছেন। এমন কি, তিনি না থাকিলে এ দুরূহ কার্য্য হইতে আমি উত্তীর্ণ হইতে পারিতাম না।

কলিকাতা—১৮ই পৌষ ১৩০২
ইং ১লা জানুয়ারি, ১৮৯৬

শ্রীকেদারনাথ ঘোষ।

সূচীপত্র।

অ

অরিকল (auricle) ৫০

অপরিস্কার ও পরিস্কার রক্ত ৫২

আ

আর্সেনিক (Arsenic) ... ১২৪, ১৩৮, ১৬৫, ২৩৯

„ আর ভেরেট্রুমের লক্ষণে কি কি বিভিন্নতা আছে ১২৪

„ খাইয়া বিষাক্ত হইলে কি কি লক্ষণ হয় ১৬৬

„ সম্বন্ধে ডাক্তার স্যালজারের মত ... ১৭৪

„ „ ডাক্তার ফেরিঙ্গটনের মত ... ১৭৫

„ „ আর একটী রোগীর কথা ... ১৭৭

আমার গুরুজী ১৭৮

আর্সেনিক খাইয়া সেঁকো বিশের লক্ষণ হন ... ২১৩

আর্জেণ্টম্ নাইট্রিকম্ (Argentum Nitricum) ... ২৩৩

ই

ইন্‌কম্‌প্লিট রিয়্যাকশন (Incomplete reaction)

অসম্পূর্ণ প্রতি ক্রিয়া ২৪

ইউরিয়া (Urea) ৩৫

ইপিকা কিউয়ানা (Ipecacuanha) ... ১২৮, ১৪১, ১৪৪
ইউরিমিয়া (Uræmia) ... ১৪১, ১৪৮
ইউপেটোরিয়ম্ পার্ফোলিয়েটম্ (Eupatorium Perfoliatum) ১৪২

উ

উপক্রমাবস্থা ৯

এ

এপিডেমিক (Epedemic) ৪
এণ্ডেমিক (Endemic) ৫
এম্বোলিস্‌ম্ (Embolism) কাহাকে বলে ৪৩, ৪৫, ৮১
এক্সক্রিশন (excretion) ৬৯
এণ্ডস্ মোসিস্ (Endosmosis) ৭৭
এক্সস্ মোসিস্ (Exosmosis) ৭৭

ও

ওলাউঠার উপক্রমাবস্থা ৮
„ দ্বিতীয় অবস্থা ৯, ১৬
„ প্রকাশ অবস্থায় নাড়ীর লক্ষণ ... ১১
„ বিষ শরীরে প্রবেশ করিয়া কি কি অনিষ্ট ঘটে ৩৭
„ সম্বন্ধে ডাক্তার গুডিভ্ সাহেবের মত ... ৩৮
„ কারণ সম্বন্ধে এখনকার মত ... ৩৮
„ আক্ষেপ কি কারণে হয় ৩৯
„ পাতলা জলের ন্যায় বাহ্যে হইবার কারণ ... ৩৯

উলাউঠার বিষের কার্য্য সম্বন্ধে ডাক্তার গুডিভ্
সাহেবের মত ৩৯
" বিষ সম্বন্ধে ডাক্তার স্যালজার সাহেবের মত ৪০
" প্রতিক্রিয়ার অবস্থায় কোন অঙ্গ পচিয়া
যাইবার কারণ ৪২
" রোগীর নিশ্বাস প্রশ্বাসের কষ্টের কারণ ... ৪২
" অবস্থায় জমা রক্তের টুকরা ধমণীতে
আটকাইয়া যায় ৪০, ৪৪
" হাত পা নীল বর্ণ হইবার কারণ ... ৯৫
" চিকিৎসা ১২০
" সেচুরেটেড্ স্পিরিটকর্পূরের (Saturated spirit
camphor) ব্যবহার ১২০
" রোগের শেষ অবস্থায় চক্ষে ঘোলা পড়িয়া যাওয়া ১৪০
" রোগে নাসিকা, উপস্থ ইত্যাদি পচিয়া যায় ১৪১
" রোগে শেষ অবস্থায় কর্ণমূল ফুলা .. ১৪২
" শেষ অবস্থায় ফুস্‌ফুসের প্রদাহ ... ১৪৩
" আক্ষেপিক ১৪৭
" অনাক্ষেপিক ১৫০
" পাক্ষাঘাতিক ... ১৫২, ২১০
" কোলাপ্স অবস্থায় বাহ্যে প্রস্রাব বন্ধ হইয়া
পেট ফাঁপা ১৯০
" " " তাহার ঔষধ ... ১৯২
" রোগীর হিক্কা ১৯৩
" রোগীর হিক্কা কি কারণে হয় ... ১৯৪

ক

কমপ্লিটরিয়্যাক্‌শন Complete reaction, অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে প্রতিক্রিয়ার কার্য্য আরম্ভ হয় ... ২৪

কোলাপ্‌সের অবস্থার কথা ... ১৯,৩২

কোলাপ্‌সের অবস্থার লক্ষণ ২৮

কোলাপ্‌স অবস্থায় মৃত্যুর লক্ষণ ২৯

কোলাপ্‌স্ অবস্থায় স্ত্রীলোকদিগের জননেন্দ্রিয় হইতে রক্তস্রাব হওয়া ২৯

কোলাপ্‌স্ অবস্থায় আধরক্তানি বাহে গুহ্যদ্বার দিয়া চোয়াইয়া পড়া ৩০

টা কালাপ্‌স্ অবস্থায় পেট ফাঁপা ৩০

,, অবস্থায় পেট ফাঁপার কারণ ... ৩০

টাই কালাপ্‌স্ অবস্থায় বুকের নিচে বেদনা ... ৩১

কালাপ্‌স্ অবস্থায় পেটের উপরে লম্বা ভাবে ডানদিক হইতে বাঁ দিক পর্য্যন্ত বেদনা ... ৩১

টা কলেরায়্যাস্ফিক্‌শিয়া Cholera asphyxia ... ৩২,৯০

টাই কি কারণে ওলাউঠা রোগের উৎপত্তি হয় ... ৩৬

টার্টার নী Kidney ৪৭

র্ Chyme ৬৬

ডিজিটেলি Chyle ৬৬

ডায়েবিটিস্ ইন্ ma ৯০

ক (Uræmic coma) ... ৯০,২৫১

কোমা কঞ্জেষ্টিভ্ (Congestive coma) বা হাইপ্যারিমিক Hyperœmic coma) কোমা ... ৯১
কলেরা কিলার Cholera killer ওলাউঠার নূতন ঔষধ ১২৩
কিউপ্রম্ মেট্যালিকম্ Cuprun Metallicum ... ১২৬,১৮১
কার্ব্বোভেজিটেবিলিস্ Carbo vegetabilis ১২৭,২২৫,২৬১,২৭১
ক্যান্থেরিস্ Cantharis ১২৮,১৪১
কেলি বাইক্রোমিকম Kali bichromicum ... ১২৯
ক্যাম্ফর্ Camphor ১৪৩
ক্রোটন্টিগ্লিয়ম্ Croton Tiglium. ... ১৪৪
ক্যামোমিলা Chamomilla ১৪৫
কুলপ্রদীপ বসু (দৃষ্টান্ত) ১৫৯
কিউপ্রম্ আর আর্সেনিকের লক্ষণের প্রভেদ ... ১৮৬
কিউপ্রম্ আর আর্সেনিকের নিশ্বাস প্রশ্বাসের কষ্টের বিভিন্নতা ১৮৮
কামিনী কুমার সাহা (দৃষ্টান্ত) ২০
কোলাপ্সের চিকিৎসা ২১
কোলাপ্স অবস্থায় বাহ্যে বমি ২১

খ

খাদ্য দ্রব্য পরিপাক হইয়া কিরূপে রক্ত প্রস্তুত হয়

গ

গুঁড়ী ধমনী ... .
গুঁড়ী শিরা ... ...
গলাটিপিয়া ধরিলে কিরূপে মৃত্যু ঘটে ... ..

গিরিবালা দাসী (দৃষ্টান্ত) ১৫৫

চ

চায়না China ১৩৪, ১৪০

ট

টাইফয়েড্ অবস্থা ১৬, ৩৩, ৩৪, ১৩৮
টাইফয়েড্ অবস্থায় দাঁতের গোড়া হইতে রক্ত পড়া ৩৫
টাইফয়েড্ অবস্থায় চক্ষু ঘোলা পড়িয়া যাওয়া ... ৩৫
টাইফয়েড্ অবস্থায় রোগীর চক্ষে ক্ষত হয় ... ৩৫
টাইফয়েড্ অবস্থায় রোগীর বেশী পরিমাণে বমি হইতে আরম্ভ হয় ৩৫
টাইফয়েড্ অবস্থায় হিক্কা ৩৫
টাইফয়েড্ অবস্থায় হিক্কার কারণ ... ৩৫
টাইফয়েড্ অবস্থায় পুরুষদিগের উপস্থে ও স্ত্রীলোকদিগের জননেন্দ্রিয়ে ক্ষত হয় ৩৫
টাইফয়েড্ অবস্থায় পুরুষদিগের উপস্থে ও স্ত্রীলোকদিগের জননেন্দ্রিয় পচিয়া যায় ... ৩৫
টাইফয়েড্ অবস্থায় নাসিকায় ক্ষত হয় ৩৬
টাইফয়েড্ অবস্থায় নাসিকা পচিয়া যায় ... ৩৬
টাইফয়েড্ অবস্থায় সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত হয় ৩৬
টার্টার ইমিটিক Tartar Emetic ... ১৪৫, ২১০, ২৪৪

ড

ডিজিটেলিস্ Digitalis ১২৯
ডায়েবিটিস্ ইন্সিপিডস্ Diabetes Insipidus ... ২৬৮

ঢ

ঢাকা একরামপুরের কেস্ (দৃষ্টান্ত) ... ২১০
ঢাকার পোষ্টমাষ্টার বলরাম বাবুর শালী (দৃষ্টান্ত) ২২৩

থ

থোরাসিক ডক্ট Thoracic duct ৬৭

দ

দাঁতের গোড়ায় ক্ষত হওয়া ২৪
দাঁতের গোড়া পচিয়া যাওয়া ৩৪

ধ

ধমনী ৫৫
ধমনীর ভিতরে রক্ত চলাচল কিরূপে হয় ... ৫৬
ধমনী ও শিরার রক্তের রং ৫৭
ধনুষ্টঙ্কার ১৮৭
ধনুষ্টঙ্কার ট্রম্যাটিক্ Traumatic ১৮৭
ধনুষ্টঙ্কার ইডিওপ্যাথিয়া Idiopathic ১৮৭

ন

নেট ওয়ার্ক অব ভেসেল্‌স্ Net work of vessels ... ৬৩
নিশ্বাস লইবার নলী ৭০
নাড়ী Pulse ৯৭
নাড়ী সুস্থ অবস্থায় কত বার চলে ৯৭
নাড়ী বয়সে কি রূপ পরিবর্ত্তন হয় ... ৯৯
নাড়ী দিন রাত্রে পৃথক পৃথক সময়ে কি রূপ পরিবর্ত্তন হয় ১০০

নাড়ীর রকম ১০১
নাড়ীর তরঙ্গ বা Wave ১০১
নাড়ী স্থূল ১০১
নাড়ী সূতার ন্যায় বা তারের ন্যায় ১০২
নাড়ী Compressible কম্প্রেসিবল ১০২
নাড়ী Intermittent ইন্টার মিট্যান্ট ১০৩
নাড়ী কোমল বা নরম ১০২
নাড়ী শক্ত ১০২
নাড়ী শরীরের উত্তাপ অনুযায়ী যে পরিবর্ত্তন হয় ... ১০৪
নাড়ী ডিক্রোটস্ Dicrotus ১১৮
নাড়ী নিজে কি রূপে পরীক্ষা করিতে হয় ... ১১৯
নক্স্ ভমিকা Nux vomica ... ১৩৩ ১৪৫ ২৭০
নবাব বাড়ীর একটী মিয়া (দৃষ্টান্ত) ... ১৫৬
নবিন কালী দেবী (দৃষ্টান্ত) ... ১৫৭
নবাব বাড়ীর কালুর বেআরাম (দৃষ্টান্ত) ... ১৭১
নবাব বাড়ীর আজিজ জান মিয়া (দৃষ্টান্ত) ... ২২২
নিশ্বাস প্রশ্বাসের রকম ... ২৪২
নাইকোটিনের (Nicotine) লক্ষণ ... ২৫২
নিতম্বিনী দাসী (দৃষ্টান্ত) ... ২৫৯

প

প্রতিক্রিয়া ১৩, ৩২
পলমোনারী আর্টারী ৩৭
পোর্ট্যাল্ সার্কিউ লেশন Portal circulation ... ৬৫

পলমোনারী সার্কিউলেশন Pulmonary circulation ৭৫
পলসেটিলা Pulsatilla ১৩৩, ১৫৬
প্রস্রাব সত্ত্বে ইউরিমিয়ার লক্ষণ উপস্থিত থাকে ... ২৬৫

ফ

ফুস্‌ফুস্‌ ৭০
ফুস্‌ফুসের গঠন ও কার্য্য ৭০
ফস্‌ফরস Phosphorus ১০৬

ব

ব্লুকলেরা ৯, ১৯৬
ব্যাসিলস Basillus ৬
বিরাম অবস্থা ১৭
বেস্‌ অব দি হার্ট Base of the heart ৪৮
ব্রংকাই Bronchi ৭১
বেলেডোনা Belladonna ... ১৩০, ১৩১, ১৪২, ২৭১
ব্রাইওনিয়া Bryonia ১৩৮
বেড্‌ সোর Bed sore ১৩৯, ১৯৯
ব্রহ্মময়ী দাসী (দৃষ্টান্ত) ১৫৮
বিজলী ময়ী দাসী ২০৫
বাবু নফর চন্দ্র ভট্ট সব জজের যমজ পুত্রদ্বয় ২৫৪
বাবু শ্যামা প্রসাদ রায়ের পুত্র ২৬৫

ভ

ভেণ্ট্রিকল Ventricle ৫০
ভেকুয়ম Vacuum ৫৯

ভেরেট্রম্ য়্যালবম্ Veratrum album ... ১২৩, ১৪৫, ২০৭
—ডাক্তার রসেল সাহেবের মত ও তাহার রোগী ... ২০৮
ভবানিপুর কালিকুমার মিত্রের পুত্র (দৃষ্টান্ত) ২৭১

ম

মনিবন্ধ ১১
মস্তিষ্কের এফিউসন Effusion ৪১
মূত্রগ্রন্থিতে রক্তের চলাচল ৬৮
মার্কিউরিয়স্ করোসাইভস্ Mercurius corrosivus ... ১৩০
মেরুদণ্ডের মজ্জা ১৪২, ১৮২, ২২৮
মেডুলা অবলঙ্গেটা Medula oblongata... ... ১৮৮
মেডুলা অবলঙ্গেটার কার্য্য ১৮৮

য, য়

যকৃৎ ৪৭
য়্যানিমিয়া Anæmia ৬৭
য়্যাস্থিনিয়া Asthenia ৮৩
য়্যাপ্নিয়া বা সফোকেশন Apnœa or suffocation ... ৮৩
য়্যানিমিক কোমা Anæmic coma ৮৩
য়্যাকোনাইট Aconite ১২৬, ১৫৩, ২১৪
য়্যাসিড্ হাইড্রোসিয়্যানিক Acid hydrocyanic ১৩৪, ১৪৪, ২৩৯
য়্যাসিড্ ফস্ফরিক্ Acid phosphoric ১৩৫, ১৪৪
য়্যাসিড্ হাইড্রোসিয়্যানিক্ ও আর্সেনিক্ ১৬০, ১৬৫, ২৬১
য়্যাগেরিকস্ মস্কেরিয়স্ Agaricus muscarius ... ২৪১

র

রক্তের চলাচল ৫২-৫৩

রক্তের শিরা ও ধমনী ৫৪

রক্ত চলাচলের গতি ৫৯

রিন্যাল সার্কিউলেশন Renal circulation ... ৬৫

রক্তে সুস্থাবস্থায় কি কি থাকে ৭৯

রক্তের লাল বিন্দু Red corpuscles ৭৯

রক্তের সাদা বিন্দু White corpuscles ৭৯

রিসিনস্ কমিউনিস্ Ricinus communis ... ১০২, ২০০

রসটক্স Rhus tox ১০৮

রতি কুমার গোপ (দৃষ্টান্ত) ২০৬

ল

লেকেশিস্ Lachesis ১৪২

শ

শুষ্ক ওলাউঠা ১৬, ২৪

শিরা ৫৭

শিরার ভিতরে রক্তের চলাচল কি রূপে হয় ... ৫৮

শরীরের স্বাভাবিক উত্তাপ ১০৪

স

সন্ন্যাস রোগ ... ২২

স্ত্রীলোকদিগের কোলাপ্স অবস্থায় রক্ত স্রাব ... ২৯

স্ত্রীলোকদিগের গর্ভাবস্থায় রক্ত স্রাব ... ৩০

সর্প বিষে কি কি অনিষ্ট ঘটে ... ৩৭
সার্কিউলেশন অব ব্লড্ Circulation of blood ... ৫৪
সিস্টেম্যাটিক্ সার্কিউলেশন Systematic circulation... ৬৫
সবক্লেভিয়েন ভেন্ Subclavian vein ৬৭
সিক্রিশন Secretion ৬৯
সিন্ কোপ্ Syncope ৮২
সুস্থ অবস্থায় এক মিনিটে নাড়ী কত বার চলে ... ৯৮
সিকেলী কর্নিউট্ম্ Secale cornutum ১৩১, ১৯৫
সিনা Cina ১৩২
স্যাণ্টনাইন Santonine ১৩২
সিলিকা Silica ১৪৩
সল্ফর Sulphur ১৪৫
স্নায়ু জনিত ত্বক ইন্দ্রিয়ের কার্য্য ... ১৮০
স্নায়ু ... ১৮২
স্নায়ু মোটর Motor ... ১৮২
স্নায়ু সেন্সরী Sensory ... ১৮২
স্নায়ুর কার্য্য ... ১৮৩
স্নায়ুজনিত ইন্দ্রিয়ের কার্য্য ... ১৮৪
স্নায়ু গ্যাংগ্লিয়নিক Ganglionic ... ১৮৭
সিকেলী কর্নিউটমের বিশেষ লক্ষণ ... ১৯৭
সিকেলী কর্নিউটম্ প্রয়োগের বিশেষ লক্ষণ ... ১৯৮

হ

হৃদ্পিণ্ডের গঠন ও কার্য্য ৪
হৃদ্পিণ্ডের কুঠরী ৫

হৃদ্‌পিণ্ডের কুঠরী ও তাহার পৃথক পৃথক কার্য্য ... ৫
হৃদ্‌পিণ্ডের সঙ্কোচ ও বিকাশ ৭৫
হাইপেরিমিয়া Hyperæmia ৮০,২৪
হেমামিলিস্ *Hamamelis* ১২৮
হিপার্ সল্‌ফ্ Hepar sulph ১৪৩

সূচীপত্র সমাপ্ত।

দুরূহ শব্দের অর্থ।

অ

অরিকলঃ—হৃদ্‌পিণ্ডের উপর দিগে যে দুইটী কুঠরী আছে সেই দুই কুঠরীর নাম অরিকল্‌।

আ

আক্ষেপ (Spasm) হাতে পায়ে ও অন্যান্য অঙ্গে ওলাউঠা রোগে যে খিল ধরে তাহাকেই আক্ষেপ বলে। সাধারণতঃ মাংসপেশীর সংকোচ অর্থাৎ আঁকড়িই আক্ষেপ। ধমনীতে ও মাংস পেশী আছে অতএব আক্ষেপে ধমনী ও সঙ্কোচিত হইয়া আঁকড়াইয়া যায়। ধমনীর এরূপ আঁকড়িকে ও ধমনীর আক্ষেপ বলা যায়।

ই

ইউরিমিয়াঃ—সুস্থ অবস্থায় আমাদের প্রস্রাবের সঙ্গে এক প্রকার ক্লেদ নির্গত হয়। সেই ক্লেদটীর নাম ইউরিয়া; আর ঐ ইউরিয়া প্রস্রাবের সঙ্গে নির্গত না হইয়া যে এক রকম বিকারের লক্ষণ হয় তাহাকেই ইউরিমিয়া বলে।

ইউরিয়াঃ—রক্তের এক রকম ক্লেদ।

উ

উপক্রমাবস্থাঃ—ওলাউঠায় ভেদ বমি ইত্যাদি লক্ষণ উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে শরীর একপ্রকার যে অসুস্থ হয় তাহাকেই ওলাউঠা রোগের উপক্রমাবস্থা বলে। এই অবস্থার সমস্ত বিষয় ৮—৯ এর পৃষ্ঠায় ভাল করিয়া লিখা হইয়াছে।

উদ্দিপনাঃ—উদ্দিপনাকে ইংরাজিতে Irritation বলে। গায়ের চর্ম্মে যেরূপ একটী সূচ ফুটাইলে ঐ স্থানটী উত্তেজিত হয়। শরীরের রক্তের ভিতর কোন প্রকার ক্লেদ থাকিলে স্নায়ুতে ও তজ্জন্য মাংসপেশীতে এক প্রকার উত্তেজনা জন্মে, তাহাকেই উদ্দিপনা বলে।

এ

এপিডেমিক্ঃ—কোন বিস্তীর্ণ স্থান ব্যাপিয়া সমস্ত লোকের কোন একটী বিশেষ পীড়া হইলে ইংরাজিতে তাহাকেই ঐ পীড়ার এপিডেমিক বলে।

এণ্ডেমিকঃ—কোন সঙ্কীর্ণ স্থানে, অর্থাৎ একটী ছোট পাড়ার ভিতরে বা একটী বাড়ীর ভিতরে এক সময়ে অনেক লোকের যে পীড়া হয়, তাহাকে সেই পীড়ার এণ্ডেমিক্ বলে।

এফিউশনঃ—ওলাউঠা রোগে রক্তের বিকৃতি জন্মাইয়া রক্ত যেন ছিঁড়িয়া যায়, অর্থাৎ জলিয় অংশ ও সার অংশ পৃথক পৃথক হয়, আর ওলাউঠা রোগে ঐ জলিয় অংশ যেরূপ আঁতুড়ীর শিরা হইতে আঁতুড়িতে চোয়াইয়া পড়িয়া জলের ন্যায় বাহ্যে বমি দ্বারা নির্গত হয়, মস্তিষ্কের ধমনীর ভিতর হইতে রক্তের জলিয় অংশ ঐরূপ চোয়াইয়া ধমনীর বাহিরে পড়ে বটে, কিন্তু মস্তিষ্ক হইতে

নির্গত হইতে পারে না বলিয়া মস্তিষ্কের ছিদ্রে ছিদ্রে জমিয়া থাকে। তাহাকেই মস্তিষ্কের এফিউশন বলে।

এম্বলিস্‌ম্—এই গ্রন্থের ৪৩।৪৪ পাতায় বলিয়াছি যে, পাতলা বাহ্যে বমি দ্বারা রক্ত গাঢ় হইয়া কোন কোন স্থানে একেবারে জমিয়া যায়। পরে প্রতিক্রিয়া অবস্থা হইলে রক্তের চলাচল রীতিমত আরম্ভ হয়। কিন্তু যে টুকু রক্ত জমিয়া যায় তাহা আর পুনরায় তরল হয় না রক্তের সঙ্গে সঙ্গে বড় ধমনী দিয়া সঞ্চালিত হয়, কিন্তু অপ্রসস্থ ছোট ধমনীতে আসিয়া আটকাইয়া যায়। এইরূপ রক্তের টুক্‌রা আট্‌কানকেই ইংরাজিতে এম্বলিস্‌ম্ বলে।

ক

কোমাঃ—মস্তিষ্কে রক্ত জমিয়া যে রোগীর তন্দ্রার ন্যায় অবস্থা হয়, আর রোগী বিড়বিড় করিয়া ভুল বকে তাহাকেই কোমা বলে। কোমা এক প্রকার বিকারের অবস্থা।

কোলাপ্‌সঃ—ওলাউঠা বা জ্বর রোগে যে হঠাৎ রোগীর নাড়ী ছাড়িয়া হিমাঙ্গ হইয়া যায়, বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম হয় ও নিশ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট হয় সেই অবস্থাকেই কোলাপ্‌স বলে। কোলাপ্‌সের কথা এই পুস্তকের ১৯ পৃষ্ঠা হইতে ৩২ পৃষ্ঠার মধ্যে ভাল করিয়া বলা হইয়াছে।

কলেরা য্যাস্ফিকশিয়াঃ—যে উলাউঠায় ফুস্‌ফুসের অবশতা জন্য হউক বা পল্‌মোনারি ধমনীর সঙ্কোচ জন্যই হউক ফুস্‌ফুসে স্বাভাবিক পরিমাণে বাতাস না যাইলে যে রোগী হাঁপাইয়া মরে তাহাকেই কলেরা য্যাস্ফিকশিয়া বলে।

ক্রাইসিস্ঃ—একটী রোগ বা উপসর্গ উপস্থিত হওয়াতে যে পূর্ব্ব রোগ আরোগ্য হয়, তাহাকেই ইংরাজিতে ক্রাইসিস্ বলে। যেমন ওলাউঠার টাইফয়েড্ অবস্থায় রোগীর দাঁতের গোড়া হইতে অধিক পরিমাণে রক্ত বাহির হইয়া রোগের আশু শান্তি হয়। নিউমনিয়া রোগীর অধিক ঘর্ম্ম হইয়া নিউমনিয়া রোগের শান্তি হয় ইত্যাদি এক উপসর্গে পূর্ব্ব রোগটা আরগ্য হইলে, সেই উপসর্গকে ক্রাইসিস্ বলে।

কিড্নীঃ দুইটী মূত্রগ্রন্থি শরীরের দুই পাশে, কোমরের উপরে দুই ধারে আছে সেই দুইটী মুত্র গ্রন্থিকে কিড্নী বলে।

গ

গ্যাংগ্রিণঃ—কোন স্থানে ক্ষত হইয়া ঐ স্থানটী পচিয়া যাইলে তাহাকে গ্যাংগ্রিণ বলে।

শুঁড়ী ধমনীঃ—হৃদ্পিণ্ডের বাঁদিগের ভেণ্ট্রিকল হইতে পরিষ্কার রক্ত যাইয়া প্রথমত যে ধমনীতে পড়ে তাহাকে শুঁড়ি ধমনী বলে। ইংরাজিতে য়্যার্ত্তটা বলে।

শুঁড়ীশিরাঃ—অপরিষ্কার রক্ত ধমনী হইতে সূক্ষ্মতঃ শিরাতে আসিয়া পড়ে। তাহার পর ছোট ছোট শিরা হইতে ক্রমে তদপেক্ষা বড়, অবশেষে নিচে উপরে দুইটী বড় বড় শিরা দিয়া শরীরের নিচের দিগের ও উপর দিগের অপরিষ্কার রক্ত পিণ্ডে আসিয়া পৌছে। ঐ দুইটী মোটা মোটা শিরকে শুঁড়ি শিরা কহে।

ট

টাইফয়েড্ কণ্ডিশন Typhoid condition :—প্রতিক্রি

সমস্ত লক্ষণ হইয়া রোগীর প্রস্রাব না হইলে চক্ষু লাল, মাথা গরম ইত্যাদি বিকারের লক্ষণকে টাইফয়েড্ অবস্থা বলে।

ড

ডিসিন্‌ফেক্‌টেণ্ট পাউডার Disinfectant Powder :—ইহা এক রকম গুঁড়া, ইহা ব্যবহার করিলে বা ছড়াইয়া দিলে রোগের সংক্রামকতা নিবারণ হয়।

ডাইয়েগ্নসিস :—রোগের কারণ নিরূপণ করাকেই ডাইয়েগ্নসিস্ বলে।

ন

নিউমনিয়া। Pneumonia :—ফুস্‌ফুসের প্রদাহকে নিউমনিয়া বলে। প্রদাহ কি ? আর প্রদাহে কি হয় ? তাহা প্রদাহ স্থলে বলা হইয়াছে।

নেটওয়াক অব ভেসেল্‌স Net work of vessels :—সরু সরু চুলের ন্যায় ধমনী ও শিরার মুখে মুখে যে স্থানে জোড় লাগিয়াছে সে স্থানে অনেক ধমনী ও শিরার ঐরূপে মিলন হওয়াতে একখানি জালের মত হয়। তাহাকেই Net work of vessels বলে।

প

প্রতিক্রিয়া :—কোলাপ্সের পর রোগীর যে ক্রমে ক্রমে আরোগ্যের লক্ষণ হয়, অর্থাৎ হস্ত পদ সর্ব্বশরীর একটু গরম হয়, মণিবন্ধে একটু নাড়ী আইসে। তাহাকেই প্রতিক্রিয়ার অবস্থা বলে।

প্রদাহ—প্রদাহ কথাটীর ইংরাজি Inflammation কোন স্থানে রক্ত জমিয়া স্থানটী একটু উষ্ণ হইলেই সাধারণতঃ প্রদাহ হইয়া থাকে। প্রদাহ সাধারণতঃ তরুণ ও পুরাতন।

পাকস্থলী—পাকস্থলীকে সাধারণ কথায় পেট বলে। খাদ্য দ্রব্য যে স্থানে পরিপাক পায় সেই স্থানের নামই পাকস্থলী।

প্যাথলজি :—রোগের পীড়িত অবস্থায় বৈলক্ষণ্য জন্মিয়া শরীরের ভিতরে যে যে কার্য্য হইয়া থাকে তাহাকেই প্যাথলজি বলে। শরীরের সুস্থ অবস্থায় কার্য্যের নাম ফিসিয়লজি। আর অসুস্থ অবস্থায় শরীরে যেপ্রকার কার্য্যে হয় তাহাকে প্যাথ-লজি বলে।

পলমোনারি আর্টারি :—হৃদ্‌পিণ্ড হইতে অপরিষ্কার রক্ত যে ধমনী দিয়া ফুস্‌ফুসে যায় তাহাকেই পলমোনারী আর্টারী বলে।

ফ

ফুস্‌ফুস্ :—আমাদের বুকের ভিতরে দুপাসে যে দুইটী পাঁঠার কাপাসের ন্যায় আছে তাহাকেই ফুস্‌ফুস্ বলে। পাঁঠার কাপাসে লইয়া ফুঁ দিলে যেরূপ ফুলিয়া উঠে। মনুষ্যের ফুস্‌ফুস্ ও সেইরূপ নিশ্বাস লইবার সময় বাতাস যাইলে বুকের ভিতরে ফুলিয়া উঠে আর সেই জন্যই ফুস্‌ফুসের কোনরূপ বৈলক্ষণ্যে সমধিক পরিমাণে ফুস্‌ফুসের ভিতরে বাতাস যায় না বলিয়া নিশ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট হয়।

ব

ব্লুকলেরা :—খারাপ রকম কলেরাকেই ব্লুকলেরা বলে। ইংরাজী 'ব্লু' কথাটীর মানে নীলবর্ণ, সাংঘাতিক ওলাউঠায় হাত পা সর্ব্বশরীর নীলবর্ণ হইয়া যায়। সেই জন্যই ঐ প্রকার ওলা-উঠার নাম ব্লুকলেরা।

ব্যাসিলস্ (Bacillus or Bacillum-stick) সকল রোগেই একপ্রকার লম্বা লম্বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদার্থ উৎপন্ন হয়। তাহাকেই ইংরাজিতে ব্যাসিলস্ বলে।

বিরাম অবস্থা :—কখন কখন ভেদ বমি ওলাউঠার সমস্ত লক্ষণ উত্তরোত্তর বাড়িয়া কিছু কালের জন্য স্থগিত থাকে। সেই স্থগিত থাকার অবস্থাকে বিরাম অবস্থা বলে।

বেস্ অব দি হার্ট Base of the heart হৃদ্‌পিণ্ডের চৌড়া দিগকে বেশ অব দি হার্ট বলে।

ভ

ভেন্‌ট্রিকল :—হৃদ্‌পিণ্ডের দুইটী নিচের কুঠরীর নাম।

ভ্যাকুয়ম্ :—যে স্থলে কিছুই নাই, হাওয়া পর্য্যন্তনাই তাহাকেই ভ্যাকুযম বলে।

ম

মাইক্রস্কোপ্ Microscope :—অনুবীক্ষণ যন্ত্র :—অতিশয় ক্ষুদ্র পদার্থ চক্ষে দেখা যায় না, তবে অনুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা দেখিলে দেখা হয়।

মণিবন্ধ :—কব্জা অর্থাৎ হাতের যেখানে নাড়ী দেখিতে হয়।

মাংসপেশী :—পাঁঠা ইত্যাদি যে জীব জন্তুর মাংস খাওয়া যায় তাহাকে মাংসপেশী বলে। মাংসপেশী কাদার চাবড়ার মত শরীরে থাকে না। হাতে পায়ে যেখানেই হউক হাড়ের উপর লম্বা ভাবে থাকে। মাংস পেশী হাড়ের এক স্থান হইতে উঠিয়া একটু দূরে পুনরায় হাড়ের সঙ্গেই সংলগ্ন হয়। মাংস পেশী যেন দড়ির ন্যায়। একটী দড়ি যেমন কোন দ্রব্যের দুই স্থানে লম্বাভাবে বাঁধিয়া একবার টানিয়া পুনরায় ছাড়িয়া দিলে ঐ দ্রব্যটীর সঞ্চালন হয় অর্থাৎ নড়ে চড়ে, আমাদের শরীরের কার্য্য ও ঐরূপে

মাংসপেশীর সংকোচ ও বিকাশে হইয়া থাকে। সংকোচ যেন দড়িটী টানিয়া ধরা, বিকাশ যেন দড়িটী ছাড়িয়া দেওয়া। মাংসপেশী গুলী যেন রবারের মত। মাংসপেশীর সংকোচ ও বিকাশ আপনা আপনি স্নায়ুর দ্বারা হইয়া থাকে।

মস্তিষ্ক :—মাথার মগজকে মস্তিষ্ক বলে।

য

যকৃৎ যে স্থানে পিত্ত তৈয়ার হয় তাহাকেই যকৃৎ বলে। পিত্ত ও রক্তের একপ্রকার ক্লেদ হইতে হইয়া থাকে, অতএব যকৃতে রক্ত পরিষ্কার হয়।

শ

শিরা :—ধমনীতে পরিষ্কার রক্ত থাকে সেইরূপ রক্ত যখন ধমনী হইতে শিরায় আসে তখন সে রক্ত অপরিষ্কৃত। অতএব ধমনীতে পরিষ্কার রক্ত চলে, শিরায় অপরিষ্কার রক্ত সঞ্চালিত হয়। অতএব, শিরা অপরিষ্কার রক্তের স্থান।

স

সবিরাম জ্বর :—যে জ্বর ছাড়িয়া হয় তাহাকেই সবিরাম জ্বর বলে।

স্নায়ু Nerve :—শরীরে রক্ত সঞ্চালনের শির ভিন্ন সুতার গোছার ন্যায় আর একপ্রকার সাদা সাদা শিরের মত দ্রব্য আছে, তাহাদিগকেই স্নায়ু বলে। অধিকাংশ স্নায়ু মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডের মজ্জা হইতে উৎপত্তি হইয়া শরীরের নানাস্থানে ছড়াইয়া আছে। স্নায়ু দ্বারাই শরীরের চৈতন্য ও মাংসপেশীর কার্য্য হইয়া থাকে। যেরূপ পক্ষাঘাতে স্নায়ুর বিকৃতি হয় বলিয়া পক্ষাঘাত গ্রস্থ অঙ্গটীতে চৈতন্য থাকে না, তাহাতেও তাহার কার্য্যও হয় না, রক্তও রীতিমত সঞ্চালিত হয় না। বাহ্যিক লক্ষণে পক্ষাঘাত গ্রস্থ অঙ্গ-

টীতে অন্য কোন বৈলক্ষণ্য দেখা যায় না বটে, কিন্তু স্নায়ুর বিকৃতি জন্য ঐ অঙ্গের চৈতন্যও থাকে না এবং কার্য্যও কিছু হয় না।

সন্ন্যাস রোগ :—সন্ন্যাস রোগ প্রকৃত পক্ষে হঠাৎ মৃত্যুকেই বলে। হঠাৎ মৃত্যু নানা কারণে হইতে পারে। অকস্মাৎ হৃদ্‌পিণ্ডের কার্য্য বন্ধ হইয়া লোকে মরে। হৃদ্‌পিণ্ড ফাটিলেও তৎক্ষণাৎ মৃত্যু ঘটে ও অন্যান্য কারণে হঠাৎ মৃত্যু হইলেই তাহাকে সন্ন্যাস রোগ বলে।

সিরম্ :—রক্তে সার অংশ ছাড়া যে জলের ভাগ আছে তাহাকেই সিরম্ বলে।

সার্কিউলেশন অব ব্লড্ Circulation of blood :—ধমনী ও শিরা দিয়া রক্ত শরীরের নানাস্থানে সঞ্চালিত হইয়া পুনরায় যে হৃদ্‌পিণ্ডের বাঁ দিগে ফিরিয়া আইসে তাহাকেই সার্কিউলেশন অব ব্লড্ বলে।

স্থিতি স্থাবক :—যে দ্রব্য টানিয়া বাড়াইলে আবার পূর্ব্বেকার অবস্থা ধারণ করে তাহাকেই স্থিতি স্থাবক কহে। ধমনীর স্থিতি স্থাবক গুণ আছে।

হ

হৃদ্‌পিণ্ড : রক্তের আধার, অপরিষ্কার রক্ত হৃদ্‌পিণ্ডের ডাইনদিকে পড়ে। হৃদ্‌পিণ্ডের ডাইন দিগ হইতে অপরিষ্কার রক্ত ফুস্‌ফুসে যাইয়া পরিষ্কার হয়। ঐ রক্ত ফুস্‌ফুসে পরিষ্কার হইয়া পলমনারি ভেন্ দিয়া হৃদ্‌পিণ্ডের বাঁ দিগে আইসে! আর হৃদ্‌পিণ্ডের বাঁদিগ হইতে গুঁড়া ধমনী ও তাঁহার ডালপালা ছোট ছোট ধমনী দিয়া শরীরে সঞ্চালিত হয়।

সমাপ্ত।

ডাক্তারী
চিকিৎসা-সার।

ওলাউঠা।

আমাদের নিদানে বিসূচিকা রোগের যে সমস্ত লক্ষণ আছে, এখনকার ওলাউঠা রোগের সঙ্গে ঐ সমস্ত লক্ষণ গুলি ঠিক মিলে, অতএব ওলাউঠা রোগের প্রকৃত নাম বিসূচিকা হওয়া উচিত। ওলাউঠা কথাটী কোন রোগের নাম নয়, ইহাতে কেবল ভেদ বমি বুঝায়। ওলা অর্থাৎ ভেদ হওয়া উঠা অর্থাৎ বমি হওয়া। ওলাউঠার স্থানে স্থানে অন্য নামও আছে। যথা ;—বাজার ভাও, হিন্দিতে পেটমুকা বিমারি বলে। বাজারভাও কথাটি বেশ, বাজারের দর যেমন সদাই উঠে পড়ে, কখন ঠিক নাই, সেইরূপ এ বেআরামেও রোগী কখন আছে, কখন নাই। অর্থাৎ অল্প সময়েই অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় সেই জন্যই ইহার নাম বাজারভাও, হিন্দিতে ইহাকে হাইজাকা বেমারিও বলে। বিসূচিকা ইহার প্রকৃত নাম হইলেও এ নামটী আজ কাল প্রায় লোপ পাইয়া গিয়াছে। বিসূচিকা অপেক্ষা ইংরাজী কলেরা কথাটী অধিক প্রচলিত। কলেরা কথাটি এখনকার স্ত্রীলোকেরাও ব্যবহার করিয়া থাকে।

CHOLERA ওলাউঠা।

ওলাউঠা রোগের সূত্র এই দেশেই প্রথম হয়। সেই জন্যই ইহাকে Asiatic Cholera (এসিয়াটিক্ কলেরা) বলে। মহারাষ্ট্রের যুদ্ধের সময় যখন Lord Hastings লর্ড হেষ্টিঙ্গস্ কলিকাতার গভর্ণর ছিলেন, সেই সময় অর্থাৎ ইংরাজি ১৭১৭ সালে এই রোগ প্রথম আরম্ভ হয়। আমাদের আয়ুর্ব্বেদেও বিসূচিকার লক্ষণ বিশেষ বর্ণিত আছে। ইহাতে বোধ হয় যে, ১৭১৭ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে এ বেআরাম হইত, তবে মধ্যে বোধ হয় অনেক দিন হয় নাই, কাজেই লোকে ভুলিয়া গিয়াছিল। তাহার পরে ইংরাজী ১৭১৭ খৃষ্টাব্দে অধিক পরিমাণে এই বেআরাম আরম্ভ হওয়াতে লোকে উহাকে একটী নূতন রোগ বলিয়া মনে করিল। যাহা হউক, অন্ততঃ এ কথা সত্য বটে, যে পূর্ব্বে এই কলেরা রোগ হইলেও ১৭১৭ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ হইয়া, যেরূপ ক্রমেই নানাস্থানে বিস্তীর্ণ হইতেছে ও লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণ নাশ করিতেছে, এরূপ আর পূর্ব্বে ছিল না।

(CAUSE) কারণ।

অন্যান্য পীড়ার ন্যায় শরীরে এক রকম বিষ প্রবেশ করিয়া এ বেআরামের উৎপত্তি হয়। আর ঐ রকম বিষ প্রবেশ করিয়া জ্বর হইলে প্রকৃতি যেমন ঐ বিষকে দাহন করিয়া শরীরকে সুস্থ করিতে চেষ্টা করেন, ওলাউঠায় প্রকৃতি বাহ্যে বমির দ্বারা ঐ বিষ শরীর হইতে নির্গত করিবার চেষ্টা করেন। তবে বেশী পরিমাণে ঐ বিষ শরীরে প্রবেশ করিলে প্রকৃতি

ঐ বিষ বাহির করিয়া দিয়া শীঘ্র নিজে প্রকৃতিস্থ হইতে পারেন না, কাজেই ঐ চেষ্টা অনেকক্ষণ করিতে করিতে শরীর নরগাম নির্জ্জীব হইয়া পড়ে, আর ঐ বিষের স্বধর্ম্মে ও শরীরের সমস্ত স্নায়ুকে দুর্ব্বল করিয়া তুলে। স্নায়ু শরীরের প্রকৃত বল ও জীবন। সেই স্নায়ুই যদি অকর্ম্মণ্য হয় তবে জীবন কেমন করিয়া থাকে? শরীরের কার্য্যই বা কেমন করিয়া চলে? ১ম ঐরূপ ক্রমাগত বাহ্যে বমি হওয়াতে শরীর কাহিল হয়; ২য় ঐ বিষে শরীরের স্নায়ু অকর্ম্মণ্য করিয়া শরীরকে দুর্ব্বল করে। এই দুই কারণে রোগী এত শীঘ্র মরে। স্নায়ুই শরীরের প্রকৃত বল অতএব সেই স্নায়ু অকর্ম্মণ্য হইলে সমস্ত শরীর যাহার পর নাই দুর্ব্বল ও কর্ম্মহীন হইয়া পড়ে তবেই রোগী আর কতক্ষণ বাঁচে। অনেক ভাল ভাল ডাক্তারদের মত এই যে, জ্বরবিকারের বিষ আর ওলাউঠার বিষ একই, কেবল প্রকাশে ভিন্নতা দেখা যায়; জ্বরে বিষ দাহন হয়, ওলাউঠায় ঐ বিষ বাহ্যে বমির দ্বারা বাহির হয়। তবে ঐ বিষ শরীরে অধিক কাল থাকিয়া যে অনিষ্ট উৎপাদন করে, তাহা ফলে কমবেশ উভয়েই সমান, জ্বরবিকার অধিক দিন থাকিলে নিউমোনিয়া হয়, ওলাউঠাতেও তাহা হয়। জ্বর বিকার অধিক দিন থাকিলে, মাথায় রক্ত চড়িয়া রোগী এলো মেলো বকে, অথবা কোমা বা বিকারের লক্ষণ হয়, ওলাউঠার টাইফয়েড অবস্থাও এক প্রকার বিকারের অবস্থা। জ্বর বিকারে হিম অঙ্গ হইয়া Collapse কোল্যাপ্স হয়, Collapse কোল্যাপ্স ত ওলাউঠা রোগের একটী প্রধান অঙ্গ। জ্বরবিকার কঠিন হইলে রক্ত বাহ্যে হয়। ওলাউঠাতেও তাহা হয়। জ্বরবিকারে পেটের নাড়ী পচিয়া

এফোঁড় ওফোঁড় হইয়া যায়, ওলাউঠাতেও তাহা হয়। আর জ্বর বিকার যে রূপ কঠিন রোগ, ওলাউঠাও সেই রূপ কঠিন। তবে আমার একজন বন্ধু, বলিতেন দাদা, ওলাউঠা একটী শট্‌কা কল। কথাটি মন্দ নয়—জ্বরবিকারে রোগী ভূগিয়া মরে, ওলাউঠা একবারে সাক্ষাৎ যম।

ওলাউঠার পৃথক্ পৃথক্ রকম।

বেশ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলে ওলাউঠার দুই রকম আছে। প্রথম—সামান্য অথবা ইংরাজী কলেরা। দ্বিতীয়—Malignant, Asiatic or Blue Cholera—ম্যালিগ্‌নাণ্ট, এসিয়াটিক্ অর্থাৎ ব্লু কলেরা।

ম্যালিগ্‌নাণ্ট ওলাউঠা সাধারণতঃ তিন প্রকার। Spasmodic আক্ষেপিক; Non-Spasmodic অনাক্ষেপিক; Paralytic পাক্ষাঘাতিক; কোন কোন ডাক্তারেরা Dry অর্থাৎ শুষ্ক কলেরাকে কলেরার আর একটী রকম বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আবার কোন কোন ডাক্তারেরা Dry cholera শুষ্ক কলেরাকে, এক প্রকার পাক্ষাঘাতিক কলেরার শ্রেণীভুক্ত করেন। যাহা হউক, ওলাউঠার রকমের কথা পরে ভাল করিয়া বলিতেছি।

কলেরা Cholera যে কারণেই হউক, কোন স্থানে হইতে আরম্ভ হইলে কিবল একটী লোকের হয় না। যে স্থানে হইতে আরম্ভ হয়, হয় ত গ্রামকে গ্রাম, দেশকে দেশ, উজাড় করে। এইরূপ কোন বিস্তীর্ণ স্থানে এক রোগ হইলে তাহাকে সেই রোগের Epedemic এপিডেমিক বলে। যেমন এপিডেমিক জ্বর

হয়, কলেরারও এপিডেমিক সেই রকম হয়। অর্থাৎ এক সময়ে কোন বিস্তীর্ণ স্থানের অনেক লোক ঐ রোগে মরে।

কলেরা এপিডেমিকের আর একটী বিষয় বড় চমৎকার দেখা যায়। কলেরা এপিডেমিকে অর্থাৎ কোন স্থানের জল হাওয়া খারাপ হইয়া যখন ওলাউঠা হইতে আরম্ভ হয়, তখন প্রথম কতকগুলি লোকের এত বেশী রকম সাংঘাতিক ওলাউঠা হয় যে, তাতে প্রথম প্রথম যে সকল লোকদের এই রোগ হয় তাহারা প্রায় বাঁচে না। তার পরে হয়ত এক মাস দেড় মাস কি তাহারও অধিক দিন সেই গ্রামে কি সেই দেশে আরও অনেক অনেক লোকের ঐ রোগ হয়, কিন্তু সে সমস্ত রোগীর অধিকাংশ বাঁচে। জ্বরের এপিডেমিকও কতকটা এ রকম হয় বটে, কিন্তু ওলাউঠার এপিডেমিকে যেমন স্পষ্ট দেখা যায়, জ্বরের এপিডেমিকে এটা তত স্পষ্ট সকল সময় দেখা যায় না।

কোন বিশেষ, অল্পস্থানের বা কোন বাড়ীর হাওয়া খারাপ হইয়া যে পাড়াতে বা বাড়ীতে এক সময়ে অনেক লোকের এক পীড়া হয়, তাহাকে সে বেআরামের Endemic এণ্ডেমিক বলে। তবে সংক্ষেপে বেশী স্থান ব্যাপিয়া ওলাউঠা বা অন্য রোগ হইলে সেই বেআরামের Epidemic এপিডেমিক আর সংকীর্ণ স্থানে বা কোন বাড়ীতে অনেক লোকের এই রোগ হইলে তাহাকে Endemic এণ্ডেমিক বলে।

BACILLUS ব্যাসিলস্।

এখনকার নূতন মতে অন্যান্য রোগের ন্যায় Cholera কলেরা রোগের এক রকম Bacillus ব্যাসিলস্ আছে, তাহা জলে বা অন্য কোন খাদ্য দ্রব্যের সহিত মিলিত হইয়া শরীরের ভিতর প্রবেশ করিলেই ঐ রোগ হয়। জল হাওয়া দূষিত হইলে জলে বা মাটিতে আপনা আপনি ঐ ব্যাসিলস্ উৎপত্তি হয়। কোন সঙ্কীর্ণ স্থানে অধিক লোকের সমাগম হইলে ব্যাসিলস্ উৎপত্তি হয়। ব্যাসিলস অতি ক্ষুদ্র, Microscope ভিন্ন দেখা যায় না। পূর্ব্বাবধি এ পীড়া সংক্রামক বলিয়া যে লোকের সংস্কার আছে তাহা এই নূতন মতে একরকম সত্য বটে। যে রোগীর কলেরা হয়, তাহার বাহ্যে, বমিতে ঐ ব্যাসিলস্ নির্গত হয়। আর যে স্থানে ঐ বাহ্যে বমি পড়ে বা রোগীর কাপড় চোপড় ধোয়া হয়, সে জলেও ব্যাসিলস্ মিশাইয়া যায়। অর্থাৎ যদি কোন পুষ্করিণী বা নদীর জলে অনেক ওলাউঠা রোগীর বাহ্যে বমি ধোয়া কি ফেলা হয়, তাহা হইলে হয় ঐ পুষ্করিণীর সমস্ত জলে ও নদীর অধিকাংশ জলে ঐ ব্যাসিলস্ মিশিয়া যায়। অতএব সেই জল পান করিলে অথবা সেই জলে কোন খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া খাইলে ওলাউঠার ঐ ব্যাসিলস্ শরীরে প্রবেশ করিয়া ঐ রোগ উৎপাদন করে। ব্যাসিলস্ এক প্রকার সজীব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদার্থ, সহজে মরে না বা নষ্ট হয় না, তবে জল খুব গরম করিয়া ফুটাইলেও তাহার পর ফিল্‌টার করিয়া লইলে কতকটা বাঁচাও আছে। সেই জন্যে যেস্থান কলেরার এপিডেমিক হয়, যে স্থান একেবারে

পরিত্যাগ করিতে পারিলেই ভাল। পরিত্যাগ করা যদি একেবারে অসম্ভব হয়, তবে জল ঐ রকম অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ফুটাইয়া ঐ জল ঠাণ্ডা হইলে ফিল্‌টার করিয়া পান করা আর ঐ ফিল্টার করা জলে খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করা অতি আবশ্যক। এরূপ করিলে জলের সঙ্গে কি খাদ্য দ্রব্যের সঙ্গে শরীরে ব্যাসিলস্ প্রবেশ করা অনেকটা নিবারণ হয়। তবে হাওয়াতে ব্যাসিলস্ মিশিলে নিবারণ করা একপ্রকার অসম্ভব। কোন পাড়াতে বা কোন বাড়ীতে ওলাউঠা হইলে খড় কি কাঠ দিয়া একটা বৃহৎ আগুণ করিয়া পোড়ান, বাড়ীতে গন্ধক পোড়ান বা কর্পূর পোড়ানতে ঐ স্থানের হাওয়া অনেকটা পরিষ্কার হয়। কোন কোন ডাক্তারেরা বলেন যে, কর্পূর বা কার্ব্বলিক য়্যাসিড ওলাউঠার সংক্রামকতা নিবারণ করে। শরীরের সঙ্গে একটু তামা রাখিলে ও ওলাউঠার বিষ তত অনিষ্ট করিতে পারে না। আর ইহার জন্যে একটা বেশ সহজ উপায় আছে। ওলাউঠা যেখান হইতে আরম্ভ হয়, সেখানকার লোকের ছেলে বুড় সকলেরই একটা পয়সায় ছেঁদা করিয়া ঘুন্‌সীর ভিতরে গলাইয়া দিয়া কোমরে রাখিলেই বেশ কাজ হইতে পারে।

ওলাউঠার বাহ্যে বমি যেখানে ফেলা হয়, সেখানে কতকগুলি গুঁড়া চূণ বা কার্ব্বলিক য়্যাসিড ঢালিয়া দেওয়া উচিত। আর রোগীর ঘরে কার্ব্বলিক য়্যাসিডে একটু জল মিশাইয়া ছিটাইয়া দিলে ঐ রোগী ও যাহারা তাহাকে শুশ্রূষা করেন, সকলকার পক্ষেই ভাল। Disinfectant Powder ডিসিন্‌ফেক্ট্যাণ্ট পাউডার বা Phenyl ফেনিল্ বা আলকাতরা এই অভিপ্রায়ে ব্যবহার হয়।

ওলাউঠার চারিটী অবস্থা।

১ম। উপক্রমাবস্থা (Stage of incubation), ২য়। বিকাশ অবস্থা (Stage of development), ৩য়। কোলাপস্ (Collapse), ৪র্থ। প্রতিক্রিয়ার অবস্থা (Stage of reaction).।

প্রথম।—উপক্রমাবস্থা বা পীড়ার সূত্রপাত। ইহাকে ডাক্তারেরা কলেরার (Incubation Stage) ইন্‌কিউবেসন ষ্টেজ বলেন। উপক্রমাবস্থা বা পীড়ার সূত্রপাতে ওলাউঠা হইবার পূর্ব্বে কতকগুলি লক্ষণ আছে। আর সেই সকল লক্ষণ অল্প দিন শরীরে উপস্থিত থাকিয়া তার পর প্রকৃত কলেরা হইতে পারে। আর ঐ উপক্রমাবস্থা কোন সময়ে একটু বেশীদিনও থাকে, বেশীদিন থাকিয়া পরে বেআরাম ঠিক জন্মাইলে রোগটী সাধারণতঃ তত কঠিন হয় না। কিন্তু ঐ রোগের বিষ শরীরে প্রবেশ করিয়া অল্প সময়ের মধ্যেই যদি রোগ জন্মাইয়া কঠিন করিয়া তুলে, তবে রোগটীও সেই পরিমাণে বেশী সাংঘাতিক হয়।

রোগ উপস্থিত হইবার পূর্ব্বের লক্ষণ।

অর্থাৎ উপক্রমাবস্থার লক্ষণ;—প্রথম হইতে পেটের দোষ অর্থাৎ দিনরাত্রে ৫।৬ বার পাতলা বাহ্যে হয় ও পেটে একটু একটু বেদনা থাকে। প্রথম ২।১ দিন পাতলা মল বাহ্যে হয়, তার পরে ক্রমে ক্রমেই বেশী পাতলা হয়, তখনও বাহ্যের রং সাদা নয়, কিন্তু সবুজ, পরে একেবারে সাদা হয়। রোগী পূর্ব্বাপেক্ষা একটু দুর্ব্বল হয়। সময়ে সময়ে মাথাধরা, অথবা মাথা একটু ভার ভার থাকে। রাত্রিতে ভাল ঘুম হয় না, যেন কেমন এক রকম কষ্ট হয়। ক্ষুধা

থাকে না। আর ক্ষুধা না থাকিলেও কখন তৃষ্ণা বেশী থাকে, কখন ক্ষুধা তৃষ্ণা কিছুই থাকে না। মুখ বিস্বাদ বা তেতো, পেটে যেন একটা বাঁধ রহিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। পেট একটু ত্রকটু ফাঁপা থাকে; কখন শীত করে, কখন গরম বোধ হয়, কখনও সমস্ত মুখখানি যেন রক্তবিহীন, সর্ব্বদাই যেন বিষণ্ণ, কিছুই ভাল লাগে না, গলার স্বর একটু মোটা হয়, একটু গা বমি বমি করে। প্রায় সকল ওলাউঠা রোগীরই রোগ হইবার পূর্ব্ব হইতে এক দিন দুই দিন তিন দিন পাঁচ দিন সাত দিন পর্য্যন্ত এই রকম অবস্থা থাকে। তবে অনেক সময় অত লক্ষ্য করিয়া দেখা হয় না। এই অবস্থায় লক্ষণ না থাকিয়া হঠাৎ বেয়ারামের উৎপত্তি খুব কম হয়। আর হইলেও পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রোগ বড় সাংঘাতিক হয়।

দ্বিতীয় অবস্থা অর্থাৎ রোগের প্রকাশ অবস্থা।

ইহাকে ইংরাজীতে Stage of Development বলে। এই রোগের তিনটী প্রধান লক্ষণ;—বাহ্যে, বমি আর হাতে পায়ে খাইল ধরা। উপক্রমাবস্থার লক্ষণগুলি অত লক্ষ্য করিয়া দেখা থাক আর নাই থাক, হুড় হুড় করিয়া পাতলা বাহ্যে হওয়া, বমি হওয়া, আর হাত পায়ে খাইল বা আঁকড়ি হইলেই সামান্য লোকেও বুঝিতে পারে যে, ওলাউঠা হইয়াছে। প্রথম যখন রোগ আরম্ভ হয়, তখন বমি হইলে একটু যেন সুস্থ বোধ হয়, কিন্তু রোগ ক্রমে বৃদ্ধি হইলে প্রতিবার বমির পরই রোগী ক্রমেই কাহিল হয়। আর যত বমি বেশী হইতে থাকে, ততই হাত পা বুক পিঠ ঠাণ্ডা হয়, আর

খুব পিপাসা হয়। ঠাণ্ডা জল বা সরবত খাইতে দিলে, যেমন খায়, তেমনি বমি হয় আর বমির রং প্রথম সবুজ বর্ণ পিত্তের ন্যায়, কিন্তু ক্রমে যত বেশী বমি হয়, বমির রং আর সেরূপ সবুজ থাকে না, ক্রমে সাদা হইয়া আইসে। আর বাহ্যের সময় হড় হড় করিয়া পেট ডাকে। বাহ্যে যাইবার সময় হইতেই গা বমি বমি করে, আর বাহ্যে হইবার পরই বমি হয়। কখন কখন বাহ্যে বমি একত্রেই হয়। পায়ের হাঁটুতে, কোমরে, পেটে, হাতে, পায়ে, সামান্য বেদনা হয়, আর খাইল ধরিতে আরম্ভ করে। রোগী তখন উঠিতে হাঁটিতে পারে, শীত হয় বলিয়া গরম কাপড় গায়ে দেয়। কিন্তু বাহ্যে বমির জন্যে সুস্থির হইয়া থাকিতে পারে না। এখন রোগীর হাত পা কাঁপে শরীর আরও ঠাণ্ডা। কোন কোন সময় এ অবস্থায় আর কোন নূতন লক্ষণ না হইয়া রোগী দুই এক ঘণ্টার জন্যে একপ্রকার যেন সুস্থ থাকে। কোন কোন রোগীর বমি হইতে আরম্ভ হইলে বাহ্যে হওয়া খানিকটা বন্ধ থাকে, অর্থাৎ হয়ত দুই বার বাহ্যে হইবার পরই দশ মিনিট পাঁচ মিনিট অন্তর কেবল বমিই হইতে থাকে, বাহ্যে আর হয় না। এ রকম অধিকাংশ রোগীর প্রায় হাতে পায়ে তত খাল ধরা থাকে না। বস্তুতঃ এ রকম ওলাউঠা রোগীও অনেক দেখা যায়, যাহার আগা গোড়া খাইলধরা নাই। রোগ যখন প্রথম উপস্থিত হয়, তখন রোগীর দাঁতের মেড়ে আর জিব ভাল লক্ষ্য করিয়া দেখিলে রক্ত জমা জমা বোধ হয়। আর জিবের পিছন দিগে যেন সাদা হইয়া যায়। আর ধারে ধারে যেন একটী লাল রেখা থাকে। অনেক সময় রোগীর গলা একটু সড় সড় করে, গলায় একটু বেদনাও বোধ হয়, কোন জিনিষ

গিলিতে কষ্ট হয়। পেটে হাত দিয়া টিপিলে বেদনা বোধ করে। পেটে এক রকম শূল হয়, আর সেই শূল নাভীর গোড়া থেকে আরম্ভ হইয়া সমস্ত পেট ছাইয়া যায়। বাহ্যের সঙ্গে প্রথম একটু একটু প্রস্রাব হয়, তার পরে একেবারে প্রস্রাব বন্ধ হইয়া যায়। হাত দুটী চোপ্সান বা সিটা সিটা, বরফের মত ঠাণ্ডা, পাও ঠাণ্ডা, কিন্তু হাতের মত তত ঠাণ্ডা নয়। মুখও ঠাণ্ডা হইয়া যায়। তখন পর্য্যন্ত রোগীর চেহারা তত বদলাইয়া যায় না, তবে কোন কোন সময় রোগ যদি বড় বেশী হয় তবে চেহারা পরিবর্ত্তন হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। এইরূপে রোগ ক্রমশঃ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। তখন—

নাড়ীর লক্ষণ ;—নাড়ী বড় ক্ষীণ হয়, এলো মেলো গতি, অর্থাৎ মণিবন্ধে নাড়ীর ঠিক থাকে না, অর্থাৎ নাড়ী যে ধুক্‌ধুক্ করিয়া বহিতেছে, সেটার যেন গোলমাল হয়। ধুক্‌ধুকের সমান ভাব থাকে না। কখন বেশী হয়, কখন কম হয়। কখন হয়ত ধুক্ ধুক্ করিয়া শীঘ্র শীঘ্র চলে আর কখন সে ধুক্ ধুকনি আস্তে আস্তে পড়ে, আবার কখন যেন নাড়ী নাই বলিয়া বোধ হয়, আবার একটু পরে ধুক্ ধুক্ করিয়া আইসে। বাস্তবিক নাড়ীর অবস্থা দেখিলে মনে হয়, নাড়ী যেন ভয়ে কাঁপিতেছে, আর যেন কেমন যে এক রকম ব্যতিব্যস্ত হইতেছে, তা বলা যায় না। মানুষ যেমন ভয় পাইলে আলু থালু হইয়া কি করে, কি বলে, তাহার কিছু ঠিক থাকে না, নাড়ীরও যেন সেই অবস্থা। নাড়ী যেন তাহার অবস্থায় বেশ জানাইতেছে যে, তাহার কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত। আর শরীর ক্রমেই হিমাঙ্গ হইয়া আসিতে থাকে। প্রথম, পায়ের দিক ঠাণ্ডা হয়, তার পর হাতের দিক। আর হাত পা

যেন কেমন এক রকম নীলবর্ণ হয়, মুখও বিবর্ণ হইয়া যায়। চক্ষু একেবারে খোলে পড়ে। চক্ষের মাংসপেশীগুলি অন্য অন্য মাংসপেশীর ন্যায় তত সবল নয়, সেই জন্য অন্য অন্য মাংসপেশীর আগেই চক্ষের মাংসপেশী নিস্তেজ হইয়া পড়ে, কাজেই চক্ষু দুটী একেবারে খোলে পড়িয়া যায়। নাক ও জিব ঠাণ্ডা হয়। ঠোঁট দুটী নীলবর্ণ। রোগী আর উঠিতে পারে না। প্রতিবার বাহ্যে হইবার পরেই হাতে পায়ে খাইল ধরে। বাহ্যেও ক্রমে অধিক হইতে আরম্ভ হয়. আর একেবারে সাদা বর্ণ। আর বাহ্যের সঙ্গে সাদা ছাকনা ছাকনা অর্থাৎ ছিপ্‌ড়ে ছিপ্‌ড়ে দেখা যায়। আর মাংস ধোয়ানী জলের মত দুর্গন্ধ, বাহ্যের রং চেলনী জলের মত। বমিও ক্রমে বেশী হইতে থাকে। পূর্ব্বের মত বমি হইলে রোগীর আর তখন ভাল বোধ হয় না। বরঞ্চ বমির পর রোগী আরও বেশী অস্থির হয়। পেট বুক জ্বলে আর প্রতিবার বমির পর পেটে যেন একটা বাঁধ পড়ে, রোগী তখন সদাই অস্থির, কখন শীত করে, কখন গরম বোধ হয়। খাইল ধরা ক্রমেই বাড়ে, মুখটীও বিবর্ণ হয়ে চুপ্‌সে যায়। দেখ্‌লে যেন আর চেনা যায় না। কথা হাঁড়ির ভিতর থেকে বাহির হয়। চক্ষের আর সে রকম জ্যোতিঃ নাই ও শুষ্ক, নাকের ভিতরে যেন ধূলা পড়িয়াছে বোধ হয়। নাকের চারিদিকের মাংস চুপ্‌সে পড়িয়াছে বলিয়া নাকটী আগের চেয়ে একটু উঠা উঠা বোধ হয়। নাকের উপর বিন্দু বিন্দু কালঘাম হয়। তখন নাড়ী আর তত পাওয়া যায় না। রোগী ক্রমে আর কথা কহিতে পারে না। চিঁ চিঁ করে, আর সেই চিঁ চিঁ করিয়া খালি জল খাইতে চায়। তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যায়। রোগীর আর জীবন আশা নাই।

নিজেই বলে আর বাঁচিব না। মধ্যে মধ্যে খাল ধরিতেছে আর গেলুম গেলুম ডাক ছাড়িতেছে। এখন খালি হাতে পায়ে কেন, রোগীর সর্ব্বাঙ্গেই খাল ধরিতেছে। তবে সেই স্থানে অন্যে হাত দিয়া ঘসিলে বা টানিয়া ধরিলে বা শুঁটের গুঁড়া মালিস করিলে মধ্যে মধ্যে কমে। তবে তাতে কি ওলাউঠার খাল ধরা একেবারে বন্ধ হয়?

এইরূপে ওলাউঠা রোগের সমস্ত লক্ষণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইয়া একটী চরমাবস্থা প্রাপ্ত হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, রোগ ঐরূপ বৃদ্ধি হইয়া চরমাবস্থা প্রাপ্ত হইবার কোন নির্দ্ধারিত সময় নাই। তবে এই কথা বলা যাইতে পারে যে, অল্প সময় মধ্যে রোগ চরমাবস্থা প্রাপ্ত হইলে অধিক সাংঘাতিক হয়। বাস্তবিক, সময় যত অল্প, রোগও তত সাংঘাতিক বেশী। আর সময় যত বেশী, রোগ তত কম সাংঘাতিক হইতে দেখা যায়। যাহা হউক, সমস্ত লক্ষণ চরমা-বস্থায় উপস্থিত হইবার পরক্ষণেই হয় কোল্যাপ্স Collapse হইয়া অল্প সময়ের মধ্যে রোগীর প্রাণনাশ হয়, আর না হয়ত অল্পে অল্পে প্রতিক্রিয়া অর্থাৎ রিএকশন (Reaction) আরম্ভ হইয়া আস্তে আস্তে রোগী আরোগ্য হয়। কোল্যাপ্স হইলেই যে নিশ্চয় রোগী মরে এ কথা নহে, কোল্যাপ্সের পর প্রতিক্রিয়া অর্থাৎ Reaction আরম্ভ হইয়া রোগীকে বেশ সুন্দররূপে আরোগ্য হইতেও দেখা যায়। তবে কথা এই যে, চরমাবস্থার পর হয় কোল্যাপ্স হইয়া তাহার পর রিএকসন আরম্ভ হইয়া রোগ আরোগ্য হয়। আর না হয়ত কোল্যাপ্স বেশী সাংঘাতিক হইয়া কোল্যাপ্স অবস্থাতেই রোগীর মৃত্যু হয়। আবার চরমাবস্থার পর কোল্যাপ্স না হইয়াও রোগী আস্তে আস্তে রোগ মুক্ত হয়।

সংক্ষেপে চরমাবস্থার পর কোল্যাপ্স হইতেও পারে, আর কোল্যাপ্স না হইয়া আস্তে আস্তে রোগী আরোগ্য লাভ করিতেও পারে। আর কোল্যাপ্সের পর প্রতিক্রিয়া হইয়া রোগী পুনরায় সুস্থও হয় আর কোল্যাপ্স অবস্থায় মৃত্যু গ্রাসেও পতিত হয়।

এস্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে, চরমাবস্থার পরই হউক, আর রোগের সমস্ত লক্ষণ কতক সময় কম থাকিয়াই হউক, রোগীর দুইটী অবস্থা হইতে পারে। প্রথম প্রতিক্রিয়ার অবস্থা অর্থাৎ আরাম হইবার অবস্থা, যাহাকে ইংরাজিতে (Reaction) রিএক্সন বলে। দ্বিতীয় কোল্যাপ্স (Collapse) অর্থাৎ হিমাঙ্গ ইত্যাদি রোগীর যে লক্ষণ হয়। ভাল ভাল ডাক্তারেরা প্রতিক্রিয়ার অবস্থাকে এই রোগের তৃতীয় অবস্থা অর্থাৎ Third stage বলিয়া থাকেন। Collapse এর অবস্থাও এক হিসাবে রোগের তৃতীয় অবস্থা। তবে কি না, যে রোগে অল্প সময়ের মধ্যেই সমস্ত লক্ষণ অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি হইয়া রোগীর কোল্যাপ্স হয়, সে স্থলে রোগের দ্বিতীয় অবস্থা এত অল্প সময় থাকে যে, কোল্যাপ্সই রোগের দ্বিতীয় অবস্থা বলিয়া বোধ হয়; সে স্থানে কোল্যাপ্সের পরে প্রতিক্রিয়ার অবস্থা রোগের তৃতীয় অবস্থা বলা যায়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ওলাউঠার প্রথম অবস্থা অর্থাৎ উপক্রমাবস্থা, দ্বিতীয় অবস্থা রোগের পূর্ণ বিকাশ, তৃতীয় অবস্থা Collapse কোল্যাপ্স অর্থাৎ হিম অঙ্গ, চতুর্থ অবস্থা প্রতিক্রিয়া অর্থাৎ Stage of Reaction, ইহার মধ্যে কেবল একটী কথা আছে। যে স্থলে রোগের প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই Collapse কোল্যাপ্স হয়, সে স্থলে পূর্ণ বিকাশের অবস্থা আর Collapse অর্থাৎ হিমাঙ্গের অবস্থা বিশেষ লক্ষ্য করা যায় না। সে স্থলে পূর্ণ বিকাশ ও কোল্যাপ্সের

সীমা নাই বলিলেও হয়, অতএব, তখন কোল্যাপ্‌স্‌ অর্থাৎ হিম অঙ্গের অবস্থাই রোগের দ্বিতীয় অবস্থা বলিয়া পরিগণিত। আর কোল্যাপ্সের পরে যে প্রতিক্রিয়ার অবস্থা অর্থাৎ Stage of Reaction হয়, সেইটীই রোগের তৃতীয় অবস্থা। তবে কেবল রোগের দ্বিতীয় অবস্থা লইয়া একটু বিতণ্ডা রহিল। যেখানে Collapse কোল্যাপ্স হয়, আর পূর্ণ বিকাশের অবস্থা বিশেষ উপ-লব্ধি করিতে পারা যায় না, সেখানে Collapse কোল্যাপ্স অর্থাৎ হিম অঙ্গের অবস্থাই দ্বিতীয় অবস্থা। কিন্তু যেখানে Collapse কোল্যাপ্স মোটে হইল না, সে স্থলে রোগের সমস্ত লক্ষণের পূর্ণ বিকাশের অবস্থাকেই অবশ্য রোগের দ্বিতীয় অবস্থা বলিতে হয়। প্রতিক্রিয়া অর্থাৎ Stage of Reaction এই দুই রকম রোগেই তৃতীয় অবস্থা বলিয়া পরিগণিত আছে। অর্থাৎ যেস্থলে কোল্যাপ্সের পর প্রতিক্রিয়া অবস্থা, সে স্থলে কোল্যাপ্স অবশ্য রোগের দ্বিতীয় অবস্থা। আর যে স্থলে রোগের সমস্ত লক্ষণের পূর্ণ বিকাশের পর প্রতিক্রিয়ার অবস্থা আরম্ভ হয়, অর্থাৎ রোগী আরোগ্য হইতে আরম্ভ হয়, সে স্থলে পূর্ণ বিকাশের অবস্থা অর্থাৎ Stage of Devolopment নিশ্চয় দ্বিতীয় অবস্থা। কিন্তু ইহার মধ্যে একটী কথা আছে। ঠিক হিসাব মত ধরিতে হইলে রোগের উপক্রম অবস্থা যদি প্রথম অবস্থা হয়, তবে রোগের পূর্ণ বিকাশের অবস্থা অর্থাৎ Stage of Devolopment সর্ব্বদাই দ্বিতীয় অবস্থা বলিয়া পরিগণিত হওয়া উচিত। কারণ, রোগের উপক্রম অবস্থার পরেই কোল্যাপ্সের অবস্থা হইতে পারে না। উপক্রম অবস্থা ত কেবল রোগের আরম্ভ, আরম্ভ হইয়া অবশ্য রোগ ভাল করিয়া প্রকাশ হওয়া চাই। প্রকাশ হবার পর, তবে না রোগীর

Collapse কোলাপ্স অর্থাৎ হিম অঙ্গ ইত্যাদি হইবে। রোগের পূর্ণ বিকাশ না হইলে রোগীর Collapse কিরূপে হইতে পারে? যাহা হউক, এ বিষয় লইয়া বেশী বিতণ্ডা করিবার অধিক আবশ্যক দেখি না। এই পূর্ব্বোক্ত তিনটী অবস্থা ভিন্ন রোগীর আর একটী অবস্থা আছে, তাহাকে ভাল ভাল ডাক্তারেরা Typhoid Condition বলিয়া থাকেন। টাইফয়েড কন্‌ডিসন, প্রতিক্রিয়া অর্থাৎ Stage of Reactionএর অনুগামী। Collapseএর পরেই হউক আর পূর্ব্বোক্ত রোগের চরমাবস্থার পরেই হউক, অনেক সময় রোগী আরাম হইতে আরম্ভ হইবার পর, সেই আরোগ্যের পথে অনেক বিঘ্ন ঘটে। যেমন প্রতিক্রিয়ার অবস্থা আরম্ভ হইল, রোগীর হাত, পা, গা, গরম হইল, মণিবন্ধে বেশ নাড়ী আসিল, কিন্তু প্রস্রাব না হওয়া জন্য রোগীর মাথা গরম হইয়া Urœmia ইউরিমিয়া হইল, আর সেই Urœmia ইউরিমিয়া হইয়াই রোগী মরিল। আরোগ্যের পথে আরও অনেক কণ্টক আছে। এ সমস্ত কথা পরে বিশেষ করিয়া বলিব। রোগের চারিটী অবস্থার কথা এক রকম মোটামুটী বলিলাম। আর প্রথম উপক্রম অবস্থা, দ্বিতীয় রোগের পূর্ণ বিকাশের অবস্থা এক রকম বলিয়াছি। অবশিষ্ট দুইটী অবস্থার কথা নিম্নে বিশেষ করিয়া বলিতেছি।

সংক্ষেপে, প্রথম উপক্রমাবস্থা, দ্বিতীয় রোগের বিকাশ অবস্থা, তৃতীয় Collapse কোল্যাপ্স অথবা কোন সময়ে প্রতিক্রিয়ার অবস্থা, চতুর্থ কোল্যাপ্সের পরে প্রতিক্রিয়ার অবস্থা এবং পঞ্চম Typhoid টাইফইড অবস্থা। এই কয়েকটী অবস্থা ভিন্ন আরও একটী অবস্থা আছে। রীতিমত ইহা একটী ওলাউঠার অবস্থা নহে বটে, তথাপি এ সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক।

বিরাম অবস্থা।

কখন কখন ভেদ বমি ইত্যাদি ওলাউঠার সমস্ত লক্ষণ উত্তরোত্তর না বাড়িয়া কিছুকালের জন্য বিরাম অবস্থায় থাকে। ইহাকে ইংরাজীতে Stage of Remission অর্থাৎ ওলাউঠার বিরামাবস্থা বলে। আর এই বিরাম অবস্থার পর সমস্ত লক্ষণ পুনরায় দেখা দিয়া রোগীর মৃত্যুও ঘটিতে পারে, আর তাহার পর প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়া আস্তে আস্তে রোগী আরোগ্য লাভও করিতে পারে। এইরূপ বিরামাবস্থা হইয়াই হউক কিম্বা বিরামাবস্থা সকল অবস্থায় না হইয়াই হউক Collapse কোল্যাপ্স ও প্রতিক্রিয়ার অবস্থা সর্ব্বদা সমান। অতএব বিরামের পর যে কোল্যাপ্স বা প্রতিক্রিয়া হয়, তাহা আর পৃথক্ করিয়া বলিবার আবশ্যক নাই। তবে একটী কথা বলা আবশ্যক যে, বিরামের পর যদি আরোগ্য হইতে আরম্ভ হয়, তাহার ত কথাই নাই, কিন্তু রোগের সমস্ত লক্ষণ যদি পুনরায় দেখা দেয়, তাহা হইলে এ রোগে রোগীর প্রায় পরিত্রাণ নাই, অতি অল্প সময়ের মধ্যে রোগটী বিলক্ষণ সাংঘাতিক হইয়া উঠে ও রোগীর প্রাণ নাশ করে। সংক্ষেপে, এরূপ বিরামাবস্থা না হইয়া রোগ যে উত্তরোত্তর বাড়ে, তাহাতে বরং রোগীর পরিত্রাণ আছে, কিন্তু সমস্ত লক্ষণ কিছুকালের জন্য স্থগিত থাকিয়া পুনরায় আরম্ভ হইলে রোগীর প্রায় নিশ্চয় মৃত্যু হয়। এমন কি, চিকিৎসককে আর চক্ষে কাণে দেখিতে দেয় না, চিকিৎসার আর সময় পাওয়া যায় না। আমি দেখিয়াছি, রোগী বেশ ভাল ছিল, কিন্তু আধ ঘণ্টা, জোর এক ঘণ্টায় ঐ রোগীর অবস্থা এত পরিবর্ত্তন

হইয়া গেল যে, এ রোগী যেন সে রোগীই নয়, আর ঐ সময়ের মধ্যে মৃত্যু ঘটে।

আর একটী বড় আশ্চর্য্য কথা, এই রকম থেমে থাকার পর ২।৪ ঘণ্টা পরেই হউক আর এক দিন কি এক রাত পরেই হউক, যে সময়ে রোগ পূর্ব্বে প্রথম আরম্ভ হইয়াছিল, সেই সময় হইতেই পুনরায় বাড়িতে আরম্ভ হয়। অর্থাৎ শুক্রবারে যদি সকালে ৮টার সময় এই ব্যারামের প্রথম সূত্র হইয়া থাকে, আর যদি সমস্ত শুক্রবার উত্তরোত্তর রোগীর উপসর্গ বাড়িতে আরম্ভ হইল, পরে সমস্ত শনিবার রোগীর ও সব লক্ষণ আর না বাড়িয়া এক রকম তন্দ্রার অবস্থায় নিস্তেজ হইয়া রহিল, তার পরে যদি ঐ সব লক্ষণ আবার পুনরায় হয়, তবে রবিবার সকালে সেই ৮ টার সময় হইতেই রোগী আবার খারাপ হইতে আরম্ভ হইবে। কেননা রোগের আরম্ভ যে শুক্রবারে সকালে ৮ টার সময় হইয়াছিল। ওলাউঠার এই অবস্থা দেখিয়া অনেক ডাক্তারেরা বলেন যে, ওলাউঠাতে কখন কখন সবিরাম জ্বরের ন্যায় হইয়া থাকে। জ্বর যেমন আজ ১১টার সময় আসিলে কাল অন্য সময় না আসিয়া ঠিক সেই ১১টার সময়ই আসে, ওলাউঠারও রকম কতকটা সেই রকম। অর্থাৎ যেখানে লক্ষণের বিরাম হইয়া পুনরায় আগমন হয়, ঐ পুনরাগমন রোগের প্রথম আগমনের সময়ই হইয়া থাকে। যদি খানিকটা সময় ওলাউঠা রোগের সমস্ত লক্ষণ উত্তরোত্তর প্রবল না হইয়া কম হইয়া থাকে, আর ঐরূপ কম হইয়া থাকার পর যদি ঐ সব লক্ষণ পুনরায় হয়, তবে প্রথম যে সময়ে রোগ আরম্ভ হইয়াছিল, ঠিক সেই সময় হইতে ঐ সকল লক্ষণ কম থাকিবার পর আবার আরম্ভ হয়। তবে

সবিরাম জ্বরে, জ্বর ত্যাগ হইয়া রোগী এক রকম সুস্থ বোধ করে। ওলাউঠা রোগে রোগী তত সুস্থ বোধ না করুক, কিন্তু অনেকটা ভাল বোধ করে। আর চিকিৎসক ও রোগীর আত্মীয়েরা এক রকমে এরূপ ভাবে আশ্বস্ত হন যে, রোগী এক প্রকার আরোগ্য হইল। তাহার পর হঠাৎ ঐ যে সময় রোগ প্রথমতঃ আরম্ভ হইয়াছিল, সেই সময় হইতে আবার সমস্ত লক্ষণ দেখা যায়। রোগের লক্ষণ সমস্ত কম হইয়া রোগী একটু সুস্থ বোধ করিয়া যে কতক্ষণ থাকিতে পারে, তাহার কোন নিয়ম নাই। হয়ত এক দিন, দুই দিন, তিন দিন, চারি দিন, পাঁচ দিন রোগী ঐরূপ ভাল থাকে, কিন্তু এক দিন পরেই হউক, দুই দিন পরেই হউক, তিন দিন পরেই হউক, চারি দিন পরেই হউক আর পাঁচ দিন পরেই হউক আবার যখন রোগীর ভেদ বমি হইতে আরম্ভ হয়, তখন রোগ প্রথম যে সময়ে আরম্ভ হইয়াছিল, সেই সময়েই হইতে দেখা যায়।

পূর্ণবিকাশের পর প্রতিক্রিয়া হইতে পারে, আর পূর্ণবিকাশের পর কোল্যাপ্স হইয়া প্রতিক্রিয়া হইতে পারে। সেই জন্য কোল্যাপ্সের কথা বলিবার পর প্রতিক্রিয়ার কথা বলিবার আবশ্যক বিবেচনা করিলাম। অতএব বর্ত্তমানে কোল্যাপ্স সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলি।

COLLAPSE কোল্যাপ্স।

Collapse একটী ইংরাজি কথা, Collapseএর বাঙ্গালা মানে হ্যাতা প্যাতা হইয়া পড়া, যেমন গাছ পালার ডাল রৌদ্রেই হউক কি অন্য কোন কারণেই হউক নেতিয়ে পড়ে, সেই নেতিয়ে

পড়াকেই Collapse বলে। তবেই দেখ, নেতিয়ে পড়ার যে অবস্থা সেটি ঠিক কি? নেতিয়ে পড়ার এই অবস্থা কি না? যে, একেবারে ঐ ডালটী মরিয়া শুখাইয়া গেল না, আর ঠিক আগেকার মতন তাজাও রহিল না; গাছ পালারও ত মরণ বাঁচন আছে? আর তারও এক রকম জীবন আছে। যাহাই হউক, সেই রকম নেতিয়ে পড়াকেই কোল্যাপ্স বলে। অনেকে ত এ রকম দেখিয়াছেন যে, চৈত্র বৈশাখ মাসে লাউ গাছ কি অন্য কোন নরম গাছ রৌদ্রের সময় খুব নেতিয়ে পড়ে। সমস্ত গাছটী যেন আধমরা হইয়া যায়, আবার সকালে ঠাণ্ডার সময় যেমন গাছ তেমনি হয়। আবার রৌদ্রের সময় যে নেতিয়ে পড়ে, আর আধ মরার মতন দেখায়, সেই হইল ঐ গাছের কোল্যাপ্স অবস্থা। তবেই কোল্যাপ্স একটী এমন অবস্থা যে, সে অবস্থায় জীবিত পদার্থ এক রকম আধ মরা হইয়া থাকে। ঐ অবস্থার পরিবর্ত্তন হইলে ভালও হইতে পারে, আর ঐ অবস্থার পরিবর্ত্তন না হইলে মরিয়াও যাইতে পারে যেমন ঐ যে রৌদ্রে গরমে লাউ গাছের Collapse হইল, ঐ রৌদ্র আর গরমের পর আবার সন্ধ্যা ও রাত্রে ঠাণ্ডা হয় বলিয়া সকাল বেলায় যেমন গাছ তেমন হয়। কিন্তু যদি এমন সম্ভব হয় যে, ঐ যে ঠাণ্ডাতে আবার সুধরাইল, সে ঠাণ্ডা আর পাইল না, তাহা হইলে ঐ গাছটী ঠিক মরিয়া যাইবে কি না? নিশ্চয়ই মরিয়া যাইবে। তবেই কোল্যাপ্স যেন একটা আধ মরা অবস্থা, এ অবস্থা হইতে সুধরাইবার যদি কোন উপায় হয়, তাহা হইলে আবার ঠিক দস্তুর মত জীবিত হইতে পারে। আর যে অবস্থায় কোল্যাপ্স হইল, তাহার যদি আর পরিবর্ত্তন না হইল, তাহা হইলে মরিয়াও যাইতে পারে।

যেমন ঐ লাউ গাছ ২৪—৪৮ ঘণ্টা ঐ রকম রৌদ্র বা গরম লাগিলে একেবারে মরিয়া যায়। কোল্যাপ্সও মনুষ্যের একটী এই প্রকার অবস্থা। অর্থাৎ কোল্যাপ্সেতে মনুষ্য যেন আধ মরা হইয়া ন্যাতা প্যাতা হইয়া থাকে। আর হিমাঙ্গ তাহার একটী প্রধান লক্ষণ মাত্র। কোল্যাপ্‌সে কেন হিমাঙ্গ হয়, আর রোগীর মরিবার পূর্ব্বে বা জ্বর আসিবার পূর্ব্বে অন্যান্য অঙ্গ শীতল হইবার পূর্ব্বে হাত পা কেন আগে ঠাণ্ডা হয়, এ সব কথা পরে আরও ভাল করিয়া বলিতেছি। হিম অঙ্গ ঠিক কোল্যাপ্সের তরজমা নয়, যেমন মানুষ যখন বেঁচে থাকে, তাহার গা বেশ গরম থাকে, আর যখন মরিয়া যায়, তখন গা ত এক রকম পাঁকের মত ঠাণ্ডা হয়, তবে মানুষের আধ মরা অবস্থায় একটা মাঝামাঝি অবস্থা হওয়া উচিত কি না? অর্থাৎ সহজ শরীরের মত গরমও থাকিবে না, আর মরা শরীরের মত একেবারে ঠাণ্ডাও হইবে না, আর সে অবস্থায় হয়ত জায়গায় জায়গায় এমনিই ঠাণ্ডা যেন মরা শরীর, আর জায়গায় জায়গায় কতক কতক গরম থাকিবে। যদিও একেবারে সুস্থ অবস্থার মত গরম না থাকে, কতক কতক গরম থাকিবে। আর সেই অবস্থাই ঠিক কোল্যাপ্‌স্। অনেকের এরূপ ভুল বিশ্বাস আছে যে, কোল্যাপ্সের অবস্থায় রোগী জ্ঞানশূন্য হইয়া অজ্ঞান অচৈতন্য অবস্থায় থাকে। কোল্যাপ্স অবস্থায় সহস্ররূপে নিস্তেজ হইয়া বাহ্যিক লক্ষণে রোগী এক প্রকার অচৈতন্য অবস্থায় থাকিতে পারে বটে, কিন্তু কোল্যাপ্স অবস্থায় রোগীর একেবারে জ্ঞানশূন্য হয় না, এলো মেলো বকেও না। বাস্তবিক, কোল্যাপ্সের সঙ্গে মাথার কোন বৈলক্ষণ্যের সম্বন্ধ নাই, তবে কোল্যাপ্সের সঙ্গে মাথার কোন বৈলক্ষণ্য থাকিতেও পারে, না থাকিতেও পারে।

যেমন কোন কারণে নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া মৃত্যু হইলে মাথার কোন বৈলক্ষণ্য থাকে না, আবার যেমন সন্ন্যাস রোগে মাথায় রক্ত জমিয়া শরীর নির্জীব হইতে পারে অর্থাৎ কোমা হইতে পারে, এস্থলে মাথার বিকৃতি রহিল, আসল কথা কোল্যাপ্সের সঙ্গে শরীরের বিকৃতি কি স্বাভাবিক অবস্থা তার সঙ্গে সম্বন্ধ নাই, কেবল শরীরের আধ মরা অবস্থাকে কোল্যাপ্স বলে। কারণ কোল্যাপ্‌স্‌ এমন একটী অবস্থা যে, কোল্যাপ্সের সময় মানুষ বেঁচে আছে সত্য, কিন্তু বেঁচে থাকার কোন কাজই তাহাকে দিয়া হইতেছে না, আধমরা হইয়া পড়িয়া আছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কোল্যাপ্‌স্‌ একটী আধমরা অবস্থা, ইহাতে শরীরের কোন অংশের বিকৃতি বুঝায় না।

কোল্যাপ্‌সের সম্বন্ধে যে সব কথা বলিলাম, এর সঙ্গে আর একটা কথা মনে করিয়া লইতে হইবে, Collapse আধমরা অবস্থা বটে, কিন্তু সেই আধমরা অবস্থা হঠাৎ হওয়া চাই। আর কোল্যাপ্‌স্‌ এমন একটী আধ মরা অবস্থা, যাতে বাঁচন মরণের সমান সম্ভব। কেননা মানুষ যে রকম রোগেই মরুক, মরার আগে ত আধ মরা অবস্থা হইবেই, কিন্তু সে রকম আধ মরা অবস্থাকে Collapse বলে না। মনে কর একটী হাঁড়িতে কতকগুলি গন্‌গনে আগুণ তুলিয়া যদি সেই হাঁড়িটীতে এমন করিয়া একটী সরা ঢাকা দেওয়া যায় যে, হাঁড়ির ভিতরে কোন রকমে হাওয়া যাইতে না পারে, তবে সেই আগুণগুলি নিভে, সমস্ত কয়লা পড়িয়া যাইবে, এ কথা আমাদের মেয়েরা ভাল জানে। এই রকম করিয়া কয়লা করিলে জল দিয়ে আগুণ নিভাইয়া কয়লা করার চেয়ে ভাল হয়। যাহা হউক, মনে কর যদি ঐ রকম

করিয়া হাঁড়িটী বন্ধ করা যায়, ত সব আগুণ কয়লা পড়িয়া যাইবে। আর মনে কর, ঐ সরা খানিকটা রাখিয়া অর্থাৎ সমস্ত আগুণ যখন আধ নিভ নিভ হইয়াছে, তখন সরাখানি একেবারে খুলিয়া দেওয়া হইল, আর খুলিয়া দেওয়াতে আগুণ হাওয়া পাইয়া, অল্প সময়ের মধ্যেই আবার সেই রকম গণ্‌গণে হইয়া উঠিবে। আবার মনে কর, সরাখানি একেবারে খুলে না দিয়ে একটু খুলিয়া দিলে, তাহা হইলে, অর্থাৎ ভাল করিয়া খুলিয়া না দিলে হয় ত কতক জায়গার কয়লা আগুণ ধরিয়া আগুণ হইল, আর সেই কয়লা পুড়ে ছাই হইল, আর কতকগুলি কয়লা বাতাস না পাইয়া মোটেই ধরিল না। আর একটী অবস্থা মনে কর যে, এতক্ষণ সরা ঢাকা রহিয়াছে যে, প্রায় সমস্ত আংরাই কয়লা পড়ে গিয়াছে, দুই এক জায়গায় একটু আধটু ফিন্‌কুটী মাত্র আছে, ঐ রকম অবস্থায়, উপরের সরাখানি তুলিয়া ক্রমাগত বাতাস দিতে দিতে, আবার সে কয়লাগুলি পূর্ব্ব মত গণ্‌গণে আগুণ হয় কি না? আবার মনে কর, ঐ আগের মত হাঁড়িতে আংরা তুলিলে, কিন্তু সরা ঢাকা দিলে না, আগুণগুলি ক্রমে সমস্ত পুড়ে ধুস হইয়া ছাই হইয়া গেল, আর হয়ত সমস্ত ছাই হয় নাই, ২।১টী ফিন্‌কুটী আছে, কিন্তু কয়লা তাতে একখানিও নাই, সব পুড়ে ছাই হইয়া গিয়াছে, এ অবস্থায় হাজার পাখার বাতাস দিলে কি আর আগুণ গণ্‌গণে হয়? কয়লা থাকিলে ধরিয়া আগুণ আবার গণ্‌গণে হইতে পারে, কিন্তু কয়লা যদি পুড়ে ছাই হইয়া যায়, ছাই কি আর ধরে? এই সকল অবস্থা গুলিতে কোল্যাপ্‌স্‌ কি তা অমনি বুঝা উচিত। যা হউক, তবু ভাল করিয়া বলি, মনে কর হাঁড়ির আগুণ, মানুষের জীবন, সরা ঢাকা কোল্যাপ্‌সের

অবস্থা। ঐ সরা ঢাকা যদি ক্রমাগত থাকে অর্থাৎ মোটে আর খোলা না হয়, তবে হাঁড়ির আগুণ যেমন একেবারে নিভে যায়, কোল্যাপ্‌স্‌ জীবনরূপ আগুণকেও সেই রকম করিয়া নিভাইয়া ফেলিতে পারে। আর সরাখানি একেবারে তুলে লওয়া কোল্যাপ্স থেকে একেবারে নিরস্ত পাওয়া, তা হইলেই অল্প সময়ের মধ্যে জীবনআগুণ আবার পূর্ব্বেকার মত সুস্থ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। যাহাকে কোল্যাপ্সের পর Complete Reaction বলে। আর, আর একটী অবস্থার কথা যা বলিয়াছি যে, সরাখানি একটু খোলা হইলে আগুণ একটু একটু ধরে, আর সেখানকার কয়লাগুলি পুড়ে ছাই হইয়া যায়, সমস্ত কয়লাগুলি ধরে না, আর হয় ত আস্তে আস্তে সমস্ত কয়লা ধরিতে পারে, আর না হয় ত যেখানকার কয়লা ২।৪ খানা ধরিল, সেই ২।৪ খানা কয়লা পুড়ে ছাই হইল, অন্য জায়গার কয়লা যেমন তেম্‌নি রহিল, আগুণ নিভে গেল; এই অবস্থাগুলি কোল্যাপ্‌সের পর Incomplete Reaction এর অবস্থা। অর্থাৎ অসম্পূর্ণ প্রতিক্রিয়া। অর্থাৎ Collapse এর জীবনের কতক আশা হইল, কিন্তু ভাল করিয়া Reaction হইল না বলিয়া রোগী মরিল। হয় ত অনেক দিনে রোগী ভুগে ভুগে বাঁচিল, যেন আস্তে আস্তে অনেকক্ষণের পর সমস্ত কয়লাগুলি ধরিল।

আরও দুটী অবস্থার কথা বলিয়াছি, অর্থাৎ একটী অবস্থা সরা ঢাকা দেওয়ার জন্যে প্রায় সমস্ত আগুণই নিভেছে, সবই কয়লা পড়েছে, ২।১টী ফিন্‌কুটী আগুণ আছে, অর্থাৎ কোল্যাপ্‌সের রোগী এখন মরে, তখন মরে, এমন সময় কোল্যাপ্‌সের অবস্থা গেল অর্থাৎ সরা খুলিয়া দেওয়া হইল, আর পাখার বাতাস স্বরূপ

সুচিকিৎসা হওয়াতে আবার আগুণগুলি বেশ ধরিল অর্থাৎ রোগী বেশ বাঁচিল। অতএব এখন মরে তখন মরে রোগী পুনরায় বেশ ভাল হইল, কিন্তু বাঁচিল কেন? ঐ কয়লা ছিল বলিয়া, অর্থাৎ কোল্যাপ্স জীবন-আগুণকে ঢেকে, কয়লা করিয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু ছাই করে নাই। আর একটী অবস্থার কথা বলিয়াছি, অর্থাৎ সমস্ত আগুণই পুড়ে ছাই হইয়া গিয়াছে, মাত্র ২।১ ফিণ্‌কুটী আছে, আর সে সময় যেমন হাজার পাখার বাতাস দিলেও আর আগুণ ধরিতে পারে না, তেম্‌নি রোগী যখন অন্ত অবস্থায়, অর্থাৎ সে অবস্থাটী কোল্যাপ্সের অবস্থা নয়, মরিতেছে, তখন হাজার পাখার বাতাস দিলে সে আগুণ আর ধরে না। এই দুইটী অবস্থার তফাৎ ঠিক বুঝা উচিত। কারণ কোল্যাপ্সের এখন মরে তখন মরে যে রোগী, তারও বাঁচিবার আশা আছে, আর কখন কখন বাঁচিয়াও যায়, কারণ কতকটা জীবন যেন তখনও থাকে, কিন্তু ঢাকা থাকে বলিয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়, যেন কয়লা পড়ে থাকে। সুবিধা পাইলেই আবার অম্‌নি ধরিয়া উঠে। কিন্তু ছাই আর ধরে না, সেই জন্য অন্ত অবস্থায় বা অন্য রোগে যখন জীবন নিঃশেষ হইতেছে, তখন সমস্ত জীবন-আগুণ জ্বলিয়া ছাই হইয়াছে মনে করিতে হইবে। তখন আগুণের ফিণ্‌কুটীতে বাতাস দিলে ত আর ছাই ধর্‌বে না অর্থাৎ তখন হাজার চেষ্টা কর, রোগী আর বাঁচিতে পারে না। এখন ঠিক বুঝা উচিত, কোল্যাপ্সের অবস্থাটী কি? আর কোল্যাপ্সের আধমরা অবস্থা, কয়লার সহিত অল্প হউক বেশী হউক আগুণ থাকার অবস্থা। আর ছাইয়ের সহিত অল্প আগুণ থাকা সেটী একেবারে নিশ্চয় মৃত্যুর পূর্ব্বের আধমরা অবস্থা। কয়লার সঙ্গে একটু একটু আগুণ থাকাও আধমরা

অবস্থা বটে, কিন্তু এই অবস্থার আর সমস্ত ছাইয়ের সঙ্গে অল্প একটু আগুণ থাকায় যে তফাত, মৃত্যুর পূর্ব্বে আধমরার অবস্থা আর কোল্যাপ্সের আধমরা অবস্থায় সেইরূপ প্রভেদ। কোল্যাপ্সের আধমরা অবস্থাতে এমন একটা কোন জিনিস আছে, যাতে রোগী আবার ঠিক পূর্ব্বমত জীবিত হইতে পারে, কিন্তু যে রোগী মরিতেছে, তাহার আধমরা অবস্থাতে ঐ রকম জিনিস কিছু নাই। তবেই হইল যে, কোল্যাপ্সে রোগী মরে না তা বলি না, তবে কি না কোল্যাপ্সে রোগীর পাঁচ মিনিট পূর্ব্বে পর্য্যন্ত যেন বাঁচিবার আশা থাকে। কোল্যাপ্স হয় নাই, কিন্তু রোগী মরিতেছে, হয়ত তার একমাস কি দুইমাস আগে থেকে চিকিৎসকেরা বলিলেন, এ রোগী বাঁচিবে না।

জ্বর ও ওলাউঠা বিষের একটী স্বধর্ম্ম এই যে, অতি অল্প সময়ের মধ্যেই কোল্যাপ্স আনিয়া উপস্থিত করে। আর ঐ কোল্যাপ্সেতেই রোগী ভত অল্প সময়ে এমন মরণাপন্ন হইয়া পড়ে। কারণ এরূপ অধিক দেখা গিয়াছে যে, একজন. জোয়ান পুরুষের খারাপ রকম ওলাউঠা হইলে দুই তিনবার বাহ্যে বমির পরই কোল্যাপ্সে একেবারে মরণাপন্ন হইয়া পড়ে। বাহ্যে বমি হইলে রোগী যে এরূপ দুর্ব্বল হইবে, তাহা যেন কতকটা এক রকম মনে করিয়া লওয়া যাইতে পারে। কিন্তু Dry Cholera ড্রাই কলেরাতে রোগীর হয়ত একবার সহজ বাহ্যে হইল, বমি মোটেই হইল না, কিন্তু তাহার পরই রোগীর হিম অঙ্গ হইয়া নিঃশ্বাস ঘন ঘন পড়িতে আরম্ভ হইল, আর অল্প সময়ের মধ্যেই রোগী যেন একেবারে আধমরা। এই সকল দেখিয়া স্পষ্ট বোধ হয় যে, বাহ্যে বমি ইত্যাদি ওলাউঠার বাহ্যিক লক্ষণ ভিন্ন অবস্থা

অন্য কোন কারণ আছে, যেজন্য রোগী এত অল্প সময়ে এত বেশী দুর্ব্বল হয় অথবা শরীরের সমস্ত তেজ নির্গত হইবার পূর্ব্বেই যেন অন্য কারণে ঐরূপ মরণাপন্ন হয়। যে রোগী অধিক দিন পুরাতন রোগে ভুগিয়া পরে মরণাপন্ন হইয়াছে, তাহার ত জীবন ক্রমে ক্রমে একেবারে নিঃশেষ হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু কোল্যাপ্সে ওরূপ ক্রমে ক্রমে জীবন বা শরীরের বীর্য্য ক্ষয় হইবার সমধিক সময় হইল না? তবেই একথা সহজে বুঝা যায় যে, রোগীর শরীরের সমস্ত বলবীর্য্য একেবারে ক্ষয় হয় নাই, কিন্তু তথাপি রোগীর এই মরণাপন্ন অবস্থা। অতএব শরীরের বল বীর্য্য একেবারে নাশ হইয়া শরীর এরূপ মরণাপন্ন হওয়া ভিন্ন এ স্থানে অন্য কোন কারণ আছে, যে জন্য রোগী হঠাৎ এরূপ মরণাপন্ন হইয়া পড়িল। অতএব যে বিষ শরীরে প্রবেশ করিয়া ওলাউঠার লক্ষণ উপস্থিত করিল, সেই বিষই অধিক পরিমাণে শরীরে প্রবেশ করিলে রোগীকে শীঘ্র ঐরূপ যাহার পর নাই দুর্ব্বল করিয়া মরণাপন্ন করিয়া ফেলে। কারণ শরীরের বল বীর্য্য ক্ষয় হইবার সমধিক সময়ের পূর্ব্বেই যখন রোগী এতদূর নিস্তেজ হইয়া আধমরা হইয়া পড়িল, তখন ওলাউঠার বিষ শরীরে যে প্রবেশ করিয়া রোগীর এইরূপ অবস্থা হইল, তাহা ভিন্ন ইহার কারণ ত আর কিছু দেখা যায় না। স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, শরীরের সমস্ত বল বীর্য্য তখন একেবারে নিঃশেষ হয় নাই, কিন্তু তথাপি রোগীর এরূপ অবস্থা ঘটিল। কেননা, বল বীর্য্য অনেকটা অবশিষ্ট থাকিতে থাকিতেই অবশিষ্ট বল বীর্য্যকে যেন কোন একটা জিনিস একেবারে ঢাকিয়া ফেলিল আর সেই ঢাকিয়া রাখার অবস্থাই কোল্যাপ্স। ওলাউঠা ও আমাদের দেশে ম্যালে-

রিয়া জ্বরে এইরূপ কোল্যাপ্স অধিক হইয়া থাকে। আর পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ভাল ভাল ডাক্তারেরা বলেন যে, ম্যালেরিয়া জ্বরের ও ওলাউঠা বিষের প্রকৃতি এক। কি কারণে যে ওলাউঠার বিষে কোল্যাপ্স এত শীঘ্র হয়, ওলাউঠার কারণ বলিবার সময় একথা ভাল করিয়া বলিব।

কোল্যাপ্সের অবস্থা।

কোল্যাপ্স হইলে রোগী অনেকটা নিস্তেজ হইয়া পড়ে, বাহ্যে বমি তত হয় না, কিন্তু অসহ্য পিপাসা থাকে। অনেক সময় জলপানের এত আগ্রহ যে, রোগী যে এত দুর্ব্বল, তথাপি জল দেখিলে একেবারে উঠিয়া বসে। পিপাসার তাড়নায় বারে বারে রোগী জল খায় বটে, কিন্তু অনেক সময় জল খাইবার পরেই বমি হয়, আর সেই বমিতেই আরও কাতর হইয়া পড়ে। নাড়ীও ক্রমেই ডুবে যায়। অনেক কোল্যাপ্সের রোগীর মণিবন্ধে দূরে থাক, বগলেও নাড়ী পাওয়া যায় না। জীব, হাত, পা বরফের মত ঠাণ্ডা হয়, কিন্তু রোগীর শরীরের ভিতরে দাহ অধিক বেশী। হাত পা মরা শরীরের মত চুপ্সাইয়া নীলবর্ণ হইয়া যায়। চক্ষু খোলে ডুবিয়া পড়ে, স্বর যেন হাঁড়ির ভিতর হইতে বাহির হইতেছে বোধ হয়। আর স্বর ক্রমে এত মৃদু হইয়া পড়ে যে, রোগীর মুখের নিকট কাণ লইয়া গেলেও তাহার কথা ভাল করিয়া শুনা যায় না। কপালে সামান্য বিন্দু বিন্দু ঘাম হয়, আর অনেক সময় রোগী আর বাহ্যের কথা বলিতে পারে না, আপনি আপনি একটু একটু জলের মত বাহ্যের দ্বার দিয়া গড়াইয়া পড়ে, আর বাহ্যের সঙ্গে কখন কখন

ছেক্‌ড়া ছেক্‌ড়া রক্তও থাকে, আর কখন কখন বাহ্যে বমি বন্ধ হইয়া পেট দম্‌সম্‌ হইয়া ফুলে। ওলাউঠা রোগীর পেট ফুলা অবস্থা একটু ভয়ের কথা। নিশ্বাস ঘন ঘন পড়িতে থাকে, আর রোগী অল্প সময়ে এত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে যে, বিছানায় শুইয়াও এপাস ওপাস করিতে পারে না। নির্জীব জড় পদার্থের মত পড়িয়া থাকে, কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কোল্যাপ্স অবস্থায় জ্ঞানের বৈলক্ষণ্য কিছু হয় না বলিয়া রোগী নিজে কথা কহিতে পারে না বটে, কিন্তু সেই ঘরের ভিতরে যে কথা হয় তাহার প্রতি বিলক্ষণ লক্ষ্য রাখে। এই কোল্যাপ্সের অবস্থা সচরাচর ৪ ঘণ্টা হইতে ১২ ঘণ্টা পর্য্যন্ত থাকে, তাহার পর বাহ্যে বমি একেবারে বন্ধ হইয়া যায়, আর বাহ্যে বমি একেবারে বন্ধ হইবার পর রোগী আর অনেকক্ষণ বাঁচে না। খানিক নিস্তব্ধ হইয়া পড়িয়া থাকে, আর তাহার পর হয়ত একবার বাহ্যে কি বমি হয়, আর ঐ বাহ্যে কি বমিতেই যেন অবশিষ্ট জীবনটুকু বাহির হইয়া যায়। ঐ বাহ্যে ও বমির অব্যবহিত পরক্ষণেই রোগীর একেবারে শ্বাস উপস্থিত, খাবি খাইতে থাকে, আর তাঁহার পাঁচ, সাত, দশ মিনিট পরেই রোগীর মৃত্যু। আবার ঐরূপ ১০।১৫ ঘণ্টা কোল্যাপ্স অবস্থায় থাকিয়া রোগীকে আরামও হইতে দেখা যায়। কিন্তু ইহাতে একটী কথা আছে। যে রোগীর ব্যায়রাম উপস্থিত হইবার অল্পক্ষণ পরেই কোল্যাপ্স হয়, সে রোগীর কোল্যাপ্স হইতে বাঁচিবার আশা অধিক। কিন্তু যে রোগীর ১০।১২ ঘণ্টার পর কোল্যাপ্স হয়, তাহার কোল্যাপ্স হইতে রক্ষা পাওয়ার সম্ভাবনা খুব কম।

এস্থলে বলা আবশ্যক যে, কোল্যাপ্স অবস্থায় স্ত্রীলোকদিগের প্রায়ই জননেন্দ্রিয় হইতে রক্তস্রাব হয়, কখন কখন এত রক্ত-

স্রাব হয় যে, রোগীর পরনের কাপড় সমস্ত ভিজিয়া যায়, এমন কি, বিছানা পর্য্যন্ত ভিজিয়া যায়। এ অবস্থায় গর্ত্তস্রাবও হয়, কিন্তু গর্ত্তস্রাব জননেন্দ্রিয় হইতে রক্তপড়া অপেক্ষা বেশী সাংঘাতিক লক্ষণ। বেশীদিনের গর্ত্তপাতে তত ভয়ের কথা নয়, কিন্তু তিন চারি মাসের গর্ত্তপাত হইলে রোগীর প্রাণ লইয়া টানাটানি হয়। আমাদের পূর্ব্বাপর প্রথা আছে এই যে, গর্ত্তবতী স্ত্রীলোকের মৃত্যু হইলে মৃত দেহের পেট ফাড়িয়া ছেলেটী বাহির করিয়া শব দাহ করিতে হয়। মূলে এপ্রথাটীর একটী বেশ অর্থ আছে, কারণ অনেক সময় মৃত্যুর পরক্ষণেই ছেলেটী ঐরূপে বাহির করিতে পারিলে, স্বাভাবিক প্রসূত সন্তানের ন্যায় ঐ ছেলেটীও স্বচ্ছন্দ-ভাবে জীবিত থাকিতে পারে। কিন্তু এখন এই প্রথাটী রীতি রক্ষার ন্যায় প্রতিপালন করা হয়, কারণ হয়ত ১২।২৪ ঘণ্টার পর একে-বারে সৎকার স্থলে ছেলেটী বাহির করিয়া ঐ শব দেহেই রাখিয়া দাহ করা হয়। বাস্তবিক, ছেলেটীকে বাঁচানর চেষ্টা কাহার মনে একবার আসেও না, এমন কি, অনেকেই বোধ হয় জানেন না যে, গর্ত্তবতী স্ত্রীলোকের মৃত দেহ ফাড়িয়া ছেলেটী বাহির করিয়া কেন শব দাহ করিতে হয়।

কোল্যাপ্স অবস্থায় আর একটী লক্ষণে বড় ভয় আছে, পেট একটু একটু ফাঁপিয়া আছে, আর আধ রক্তানির মত বা একেবারে কাল মরা রক্তের ন্যায় বাহ্যে হইতেছে, এ অবস্থাটী বড় মন্দ, এ অবস্থা হইলে রোগীর জীবন আশা একেবারে নাই বলিলেও হয়। এ অবস্থাটী যে এত সাংঘাতিক তাহার কারণ এই যে, ঐ যে রোগীর পেট ফুলিয়াছে, ইহাতেই স্পষ্ট বুঝা যায় যে, রোগীর পেটের নাড়ীতে প্রদাহ হইয়াছে। আর ঐ

রোগী একেবারে নিস্তেজ, অর্থাৎ জীবনাগুণ একেবারে অর্দ্ধ নির্ব্বাণ বিধায় সেই প্রদাহেই পেটের নাড়ী ফুলিয়া একেবারে পচিয়া উঠিয়াছে। সেই জন্যে কোল্যাপ্স অবস্থায় ঐরূপ বাহ্যে হইলে রোগী আর বাহ্যের কথা বলিতে পারে না, আর বাহ্যেও স্বাভাবিক মতন না হইয়া সর্ব্বদাই যেন গুহ্যদ্বার হইতে একটু একটু চোয়াইয়া পড়ে, আর বাহ্যেতে ভারি দুর্গন্ধ, সমস্ত ঘরেতে দুর্গন্ধে লোক তিষ্টিতে পারে না। আর কেনই বা না হবে? ওত বাহ্যে নয়, একেবারে যে নাড়ী পচিয়া পড়িতেছে, অতএব পচা জিনিসের যে দুর্গন্ধ ইহা'রও সেইরূপ।

কোল্যাপ্স অবস্থার আর একটী কথা বলা আবশ্যক, কখন কখন কোল্যাপ্স হইবার অতি অল্পক্ষণ পূর্ব্ব হইতেই বুকের নীচে, অর্থাৎ পাঁজর যেখানে শেষ হইয়া পেট আরম্ভ হইয়াছে, সেই স্থানে একটী অসহ্য বেদনা হয়, বেদনাটী বরাবর পাঁজরার নীচে নীচে লম্বাভাবে ডানদিগ হইতে বাঁদিগ পর্য্যন্ত যায়। এই বেদনাটী প্রথমতঃ তত সাংঘাতিক বলিয়া বোধ হয় না বটে, কিন্তু আমি দেখিয়াছি যে, এই বেদনাতে পরে নিউমোনিয়া হইবার একটী অব্যর্থ উপক্রম অবস্থা, এই লক্ষণটী অনেক ডাক্তারেরাও প্রথম কিছু গ্রাহ্য করেন না। কারণ বাস্তবিক তখন Lungs অর্থাৎ ফুস্‌ফুস্ পরীক্ষা করিয়া দেখিলে নিউমোনিয়ার লক্ষণ কিছু উপলব্ধি করিতে পারা যায় না, সেই জন্য আমিও প্রথম প্রথম মনে করিতাম যে, এটা একটা সাংঘাতিক পীড়ার পূর্ব্ব লক্ষণ হইতেই পারে না। কিন্তু তাহার পর অধিক দিন চিকিৎসা করিতে করিতে দেখিলাম যে, এই লক্ষণ হইলে ফুস্‌ফুসে রক্ত জমা অবশ্যম্ভাবি। এ লক্ষণ যে রোগীর হইয়াছে, সে রোগীই পরে

নিউমোনিয়ায় নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া অর্থাৎ Cholera Asphyxia কলেরা এস্ফিক্সিয়া হইয়াই হউক, আর পরে নিউমোনিয়ার অন্যান্য লক্ষণ জন্যই হউক, এক রকম না এক রকম ফুস্ফুসে রক্ত জমিবার বিকৃতিতে মরিয়াছে। আমার বোধ হয় যে, প্রথমতঃ ফুস্ফুসে রক্ত জমে না, সেই জন্য ঐ বেদনার স্থানে Dull sound নিরেট শব্দ বা রক্ত জমার অন্যান্য লক্ষণ থাকে না। অনেক অনেক ডাক্তারেরা বলেন যে, ওলাউঠাতে অন্যান্য স্থানে যেরূপ Spasm স্প্যাজম্ হয়, অর্থাৎ আক্ষেপ, আঁকড়ি বা খাইল ধরে, ইহাও সেইরূপ ফুস্ফুসের খাইল ধরা আর সেই খাইল ধরায় হাতে পায়ের আঙ্গুলে যেমন রোগীর অসহ্য কষ্ট হয়, এ বেদনাও সেইরূপ কষ্টদায়ক।

প্রতিক্রিয়ার অবস্থা—Stage of Reaction.

কোল্যাপ্স হইতে যে রকম করিয়া মৃত্যু হয়, এক প্রকার সংক্ষেপে বলিয়াছি, এখন কোল্যাপ্স অবস্থা হইতে আরাম হইবার লক্ষণ সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। কোল্যাপ্স হইতে আরাম হইবার আরম্ভে আস্তে আস্তে একটু নাড়ী আইসে, বাহ্যে বমি কিছু কিছু হয়, আর ঐ বাহ্যে বমিতে নাড়ী পূর্ব্বমত বসিয়া যায় না। বরঞ্চ বাহ্যে বমি যখন হইতে থাকে, তাহার পর নাড়ী যেন একটু জাগে, অর্থাৎ নাড়ী যেন একটু একটু পাওয়া যায়। তাহার পর বাহ্যে বমি একটু কম হয় আর নাড়ীও ক্রমে ক্রমে বেশী জোর বাঁধে। তখন নাড়ীর গতি ভাল, হাত, পা, গা, একটু একটু গরম হয়। একটু আধটু প্রস্রাবও হয়, তবে কখন কখন

প্রস্রাবের থলিতে প্রস্রাব জমে, কিন্তু রোগী আপনা আপনি প্রস্রাব করিতে '..রে না, শলা দিয়া প্রস্রাব করাইলে ও ২।১ বার ঐরূপ প্রস্রাব করাইবার পর রোগী আপনা আপনিই স্বাভাবিক রকমে প্রস্রাব করিতে পারে। ক্রমে ক্রমে বাহ্যের রংও স্বাভাবিক রকম হয়। আর তখন বাহ্যে তত পাতলা নয়। একটু একটু মল বাঁধে, শরীরের নীলবর্ণ ক্রমে কমে, রোগী নিজেই একটু ভাল বোধ করে, আর তাহার পর আস্তে আস্তে আরোগ্য হয়। কিন্তু রোগ সাংঘাতিক হইলে অর্থাৎ খারাপ রকম ওলাউঠা হইলে রোগী তত স্বচ্ছন্দ রূপে আরোগ্য লাভ করে না। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, কোল্যাপ্সের পর আরোগ্যের পথে অনেক বিঘ্ন ঘটে। কোল্যাপ্সের পর প্রতিক্রিয়া অর্থাৎ Reaction রিএ্যাকসন আরম্ভ হইয়া অন্যান্য লক্ষণে রোগীকে ভাল দেখা যাইলেও রোগীর প্রস্রাব নিয়মিতরূপে না হইয়া মাথা গরম হইয়া এক রকম বিকারের লক্ষণ হয়, তাহাকেই ইংরাজীতে Typhoid condition টাইফইড কণ্ডিশন্ বলে।

Typhoid condition টাইফইড কণ্ডিশন্।

সুস্থ অবস্থায় আমাদের প্রস্রাবের সঙ্গে শরীরের এক রকম ক্লেদ নির্গত হয়। বাহ্যে, প্রস্রাব, ঘাম ইত্যাদি সকলেতেই শরীরের পৃথক পৃথক ক্লেদ নির্গত করিয়া রক্ত পরিষ্কার করে। প্রস্রাবের সহিত যে ক্লেদ নির্গত হয়, তাহাকে ইংরাজীতে Urea ইউরিয়া বলে। আর শরীরে অন্যান্য ক্লেদ থাকিলে শরীরের রক্ত যেরূপ বিকৃত ভাবাপন্ন হয়, সেইরূপ এই ইউরিয়া রক্তে মিশিয়াও শরীরকে

এক প্রকার বিকৃতভাবাপন্ন করে। ঐ বিকৃতিতে মাথা গরম হয়, মাথায় রক্ত চড়ে, রোগীর ভাল জ্ঞান থাকে না, সংক্ষেপে রোগীর এক প্রকার বিকারের লক্ষণ হয়। ঐ বিকারের লক্ষণকেই ইংরাজীতে Typhoid condition টাইফইড্ কণ্ডিশন্ বলে। আর ইউরিয়া নামক প্রস্রাবের ক্লেদ প্রস্রাবের সহিত বাহির হইতে না পারায়, শরীরের রক্তে মিশিয়া এইরূপ বিকৃতি ঘটায় বলিয়া এই রোগটীর নাম Urœmia ইউরিমিয়া বলা হয়। অনেকেই দেখিয়াছেন যে, ওলাউঠার ধূমধামের লক্ষণ যাইয়া ক্রমে একটু নাড়ী আইসে, উত্তরোত্তর রোগীর অবস্থা ভাল বোধ হয়, রোগী যেন এবার বাঁচিল মনে হয়, কিন্তু রোগীর প্রস্রাব তখনও হয় নাই। ক্রমেই চক্ষু লাল হইতে আরম্ভ হইল, মাথা গরম, হয়ত একটু জ্বর হইল, জীব শুষ্ক ও অপরিষ্কার, অসহ্য পিপাসা, সর্ব্বাঙ্গে জ্বালা, মাথা ভার, দুই একটা এলোমেলো কথা আরম্ভ হইল। নাড়ীর অবস্থা ভাল, আর রোগী একটু চন্‌মনে হইয়াছে, কিন্তু একটু পেটের বিয়ারাম আছে, বুকের দুপাশে বেদনা, ক্রমে নিউমোনিয়ার লক্ষণ দেখা দিল। এই অবস্থাকে Typhoid condition টাইফইড্ কণ্ডিশন্ বলে।

টাইফইড্ অবস্থায় রোগীর নানা প্রকার বিঘ্ন ঘটে, কখন কখন রোগীর দাঁতের গোড়া হইতে অধিক পরিমাণে রক্ত পড়িতে আরম্ভ হয়, হয় ত দাঁতের গোড়া দিয়া রক্তপড়া উপলক্ষ করিয়া অর্থাৎ দাঁতের গোড়া হইতে রক্তপড়া একটী Crisis ক্রাইসিস্ হইয়া রোগী সুন্দররূপ আরোগ্য হয়। আর না হয় ত রক্তপড়ার পর দাঁতের গোড়ায় খুব ঘা হয়, আর তাহাতেই দাঁতের গোড়া একেবারে পচিয়া উঠে।

এই টাইফইড্ অবস্থায় আর কয়েকটী রোগ আসিয়া উপস্থিত হয়, অতএব সে বিষয়ে পূর্ব্ব হইতেই লক্ষ্য রাখা আবশ্যক।

টাইফইড্ অবস্থায় রোগীর চোক ঘোলা হইয়া যায়, আর না হয় ত চক্ষের ভিতর ঘা হয়, অতএব টাইফইড্ অবস্থায় রোগীর চক্ষের প্রতি চিকিৎসকের বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

কখন কখন রোগীর খুব বমি হইতে আরম্ভ হয়, পেটে কিছুই থাকে না, আর তাহার পর হিক্কা হইতে আরম্ভ হয়। রক্তের ক্লেদ বাহির না হইয়া যদি পুনরায় রক্তের সঙ্গে মিশিয়া যায়, সে অবস্থায় হিক্কা একটী বিশেষ লক্ষণ। যে কোন ক্লেদই হউক রক্তে মিশিলে রক্তকে বিষাক্ত করে, আর রক্ত বিষাক্ত হইলে হিক্কা তাহার একটী প্রধান লক্ষণ। এ অবস্থায় হিক্কা বড় দোষের কথা, কবিরাজেরা হিক্কাকে যমের বড় ভগিনী বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। কখন কখন কোন স্থানে প্রদাহ হইলে তাহার উদ্দীপনায় হিক্কা হইয়া থাকে। যেমন পাকস্থলীতে বা আঁতুড়িতে প্রদাহ হইলে হিক্কা হয়। আমাদিগের ঢেকুর উঠাও হিক্কার ছোট ভাই, আর সে ঢেকুর উঠাও পেট গরম হইয়া পাকস্থলীর উদ্দীপনা জন্য হইয়া থাকে, হিক্কা সম্বন্ধে বেশী বলিবার আবশ্যক নাই, কিন্তু এ কথাটী না বলিয়া থাকিতে পারি না, যে, হিক্কা বিশেষতঃ ওলাউঠা রোগীর হিক্কা সামান্য লক্ষণ বলিয়া যেন কখনই মনে করা না হয়। অনেক সময় হয় ত কোন বিকারের লক্ষণ না থাকিলেও একা হিক্কাতেই বুঝা যায় যে, রোগীর ইউরিমিয়া উপস্থিত।

উপস্থে বা স্ত্রীলোকদিগের জননেন্দ্রিয়ে সামান্য দুই একটী ঘা হয়, তাহার পর দুই এক দিনের মধ্যেই ঘাটী খুব বেশী বাড়িয়া একেবারে তাহাতে পচা ধরে। আর বাস্তবিক অনেকের ঐ

স্থানটী একেবারে পচিয়া যায়। ইহাকে ইংরাজিতে ঐ স্থানের Gangrene গ্যাংগ্রিন্ বলে। কখন কখন নাশিকাতেও এইরূপ Gangrene গ্যাংগ্রিন্ হইয়া থাকে।

হয় ত ওলাউঠা রোগের পর সর্ব্বাঙ্গে স্থানে স্থানে ফোড়া হইয়া পাকে, কর্ণমূল ফোলে বা পাকে, ফুস্‌ফুসের প্রদাহ অর্থাৎ নিউমোনিয়া হয়।

যে কারণে ওলাউঠা হয়।

রোগের লক্ষণ প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত এক রকম মোটা-মোটী বলিলাম। এখন এই রোগের সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলা আবশ্যক। এই রোগের কারণ সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। এই ক্ষুদ্র পুস্তকে সে সমস্ত বিশেষ করিয়া বর্ণনা করা অনাবশ্যক। যাহা হউক, এ সম্বন্ধে কয়েকটী যে ভাল ভাল বিজ্ঞঃ ডাক্তার-দিগের মত আছে, তাহার কথা এস্থলে বলা অতি আবশ্যক। ওলাউঠা রোগের কারণ সম্বন্ধে সাধারণতঃ লোকের এক রকম বিশ্বাস আছে যে, অদ্যাবধি ইহার কিছুই ঠিক হয় নাই। তাহা কতকটা সত্য বটে, তবে একেবারে সত্য নহে। আমি মনে করি, ওলাউঠার কারণ বুঝা একটু বেশী কঠিন, আর এই ব্যায়া-রাম সম্বন্ধে অনেক ভাল ভাল পুস্তক পড়িয়া ইহার একটা ঠিক করিতে হয়। লোকের এইরূপ বিশ্বাস আছে যে, ডাক্তারেরা ওলাউঠার কারণ ভাল জানেন না, আর বাস্তবিক ভাল বিজ্ঞ পড়া শুনা ডাক্তার না হইলে ওলাউঠার অনেক কথার কারণ তাহারা নিজেই জানেন না। ওলাউঠার বিষে কেন, কি রূপে, কি কারণে

এত শীঘ্র লোকের প্রাণনাশ হয়? মোটামুটি বুঝিতে পারিলেই এই রোগের নিদান অর্থাৎ Diagnosis ডায়েগ্‌নোসিস্—জানা হইল। রোগের Pathology প্যাথলজি ঠিক বুঝিতে পারিলেই চিকিৎসা শাস্ত্রের বিজ্ঞান Science of Medicine সম্বন্ধে একটা স্থির করা হইল। তবে আসল কি কারণে এরূপ হয়, তাহার উত্তর দেওয়া মনুষ্যের সাধ্য নয়। এই যে কুইনাইনে জ্বর যায়, তাহার আসল কারণ আমরা কি জানি? এ কথার ঠিক উত্তর দিতে হইলে কুইনাইনে জ্বর যায় বলিয়া জ্বর যায় ভিন্ন আমরা আর কি বলিতে পারি।

যাহা হউক, পূর্ব্বে এক রকম বলিয়াছি যে, শরীরে এক প্রকার বিষ প্রবেশ করিয়া এই রোগ উৎপন্ন হয়। আর সেই বিষ Bacillus ব্যাসিলস্-আকারে হউক, কি অন্য আকারে হউক শরীরে প্রবেশ করা চাই। এ বিষটী যে একটী ভয়ানক বিষ, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই; কারণ যে বিষ শরীরে প্রবেশ করিয়া অল্প সময় মধ্যেই এইরূপ কাণ্ড কারখানা করিয়া হয় ত রোগীর প্রাণনাশ করে, আর না হয় ত ছমাসের ধাক্কায় ফেলিয়া যায়, সে বিষের ভয়ানক শক্তি। ইহার পূর্ব্বে অনেক ডাক্তারদের এই বিশ্বাস ছিল যে, সর্পের বিষে রক্তের সার অংশ অতিশয় গাঢ় হইয়া জমিয়া যায় বলিয়া শরীরে রক্তের ধমনী বা শিরা দিয়া রক্ত চলাচল করিতে পারে না, ওলাউঠায়ও অনেকটা সেইরূপ হয়, তাহাতেই ওলাউঠায় রোগী এত শীঘ্র মরে। সর্পের বিষ সম্বন্ধে আমার প্রিয় বন্ধু স্বর্গীয় হেমন্তকুমার ঘোষের ভ্রাতা 'অমৃত বাজার' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু শিশিরকুমার ঘোষ যে পুস্তক লিখিয়াছেন, তাহাতে ঐ মত যে ঠিক নয় সে সম্বন্ধে বিস্তর প্রমাণ দিয়াছেন। পুস্তক খানি

অতি সুন্দর, আর অনেক অনুশীলন দ্বারা লিখা হইয়াছে, ঐ পুস্তক খানি সকলকারই একবার পড়া উচিত। যাহা হউক, আপাততঃ আলোচ্য বিষয়েব সঙ্গে এবিষয়ের বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই বলিয়া বেশী বলা অনাবশ্যক। বলিতেছিলাম, আপাততঃ ওলাউঠার কারণ সম্বন্ধে অনেক অনেক ভাল ভাল ডাক্তারেরা স্থির করিয়াছেন যে, পূর্ব্বোক্ত মতটীও ঠিক নহে। ঐ সকল ডাক্তারের মধ্যে ডাক্তার জন্‌সন্ Johnson, কলিকাতা মেডিকেল কলেজের ভূতপূর্ব্ব মেডিসিনের অধ্যাপক Dr. Goodeve ডাক্তার গুডিব, Dr. Parks ডাক্তার পার্কস ও Dr. Salzer স্যালজাব ইত্যাদি অনেক অনেক ডাক্তারের মত এই যে, ওলাউঠা হিসাব মত একটী স্নায়ুব অর্থাৎ Nerveএর বেয়ারাম। কারণ জলেব মত বাহে বমি হওয়া পূর্ব্বোক্ত রূপে দুধের মত রক্ত ছিঁড়িয়া গেলে, অর্থাৎ রক্তের সার অংশ ও জলীয় অংশ পৃথক হইলে ঘটিতে পারে বটে, কিন্তু পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, Dry cholera ড্রাই কলেরাতে মোটে জলের মত বাহে কি বমি হয় না। একবার কি দুইবার প্রায স্বাভাবিক বাহের পরই কোল্যাপ্স হইতে দেখা যায। আর কেবল কোল্যাপ্‌স্ কেন, জলের মত বাহে বমি হওয়া ভিন্ন ওলাউঠার অন্য অন্য লক্ষণ সমস্তই উপস্থিত থাকে। পূর্ব্বোক্ত মতের বিরুদ্ধে আর অনেক কথা আছে। যাহা হউক, এইটীই প্রধান, ডাক্তার গুডিব্ ইত্যাদি ডাক্তারদিগের মত এই যে, এই বিষ শরীরে প্রবেশ করিবামাত্র Pulmonary artery পল্মোনেরি আর্টেরি অর্থাৎ ফুস্‌ফুসের ধমনী অবশ হইয়া সঙ্কীর্ণ হইয়া যায়, ফুস্‌ফুসের ভিতরে রীতিমত রক্ত যায় না, আর ফুস্‌ফুসে রক্ত পরিষ্কার হয়; অতএব ফুস্‌ফুসের ভিতরে রক্তের চলাচল বন্ধ হইয়া যাইলে রক্তের পরিষ্কার

হওয়া কার্য্যের বিঘ্ন জন্মে। অর্থাৎ অপরিস্কার রক্ত অপরিস্কার অবস্থাতেই থাকে। অপরিস্কার রক্ত বিষের ন্যায়, অতএব সেই বিষেই নানা বিঘ্ন ঘটাইয়া প্রাণনাশ করে। এই বিষে আরও একটী বিঘ্ন ঘটে। হৃদ্‌পিণ্ড Heart আপন কার্য্য ভালরূপ করিতে পারে না। হৃদ্‌পিণ্ডের সঙ্কোচে পিচকারীর ন্যায় শরীরের স্থানে স্থানে রক্ত সঞ্চালন করে। আর ঐ হৃদ্‌পিণ্ডের বিকাশে আবার পরিস্কার রক্ত গ্রহণ করে। ওলাউঠার বিষে হৃদ্‌পিণ্ডের এই সঙ্কোচ ও বিকাশের বিঘ্ন ঘটিয়া শরীরের পরিস্কার রক্তের চলাচল অনেকটা যেন বন্ধ করে। ডাক্তার স্যাল্‌জার বলেন যে, শরীরে রক্তের চলাচল বন্ধ হইলে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ধমনীতে রক্ত জমিয়া থাকে, আর ঐরূপ রক্ত জমিয়া থাকা জন্য স্নায়ুতে এক প্রকার উদ্দীপনা Irritation হয়। আর ঐরূপ উদ্দীপনাই আক্ষেপের প্রধান কারণ। Dr. Goodeve ডাক্তার গুডিভের মত এই যে, ওলাউঠার বিষে হৃদ্‌পিণ্ড ও ফুস্‌ফুসের ধমনী সঙ্কোচ হওয়াতে আঁতুড়ীর ভিতরের সরু সরু রক্তের শির সকল মোটা হইয়া ভিতরের নলীর আয়তন বৃদ্ধি করে। আর ঐরূপ আয়তন বৃদ্ধি হইলেই আঁতুড়ীর সরু সরু রক্তের শিরের ভিতরে অধিক রক্ত থাকিবার স্থান হয় বলিয়া ঐ সকল ধমনীতে অধিক রক্তের চলাচল হইয়া থাকে। আর সেস্থলে অধিক রক্ত যাইয়া জমে বলিয়া ঐ সকল রক্তের শির হইতে রক্তের জলীয় অংশ অধিক চুয়াইয়া আসিয়া আঁতুড়ীর ভিতরে পড়ে। সেই জন্যই ওলাউঠায় জলের মত বাহে বমি হইয়া থাকে। সংক্ষেপে গুডিব সাহেবের মত এই যে, ওলাউঠার বিষে এক সময়ে দুইটী বিপরীত কার্য্য হইয়া থাকে। প্রথম,—হৃদ্‌পিণ্ড ও ফুস্‌ফুসের ধমনীর সঙ্কোচন। দ্বিতীয়,—আঁতুড়ী বা অন্ত্রের ছোট ছোট

ধমনী মোটা হইয়া আয়তন বৃদ্ধি হওয়া। ডাক্তার স্যাল্জার সাহেবের মত এক রকম মন্দ নয়—তিনি বলেন, হৃদ্পিণ্ড ও ফুস্ফুসের ধমনীর সঙ্কোচ হইলে সরু সরু ধমনীতে রক্ত জমিয়া পড়ে। অর্থাৎ ফুস্ফুসের ধমনী রক্তের একটী বড় নলী, আর ঐ ধমনী হইতে লক্ষ লক্ষ ছোট ছোট শাখা প্রশাখা বাহির হইয়া ঐ সকল ছোট ছোট শাখা প্রশাখা ফুস্ফুসের ভিতরে আসিয়াছে। অতএব বড় রাস্তা যদি বন্ধ হইয়া যায়, তবে ছোট ছোট ধমনীতে যেখানকার রক্ত সেই খানেই থাকিবে। শরীরের রক্ত চলাচলের স্বধর্ম্ম এই যে, একদিকে রক্ত চলাচল আটকাইয়া থাকিলে অন্য স্থলে রক্ত চলাচলের কার্য্য কিছু অধিক পরিমাণে হইতে থাকে। ডাক্তার স্যাল্জার বলেন যে, সেই জন্যই পেটের ভিতরের আঁতুড়ীর ছোট ছোট রক্তের ধমনীর ভিতরে অতি শীঘ্র শীঘ্র অধিক রক্ত আসিয়া জমে। আর সেই রক্তের জলীয় ভাগ চোয়াইয়া আসিয়া পেটের নাড়ীর ভিতরে পড়ে। ডাক্তার স্যাল্জার সাহেবের মতে ও ডাক্তার গুডিভের মতে পেটের ভিতরের আঁতুড়ীর ছোট ছোট রক্তের ধমনীতে রক্ত জমা চাই। তবে কিনা গুডিভ সাহেব বলেন, ঐ সকল ধমনীর আয়তন বৃদ্ধি হয় বলিয়া রক্ত জমে, স্যাল্জার সাহেব বলেন, রক্ত এক স্থানে জমিয়া থাকে বলিয়া রক্ত চলাচলের স্বধর্ম্ম অনুযায়ী এই স্থানে রক্ত বেশী আসিয়া জমে। ডাক্তার স্যাল্জার সাহেবের মতের বিরুদ্ধে একটী কথা আছে। এক স্থানে রক্ত জমিয়া থাকিলে সে স্থানে রক্ত চলাচলের প্রতিবন্ধকতা জন্মে, আর সেই জন্য অন্য স্থানের ধমনী দিয়া রক্ত শীঘ্র শীঘ্র অধিক পরিমাণে সঞ্চালন হইতে থাকে। ভাল, কিন্তু সে কেবল পেটের আঁতুড়ীর রক্তের ধমনীতে হয় কেন? সর্ব্বস্থানেই ত ঐ রকম হওয়া

উচিত। মানুষের মস্তিষ্কে অনেক রক্তের ছোট ছোট ধমনী ও শিরা আছে, কিন্তু সেস্থানে ওরূপ হয় না কেন? তবে মনে হইতে পারে যে, এরূপ হয় না, তাহা কিরূপে জানিলে? হয় ত হয়, কিন্তু তাহার কোন বাহ্যিক লক্ষণ নাই বলিয়া আমরা সে বিষয় কিছু মনে করি না। কিন্তু তাহা কোন মতেই সম্ভব নহে। মস্তিষ্কে যদি ঐ রকম বেশী রক্ত ও জল জমিত, তবে রোগী ওলাউঠার উপক্রম হইবার সঙ্গে সঙ্গেই অজ্ঞান হইয়া পড়িত। মস্তিষ্কে বেশী রক্ত ও রক্তের জলীয় অংশ Serum সিরম্ অধিক পরিমাণে জমিলে কি মস্তিষ্ক স্বাভাবিক অবস্থায় থাকিতে পারে? কিন্তু ওলাউঠায় ত অনেক রোগীর জ্ঞান বিলক্ষণ থাকে। তবেই স্পষ্ট বোধ হয় যে, অন্ততঃ ততক্ষণ পর্য্যন্ত মস্তিষ্কের কোন বিঘ্ন জন্মায় নাই। আমার বোধ হয় যে, হৃদ্‌পিণ্ড ও ফুস্‌ফুসের ধমনী ঐরূপ সঙ্কোচ ভাবাপন্ন হইলে রক্ত চলাচলের সমতার বিঘ্ন হয়। অর্থাৎ যাহাকে ইংরাজিতে balance of circulation ব্যালান্স অফ সার্কুলেশন বলে, তাহা ঠিক থাকে না। হয়ত এক স্থানে বেশী, না হয় ত এক স্থানে কম, না হয় ত অন্য অন্য স্থানে এক প্রকার রক্তের চলাচল নাই বলিলেই হয়, এই রকম হইয়া যায়। তবে আঁতুড়ীর ভিতরের ছোট ছোট ধমনী একটু বেশী আকৃষ্ট হয় বলিয়া ঐরূপ জলের মত বাহ্যে বমি হয়। আবার কোন স্থলে ঐরূপ না হইয়াও ওলাউঠার সমস্ত লক্ষণ উপস্থিত থাকিতে পাবে। যেমন Dry cholera ড্রাই কলেরার কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। যদিও প্রথমে না হউক পরে মস্তিষ্কে Effusion এফিউসন্ হইয়া অর্থাৎ রক্তের জলীয় অংশ জমিয়া রোগী মরিয়াছে, ইহাও দেখা গিয়াছে। ইহার পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, কখন কখন ওলাউঠার প্রতিক্রিয়া হইবার

অবস্থায় হয়ত কোন অঙ্গ একেবারে পচিয়া যায়। তাহার অর্থ এই যে, ঐ অঙ্গে রোগের বৃদ্ধির অবস্থায় রক্তের চলাচল ছিল না, সেই জন্যেই ঐ অঙ্গ এইরূপে পচিয়া যায়। যে স্থানে রক্তের চলাচল বন্ধ হয়, ঐ স্থানটা যে একেবারে পচিয়া যায়, ইহা সহজেই দেখা যায়। একটি আঙ্গুলে যদি জোর করিয়া এমন ভাবে একটী দড়ী বাঁধা যায় যে, ঐ অঙ্গুলীর অগ্রভাগে আর রক্তের চলাচল হয় না, তবে অল্প সময়ের মধ্যেই ঐ অঙ্গুলীটী পচিয়া উঠে। যাহা হউক, ওলাউঠা যে প্রকৃত প্রস্তাবে একটী স্নায়ুর পীড়া, তাহার আর সন্দেহ নাই। সাংঘাতিক ওলাউঠার সঙ্গে সঙ্গেই রোগীর নিশ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট দেখা যায়। তাহার কারণ এই যে, ফুস্‌ফুসের বড় ধমনীর সঙ্কোচে ফুস্‌ফুসের ছোট ছোট ধমনীতে রক্ত জমিয়া যায়। আর ফুস্‌ফুসে রক্ত জমিলে উহা যেন একটা নিরেট পদার্থের ন্যায় হইয়া পড়ে। তখন ফুস্‌ফুস্ আর পূর্ব্বের ন্যায় Sponge স্পঞ্জের মত ফাঁপা থাকে না। অতএব ফুস্‌ফুসের ভিতরে এ অবস্থায় রক্তের চলাচল প্রচুররূপে হওয়া অসম্ভব। কাজেই রোগী হাঁপাইয়া উঠে।

কোল্যাপ্‌স্‌ও অনেকটা ঐ কারণে হইয়া থাকে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ওলাউঠা একটী স্নায়ুর রোগ। বিষ অধিক পরিমাণে রক্তের সহিত মিলিত হইলে রক্তের চলাচলের নানা প্রকার বিঘ্ন ঘটাইয়া প্রবেশ মাত্রেই সমস্ত স্নায়ুকে অকর্ম্মণ্য করিয়া আরও গুরুতর অনিষ্ট করে। স্নায়ুই শরীরের প্রকৃত জীবন। স্নায়ু অকর্ম্মণ্য বা নিস্তেজ হইলে আমাদিগের শরীর প্রকৃত প্রস্তাবে জীবিত থাকা এক প্রকার অসম্ভব। এমন কি, স্নায়ু দুর্ব্বল হইলে রক্তের চলাচল পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়া যায়। হৃদ্‌পিণ্ড ও

ফুস্‌ফুসের ধমনীর পূর্ব্বোক্ত দুর্দ্দশার আসল কারণ, স্নায়ুর নিস্তেজ অবস্থা। কোল্যাপ্‌স্‌ও স্নায়ুর নিস্তেজ অবস্থার জন্য হইয়া থাকে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ওলাউঠার বিষ শরীরে প্রবেশ করা জন্য রক্তের ধমনীতে স্বাভাবিক মত সুচারু রকম রক্তের চলাচল হয় না। এমন কি, স্থানে স্থানে রক্তের ধমনীর ভিতরেই রক্ত জমিয়া থাকে। আর কোন স্থান কাটিয়া রক্ত বাহির হইবার পরক্ষণেই যেমন খোবা খোবা হইয়া ছানার ন্যায় জমিয়া যায়। রক্তের ধমনী অর্থাৎ নাড়ীর ভিতরেও ঐরূপ ভাবে রক্ত জমিয়া থাকে। রোগের বৃদ্ধির অবস্থায় রক্তের চলাচল স্বাভাবিক মত হয় না। আর রোগীও এক প্রকার স্পন্দ রহিত হইয়া থাকে। অতএব শরীরের কোন্ স্থানে কিরূপ ভাবে রক্ত জমিয়া আছে, তাহা কিছুই বুঝিতে পারা যায় না। তাহার পর যখন প্রতিক্রিয়া অর্থাৎ Reaction আরম্ভ হয়, তখন পুনরায় রোগীর চৈতন্য ও রক্ত স্বাভাবিক মতে শরীরে চলাচল করিতে আরম্ভ করে। কিন্তু যদি কোন স্থলে অর্থাৎ কোন ধমনীতে ছানার টুক্‌রার ন্যায় রক্ত জমিয়া থাকে, সে রক্তের টুক্‌রা আবার পুনরায় স্বাভাবিক তরলভাব ধারণ করিতে পারে না। অতএব ঐরূপ জমা রক্তের টুকরাই রক্তের বড় বড় ধমনী দিয়া অনায়াসে যাইতে পারে। কিন্তু রক্তের ধমনী সরু মোটা আছে। মোটা ধমনীর ভিতরের আয়তন বেশী। কিন্তু ঐ সকল মোটা মোটা ধমনী গাছের ডালের ন্যায় শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া অবশেষে চুলের ন্যায় হইয়া আসিয়াছে। অতএব ঐ জমা রক্তের টুক্‌রা একটু মধ্যবিত রূপ বড় হইলেও মোটা মোটা ধমনী দিয়া চলিতে পারে বটে, কিন্তু সরু সরু ধমনী, বিশেষতঃ চুলের ন্যায় সরু

ধমনীতে আসিয়াই নিশ্চয় আটকাইয়া যায়। ঐরূপ আটকাইলে ঐ আটকাইবার স্থানে আর রক্তের চলাচল হইতে পারে না। রক্তের চলাচল না হইলে মানুষ মুহূর্ত্তও বাঁচিতে পারে না। সেই জন্য ওলাউঠার অনেক রোগী সুচারুরূপে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইবার পরও হঠাৎ মরে।

ডাক্তারেরা স্থির করিয়াছেন যে, প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইবার পর ওলাউঠা রোগীর হঠাৎ মৃত্যুর কারণ এই যে, ঐরূপ রক্তের টুকরা আটকাইয়া হঠাৎ রক্তের চলাচল বন্ধ হইয়া যায়। কাজে কাজেই রোগী মরে। অনেক সময় হয়ত এমন ঘটে যে, প্রতিক্রিয়া অর্থাৎ রিএকস্‌ন্ উত্তম সুচারু রূপে আরম্ভ হইল, চিকিৎসক বিলক্ষণ আশ্বস্ত হইলেন, হয়ত বাটী ফিরিয়া যাইবার সময় রোগীর আত্মীয় স্বজনকে কহিলেন, এ রোগীর আর কোনরূপে মরিবার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু তিনি তাঁহার বাটীর অর্দ্ধেক রাস্তা না যাইতে যাইতেই রোগীর একটী আত্মীয় দৌড়িয়া যাইয়া তাঁহাকে কহিল "আপনি শীঘ্র আসুন, রোগীর শিরঃপীড়া উপস্থিত, আর রোগী যেন কেমন কেমন করিতেছে"। ডাক্তার মহাশয় ফিরিয়া আসিলেন, আর যদি বেশীদূর যাইয়া থাকেন, তবে আসিয়া দেখিলেন, রোগী আর জীবিত নাই। একথা বলিবার বেশী আবশ্যক নাই বটে, কিন্তু অনেক সময় নামলুব্ধ বিচক্ষণ ডাক্তারেরাও ওলাউঠা রোগীর আত্মীয় বন্ধু বান্ধবের নিকট বড় অপ্রতিভ ও উপহাসাস্পদ হন। লোকে বলে কি আশ্চর্য্য! এত বড় ডাক্তার এই বলিয়া গেল যে, রোগীর আর কোন ভয় নাই, এ রোগী আর কোন মতে মরিবে না, কিন্তু ডাক্তারের যাইবার আধ ঘণ্টার মধ্যেই ব্যায়রাম বৃদ্ধি হওয়া দূরে থাক, রোগী একে

বারে পঞ্চত্ব পাইল। কিন্তু এস্থলে ঠিক বিবেচনা করিতে গেলে রোগীর আত্মীয়দিগেরও দোষ নাই, আর ডাক্তার মহাশয়েরও দোষ নাই। এইরূপ রক্তের টুক্‌রা আটকানকে ইংরাজীতে Embolism এম্বলিসম্ বলে। আর এম্বলিসম্, পূর্ব্ব হইতে জানিবার কোন লক্ষণ নাই। আর লক্ষণ থাকাই বা কিরূপে সম্ভব হয়? রক্ত সুচারু রূপে চলিতেছে, হঠাৎ কোন স্থানে কিরূপে আটকাইয়া যাইবে, তাহা কিরূপে বুঝা যাইতে পারে? সকল অবস্থায় এম্বলিসমে রোগী এত হঠাৎ মরে না। ওলাউঠার প্রতিক্রিয়ার সময় যে কোন অঙ্গ পচিয়া যায় বলিয়াছি, সেও এক প্রকার সেই স্থানের এম্বলিসম্ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে, কারণ রক্তের চলাচল বন্ধ হইয়া যাইলেই সে স্থানে রক্ত জমিয়া যায়। আর রক্ত জমিলেই ছানার মত ধমনীতে বা রক্তের শিরায় জমিয়া থাকে।

এস্থলে আর একটী কথা বলা আবশ্যক, ঐরূপ রক্ত জমা ধমনী ও শিরা উভয়েতেই হইতে পারে। রক্তের শিরা সকল প্রথমে সূক্ষ্ম হইয়া আরম্ভ হইয়া ক্রমে মোটা মোটা শিরা হইয়া আসিয়া হৃদ্‌পিণ্ডে পড়িয়াছে, অর্থাৎ ধমনী যেমন ক্রমে মোটা হইতে সরু হইয়াছে, শিরা ঠিক উহার বিপরীত অর্থাৎ সরু হইতে ক্রমে মোটা হইয়াছে। অতএব ধমনীতে ঐরূপ রক্তের টুক্‌রা জমিলে ক্রমে প্রশস্ত ধমনী হইতে আসিতে আসিতে চুলের ন্যায় সূক্ষ্ম ধমনীতে আসিয়া আটকাইয়া যায়, কিন্তু রক্তের শিরা সূক্ষ্ম হইতে ক্রমে প্রশস্ত হইয়া হৃদ্‌পিণ্ডে আসিয়াছে। অতএব শিরার রক্ত জমা টুক্‌রা একবার অপ্রশস্ত শিরা হইতে বাহির হইতে পারিলে আর শিরার কোন স্থানে আটকাইবার সম্ভাবনা নাই, কারণ

শিরা সকল ক্রমেই প্রশস্ত হইয়াছে। কিন্তু ঐ রক্তের টুক্‌রা হৃদ্‌পিণ্ডের এক কুঠরী হইতে অন্য কুঠরীতে আসিতে হয়ত উহার মধ্যের সঙ্কীর্ণ দ্বারে আটকায় আর না হয়ত অপরিষ্কার রক্তের সহিত ফুস্‌ফুসের চুলের ন্যায় সূক্ষ্ম রক্তের শিরায় উপস্থিত হইয়া সেই স্থানে আটকায়।

COMA. (কোমা)

কোল্যাপ্সের কথা বলিবার সময় কোমার কথা একবার উল্লেখ মাত্র করিয়াছি। খারাপ রকম জ্বরে ও ওলাউঠায় ও অন্যান্য রোগে কোমা হয়। অতএব কোল্যাপ্‌সের কথা মোটামুটি এক রকম বলিবার পর কোমার কথাটীও একরম মোটামুটি বলা আবশ্যক। পূর্ব্বে শরীরের রক্ত চলাচলের কথা অনেক বার উল্লেখ করা হইয়াছে। আর কোমার কথা এক রকম বুঝাইয়া বলিতে হইলে শরীরে রক্তের চলাচল কি রূপে হয়, তাহার বিষয় সংক্ষেপে এক রকম বলা অতি আবশ্যক। রক্তের চলাচল এক রকম বুঝিতে পারিলে, কোমা কেন, ওলাউঠা রোগের অনেক বিষয়ের ও অনেক লক্ষণের এক রকম জ্ঞান জন্মে। প্রথমতঃ আমাদিগের শরীরে দু রকম রক্তের শির আছে। আমাদিগের বুকের বাঁদিগে যে একটী দ্রব্য ধক্ ধক্ করে, তাহাকেই বাঙ্গালাতে হৃদ্‌পিণ্ড ইংরাজিতে Heart হার্ট বলে। আর সেই হৃদ্‌পিণ্ডই আমাদের রক্তের আধার। ঐ হৃদ্‌পিণ্ড হইতেই রক্তের ধমনী ও শিরা দিয়া রক্ত শরীরের নানা স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়, আর ঐ রক্ত শরীরের নানা স্থানে সঞ্চালিত হইয়া পুনরায়

ঐ হৃদ্‌পিণ্ডে আসিয়া পৌঁছে। উহাকেই ইংরাজিতে Circulation of blood সাকুর্লেশন অফ ব্লড বলে। রক্ত যেন একটি চক্রে ঘুরিতেছে। যে স্থান হইতে প্রথম চলিতে আরম্ভ হইল, সেই স্থানেই পুনরায় আসিল। হৃদ্‌পিণ্ডে ঐ রক্ত ফিরিয়া আসিবার সময় শরীরের নানা স্থানে যাইয়া শরীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ক্লেদের সহিত মিলিত হইয়া অপরিস্কার ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। পুনরায় পরিস্কার না হইলে আর শরীরের কার্য্যে লাগিবার উপযুক্ত থাকে না। রক্ত পরিস্কার করিবার দুইটী দ্রব্য আমাদের বুকের দুই পাশে আছে। ঐ দুইটিকে দুই ধারের ফুস্‌ফুস্‌ অর্থাৎ কাপাসে বলে। ফুস্‌ফুসকে ইংরাজিতে Lungs লঙ্গস্‌ বলে। যকৃৎ, Liver (লিভর্‌), Kidney কিড্‌নি (মূত্রগ্রন্থি), ইত্যাদি স্থানে অপরিস্কার রক্ত পরিস্কার হয় বটে, কিন্তু বুকের ভিতরে দুইটী ফুস্‌ফুস্‌ রক্ত পরিস্কারের প্রধান যন্ত্র। যে কথা গুলি বলিলাম, ইহাতেই বুঝা যাইতে পারে যে, হৃদ্‌পিণ্ডের ভিতরে অপরিস্কার ও পরিস্কার রক্তের পৃথক্‌ পৃথক্‌ স্থান থাকা চাই। কারণ তাহা না থাকিলে রক্ত অপরিস্কার হইয়া যখন হৃদ্‌পিণ্ডে ফিরিয়া আসিবে,তখন ঐ অপরিস্কার ও পরিস্কার রক্ত একত্রে মিশিবে। আর ফুস্‌ফুসে পরিস্কার হইতে যাইবার সময়ও ঐ দু রকম রক্তই যাইবার সম্ভব। তবে যদি অপরিস্কার রক্ত থাকিবার হৃদ্‌পিণ্ডে পৃথক্‌ স্থান থাকে, আর পরিস্কার ও অপরিস্কার রক্তের উভয় মিলন না হইতে পারে, এমন যদি একটা ব্যবধান অর্থাৎ দেয়াল থাকে, তাহা হইলেই অপরিস্কার রক্ত নির্ব্বিঘ্নে ফুস্‌ফুসে পরিস্কার হইতে যাইতে পারে ও পরিস্কার রক্তও অপরিস্কার রক্তের সহিত মিলিত না হইয়া, শরীরের নানা স্থানে সঞ্চালিত হইতে পারে। মোট

কথা, পরিষ্কার রক্ত ও অপরিষ্কার রক্ত পৃথক্ পৃথক্ স্থানে থাকা আবশ্যক। আর এমন ভাবে থাকা চাই যে, একে অন্যের সহিত মিলিত হইতে না পারে। অতএব হৃদ্‌পিণ্ড কি রকম জিনিস, তাহার ভিতরে ঐ রকম পৃথক্ স্থান কিরূপে আছে, আর হৃদ্‌পিণ্ডের ভিতরে কোন্ স্থান হইতে কোন্ স্থানে রক্ত যায়, তাহার কথা বিশেষ করিয়া বলা আবশ্যক। আমাদের হৃদ্‌পিণ্ডটী একটী মাঝারী রকম আঁমের মতন। আঁমের বোঁটার দিক্‌টী যেমন চৌড়া আর আগার দিক্‌টী যেমন সরু, আমাদের হৃদ্‌পিণ্ডেরও সেইরূপ একদিগ মোটা একদিগ সরু। হৃদ্‌পিণ্ডের প্রশস্ত দিকটীকে হৃদ্‌পিণ্ডের গোড়া বলে, ইংরাজীতে Base of the heart বেস্ অফ দি হার্ট বলে। ছুঁচালদিক্‌টীকে হৃদ্‌পিণ্ডের চূড়া অর্থাৎ Apex of the heart এপেক্স অফ দি হার্ট বলে। আমাদের হৃদ্‌পিণ্ডটী লম্বাভাবে পাঁচ ইঞ্চি, আর চওড়ার দিগ অর্থাৎ Base তিন কি সাড়ে তিন ইঞ্চি। আর পুরু অর্থাৎ দলে ২॥ আড়াই ইঞ্চি। হৃদপিণ্ডটী ওজনে দশ কি বার আউন্স। আমাদের বাঙ্গালা ওজনে প্রায় দেড় পোয়া। স্ত্রীলোকদিগের হৃদ্‌পিণ্ডের ওজন একটু কম। আর একটী আঁমের মাঝামাঝি লম্বাভাবে একটী লাইন টানিলে যেমন দুইটী ভাগ হয়, হৃদ্‌পিণ্ডেরও তেম্নি দুইটী ভাগ আছে। আর দুই ভাগের মধ্যে বরাবর উপর হইতে নীচে পর্য্যন্ত একটী মাংসের ব্যবধান অর্থাৎ দেয়াল আছে। আর ঐ দেয়ালটী এমন ভাবে আছে যে, কোন জিনিষ এক ভাগ হইতে অন্য ভাগে যাইতে পারে না। ঐ দুই ভাগের মধ্যে হৃদ্‌পিণ্ড যে ভাবে আমাদের বুকের ভিতরে আছে, একটীকে ডানদিগের ভাগ বলে আর একটীকে বামদিগের ভাগ

বলে। আর একটী আমকে বোঁটার দিক উপর করিয়া একটু আড়ভাবে বুকে বসাইয়া রাখিলে যেরূপ ভাবে ঐ আমটী থাকে, হৃদ্‌পিণ্ডও আমাদের বুকের ভিতর ঐ ভাবে আছে। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, আমটীর মাঝামাঝি লম্বাভাবে অর্থাৎ গোড়া (Base) (Apex) চূড়া পর্য্যন্ত একটী লাইন টানিলে আমটী লম্বাভাবে দুই ভাগে বিভক্ত হয়, কিন্তু আবার লম্বা ভাবে ঐরূপ লাইন না টানিয়া যদি প্রস্থের মাঝামাঝি একটী লাইন টানা যায়, তাহা হইলে ঐ আমটীকে আর দুই ভাগে বিভক্ত করা হইল। অথবা হৃদ্‌পিণ্ডকে চারি খণ্ডে বিভক্ত করা হইল। প্রথমতঃ লম্বা ভাবে একটী লাইন টানিলে লম্বা ভাবে দুই ভাগে বিভক্ত করা হইল। কিন্তু যদি ঐ লম্বা লাইনের মাঝামাঝি একটি লাইন আড় দিকে টানা যায়, তাহা হইলে ঐ লম্বা ভাবের খণ্ড দুটী প্রত্যেকে আবার দুই খণ্ড হইল। অর্থাৎ সমস্ত হৃদ্‌পিণ্ডটী চারি ভাগে বিভক্ত হইল। আর একটি আমকে বুকের উপর বসাইয়া ঐরূপ ভাবে চারি খণ্ড করিলে দুইটী খণ্ড যেরূপ উপরে থাকে, আর দুইটী খণ্ড যেরূপ নীচে থাকে, আমাদের হৃদ্‌পিণ্ডেরও সেইরূপ দুইটিকে উপরের কুঠরী বলে, আর দুইটিকে নীচের কুঠরী বলে। প্রথমতঃ হৃদ্‌পিণ্ডকে ডাইনে বাঁয়ে বিভক্ত করা হইয়াছিল। আবার ঐ উভয় ডানদিকের ও বাঁদিকের আড়াআড়ি একটী লাইন টানা হইয়াছে। ইহাতে হৃদ্‌পিণ্ডকে ডানদিকের দুইটী কুঠরী ও বাঁদিকের দুটী কুঠরীতে বিভক্ত করা হইল। অর্থাৎ হৃদ্‌পিণ্ডে সর্ব্বশুদ্ধ চারিটি খণ্ড বা কুঠরী হইল। ডানদিকে উপরে একটী কুঠরী ও নীচে একটী কুঠরী ও বাঁদিকেরও উপরে একটী কুঠরী নীচে একটী কুঠরী, একুনে সর্ব্বশুদ্ধ দুইটী করিয়া চারিটী কুঠরী হইল।

কারণ এক এক দিকে দুইটী কুঠরী হইলে দুই দিকে দুইটী করিয়া চারিটী। অতএব উপর দিকের ডান দিকের একটী কুঠরী বাঁ দিকের একটী কুঠরী আর নীচের দিকের বাঁ দিকের একটী কুঠরী আর ডান দিকের একটী কুঠরী। অতএব উপর দিকে ডাইনে বাঁয়ে দুইটী কুঠরী আর নীচের দিকে ডাইনে বাঁয়ে দুইটী কুঠরী। উপর দিকের দুইটী কুঠরীকে হৃদ্‌পিণ্ডের Auricle (অরিকল) বলে, আর নীচের দিকের দুইটী কুঠরীকে হৃদ্‌পিণ্ডের Ventricle (ভেন্‌ট্রিকল) বলে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ডানদিকের ও বাঁ দিকের খণ্ডের মধ্যে একটী দেওয়াল আছে। অতএব ডান দিকের অরিকল ও বাঁ দিকের অরিকলের মধ্যে যেমন কোন জিনিস আসিবার রাস্তা নাই, সেইরূপ বাঁ দিকের ভেন্‌ট্রিকেল হইতে ডান দিকের ভেন্‌ট্রিকেলে কোন জিনিস আসিবারও রাস্তা নাই। অতএব ডান দিকের সমস্ত দিকটীই পৃথক্ ও বাঁ দিকের সমস্ত দিকটীই পৃথক্। তবেই ডান দিকে একটী অরিকল আর একটী ভেন্‌ট্রিকল, আর বাঁ দিকেও সেইরূপ একটী অরিকল আর একটী ভেন্‌ট্রিকল। আর সমস্ত ডান দিক আর বাঁ দিকের মধ্যে একটী দেওয়াল আছে, অতএব সমস্ত ডান দিকের সহিত সমস্ত বাঁ দিকের কোন সংস্রব নাই। কিন্তু এক দিকের অরিকল হইতে সেই দিকের ভেন্‌ট্রিকেলেই রক্ত আসিবার পথ আছে। অতএব ডান দিকের অরিকল হইতে ডান দিকের ভেন্‌ট্রিকেলে রক্ত আসিতে পারে। সেইরূপ বাঁ দিগের অরিকল হইতে বাঁ দিকের ভেন্‌ট্রিকেলেও রক্ত আসিতে পারে, কিন্তু এক দিক হইতে অন্য দিকে যাইতে পারে না। যথা,—ডান দিকের অরিকল হইতে বাঁ দিকের অরিকলে রক্ত

আসিতে পারে না। সেইরূপ বাঁ দিকের ভেন্‌ট্রিকল হইতেও ডান দিকের ভেন্‌ট্রিকলে রক্ত আসিতে পারে না। আর ডান দিকের অরিকল হইতে বাঁ দিগের ভেন্‌ট্রিকলেও রক্ত আসিতে পারে না, আর বাঁ দিকের অরিকল হইতেও ডান দিকের অরিকলে রক্ত আসিতে পারে না। মোট কথা, এ দিক্ হইতে ওদিকে রক্ত আসিবার কোন মতেই রাস্তা নাই। রক্ত দিক্ পরিবর্ত্তন করিয়া আসিতে পারে না, তবে এক দিকের অরিকল হইতে সেই দিগের ভেন্‌ট্রিকলেই রক্ত আসিতে পারে। যেমন ডান দিকের অরিকল হইতে ডান দিকের ভেন্‌ট্রিকলে আর বাঁ দিকের অরিকল হইতে বাঁ দিকের ভেন্‌ট্রিকলে রক্ত আসা আছে। অতএব এক দিকে উপর হইতে রক্ত নীচে আসিতে পারে। হৃদ্‌পিণ্ডের উপর দিকে অরিকল আছে, নীচের দিকে ভেন্‌ট্রিকল আছে। অতএব ডান দিকের অরিকল হইতে ডান দিকের ভেন্‌ট্রিকলে রক্ত আসিলেই উপর কুঠরী হইতে নীচের কুঠরীতে রক্ত আসা হইল। সেইরূপ বাঁ দিকের অরিকল হইতে বাঁ দিকের ভেন্‌ট্রিকলে রক্ত আসিলেও ঐরূপ উপর হইতে নীচে রক্ত আসা হইল। আর পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বাঁ দিক্ আর ডান দিকের মধ্যে একটী প্রশস্ত দেওয়াল আছে। আমাদিগের পৈত্রিক কোঠা যেমন দুইভাগে উপর নীচে দেওয়াল দিয়া বিভাগ করা হয়। আর তাহাতে যেমন একদিগের সঙ্গে অন্যদিগের আসা যাওয়ার রাস্তা কেন মুখ দেখাদেখিও হইতে পারে না, হৃদ্‌পিণ্ডের কুঠরীও সেইরূপ ভাবে বিভক্ত। পৈত্রিক বাটী যেমন Partition পার্টিশন হইলে এক ভাইয়ের খণ্ড হইতে অন্য ভাইয়ের খণ্ডে যাইবার রাস্তা নাই বটে, কিন্তু এক খণ্ডেতেই ঐ খণ্ডের উপর নীচের

কুঠরীতে যাতায়াত করা যায়। আর ভায়ে ভায়ে পৃথক্ হইলে যেরূপ আপনার সীমানাতে যাহা ইচ্ছা হয় কর, সীমানা ছাড়াইয়া অন্যের সীমানায় যাইলেই সর্ব্বনাশ! হৃদ্‌পিণ্ডেরও প্রকৃতি সেই-রূপ। ডান দিকের অপরিষ্কার রক্ত বাঁ দিকে যাইয়া শরীরের ভিতরে সঞ্চালন হইলেই প্রায় সঞ্চালনের সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যু। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ডান দিকের সমস্ত দিক্‌টী অপরিষ্কার রক্তের বিভাগ, আর হৃদ্‌পিণ্ডের বাঁ দিকটী পরিষ্কার রক্তের স্থান। এখন হৃদ্‌পিণ্ডের কোন্ স্থান হইতে কোন্ রক্ত কিরূপে সঞ্চালিত হয়, তাহার কথা বলা আবশ্যক। হৃদ্‌পিণ্ডের ডান দিকের অপরিষ্কার রক্ত বাঁ দিকে আসিলে মনুষ্যের হঠাৎ মৃত্যু হয় বলিয়া ঈশ্বর ডান দিক আর বাঁ দিকের দেওয়াল এমনই মজবুত করিয়া গড়িয়াছেন যে, হৃদ্‌পিণ্ডকে শানে আছাড় মারিলেও দেওয়ালটী ফাটে না। বাস্তবিক মৃতদেহ হইতে হৃদ্‌পিণ্ড লইয়া শানে আছাড় মারিলে হয় ত হৃদ্‌পিণ্ডের অন্য স্থান ফাটিয়া যায়; কিন্তু হৃদ্‌পিণ্ডের ঐ দেওয়ালটী কি যে চমৎকার পদার্থে গঠিত, এটী আর ফাটে না ও দেওয়ালটীকে ছিঁড়িতেও পারা যায় না। তবে কাটিতে পারা যায়, সে কথা স্বতন্ত্র, পাথরও কাটা যায়। যাহা হউক, শরীরের অপরিষ্কার রক্ত প্রথমতঃ ডান দিকের উপর কুঠরিতে অর্থাৎ অরিকলে আসিয়া পড়ে। তাহার পর ঐ রক্ত ডান দিগের ভেন্‌ট্রিকল্ হইতে মোটা ধমনী দিয়া ফুস্‌ফুসের ভিতরে নানা স্থানে যাইয়া পৌঁছে এবং ফুস্‌ফুসের ভিতরে নিশ্বাস প্রশ্বাসের হাওয়া দ্বারা পরিষ্কার হয়। পরে পরিষ্কার হইলে আর সে রক্ত ডান দিকে আসিবে না। হৃদ্‌পিণ্ডের যে দিকে পরিষ্কার রক্ত থাকে, এখন ঐ পরিষ্কার রক্ত বাঁদিকের উপর

কুঠরী অর্থাৎ অরিকলে আসিল। ঐরূপ অরিকলে আসিবার চারিটী শির আছে। আমাদিগের বুকেব দুধারে দুটী ফুস্‌ফুস আছে। এক এক ধারের ফুস্‌ফুস হইতে দুটী করিয়া শির আসিয়া বাঁ দিকের উপর কুঠরিতে মিলিয়াছে। তবেই একুনে চারিটী শির দিয়া ফুস্‌ফুস হইতে পরিষ্কার রক্ত বাঁ দিকের অরিকেলে পড়ে, আর ঐ পরিষ্কার রক্ত তখন বাঁ দিকের অরিকল হইতে বাঁদিগের ভেন্‌ট্রিকলে আসিল। আর ঐ বাঁ দিকের ভেন্‌ট্রিকল্‌ হইতে একটী মোটা ধমনী উঠিয়াছে। ঐ ধমনীকে ইংরাজিতে Aorta এ্যাওর্টা বাঙ্গালাতে গুঁড়ি ধমনী বলে। ঐ গুঁড়ি ধমনী অল্পদূর আসিয়াই দুইটী প্রধান ভাগে বিভক্ত হয়। একটী ভাগ শরীরের নীচের দিগে আসিয়াছে, আর একটী ভাগ শরীরের উপর দিকে গিয়াছে। তাহার পর ঐ ধমনী নানা প্রকার ছোট ছোট শাখায় বিভক্ত হইয়া রক্তের শিরা অর্থাৎ Vein ভেনের সহিত মিলিত হইয়াছে। আর ঐ সরু সরু রক্তের শিরা ক্রমে দুইটী বড় বড় শিরায় আসিয়া পরিণত হইয়াছে। একটীর নাম Ascending Vena cava এসেণ্ডিং ভেনা কেবা অর্থাৎ উপরের গুঁড়ি শিরা, আর একটীর নাম Desending Vena cava ডিসেণ্ডিং ভেনা কেবা অর্থাৎ নীচের গুঁড়ি শিরা। ঐ দুইটী গুঁড়ি শিরা ডানদিকের উপর কুঠরীতে আসিয়া মিলিয়াছে। শিরা হইতে অপরিষ্কার রক্ত আইসে। হৃদ্‌পিণ্ডের অপরিষ্কার রক্তের দিক্‌ ডান দিক্‌। অতএব যখন রক্ত শরীরের নানা স্থান হইতে ফিরিয়া আসিতেছে, তখন ঐ রক্ত অপরিষ্কার, সে জন্য ঐ রক্ত আর বাঁ দিকে ফিরিয়া আসিতে পারে না, ডান দিকে ফিরিয়া আসা চাই। পরে অরিকল হইতে ঐ অপরিষ্কার রক্ত ভেন্‌ট্রিকেলে আসে, আব ঐ ডান

দিকের ভেন্‌ট্রিকল হইতে পরিষ্কার হইবার জন্য ফুস্‌ফুসের ভিতরে যায়। আর ফুস্‌ফুসের ভিতর হইতে পরিষ্কার হইয়া বাঁ দিকে আইসে ইত্যাদি। এই এক রকম সংক্ষেপে রক্ত চলাচলের কথা বলিলাম। কিন্তু রক্ত চলাচল সম্বন্ধে ও ধমনী কাহাকে বলে, শিরা কাহাকে বলে, শিরা আর ধমনী হইতে বিভিন্নতা কি, এ সকল বিষয় একটু ভাল করিয়া না বলিলে ওলাউঠার সকল কথা বুঝা যাইবে না।

রক্তের শিরা ও ধমনী।

রক্ত চলাচলের দু রকম শির আছে। এক রকম শির দিয়া হৃদ্‌পিণ্ড হইতে রক্ত যায়, আর এক রকম শির দিয়া হৃদ্‌পিণ্ডে রক্ত আইসে। যে সকল শির দিয়া হৃদ্‌পিণ্ড হইতে শরীরের নানা স্থানে রক্ত যায়, তাহাকে ইংরাজিতে Artery আর্টারি বলে। ভাল বাঙ্গালায় ঐ সকল শিরকে ধমনী বা নাড়ী বলে, আর যাহার দ্বারা রক্ত হৃদ্‌পিণ্ডে পুনরায় ফিরিয়া আইসে, ঐ সকল শিরকে ইংরাজিতে Vein ভেন্ বলে, বাঙ্গালায় শিরা বলে। সাধারণতঃ রক্তের শিরা বলিলে সকল রকম রক্তের নলী বুঝায়, কিন্তু অন্যান্য গ্রন্থকারেরা আর্টারীকে ধমনী আর ভেন্‌কে শিরা বলিয়াছেন, বিধায় আমরাও ঐরূপ তরজমা করিলাম। কিন্তু কোন কোন দেশে যেমন ঢাকা অঞ্চলে শিরা বলিলে নাড়ী অর্থাৎ ধমনী বুঝায়। যেমন পূর্ব্ব দেশের কবিরাজেরা সকলেই বলিয়া থাকেন, রোগীর শিরা ভাল আছে। শিরাতে জ্বর বোধ হইতেছে ইত্যাদি। এ সব কথার অর্থই নাড়ী, অর্থাৎ আমাদের

দেশে যাহাকে নাড়ী বলে, পূর্ব্বদেশে তাহাকে শিরা বলে। ধমনী অর্থাৎ Artery অর্টারি, শিরা অর্থাৎ Vein ভেন্ এই দুই রকম রক্তের নলীর মধ্যে বিলক্ষণ বিভিন্নতা আছে।

ARTERY. (ধমনী)।

ধমনীগুলি ঈষৎ লালচে আভার সহিত সাদা, প্রায়ই সাদা বলিলে হয়। পাতলা পাতলা রবরের নলীর মত। ধমনীগুলি স্থিতিস্থাপক গুণসম্পন্ন। রবরের একটী নল যেমন আঙ্গুল দিয়া চাপিয়া আঙ্গুল উঠাইয়া লইলে পুনরায় যেরূপ পূর্ব্ব ভাব ধারণ করে, চাপা ভাব থাকে না, অর্থাৎ যতক্ষণ চেপে রাখ ততক্ষণই চাপা থাকে, হাত উঠাইলে আবার যে রকম নলটী পূর্ব্বে ছিল সেই রকম হয়। ইহাকেই স্থিতিস্থাপক গুণসম্পন্ন বলে। অর্থাৎ যে অবস্থায় রাখ, সে অবস্থায় থাকে না, পুনরায় আবার আপন অবস্থা প্রাপ্ত হয়, সেই দ্রব্যকেই স্থিতিস্থাপক দ্রব্য বলে। যাহা হউক, বলিতেছিলাম, আমাদের ধমনীগুলি ছোট হউক আর বড় হউক, মোটাই হউক আর সরু হউক, সকলেরই ঐ গুণ আছে। রক্ত ভরা না থাকিলেও তার গা গুলি চোপ্সাইয়া বসিয়া যায় না। রবারের নলের মত গোল ভাবেই থাকে। আর ধমনী গুলি শিরা অপেক্ষা একটু দলে পুরু।

আর ঐ স্থিতিস্থাপক গুণের জন্যই রক্ত যখন ধমনীতে আসিয়া পড়ে, ঐ রক্তভরা ধমনী একটু মোটা হয়। অর্থাৎ ভিতরের আয়তন বৃদ্ধি হয়। আর তার পরক্ষণেই এমনভাবে আবার সঙ্কীর্ণ হয় যে, ঐ রক্তটুকু এক প্রকার পিচকারীর ন্যায় অন্য স্থানে

চালাইয়া দেয়। আর যে স্থানে ঐরূপে চালাইয়া দিল, সে স্থানও পূর্ব্বমত মোটা হয় ও তাহার পর সঙ্কীর্ণ হইয়া ঐরূপ পিচকারীর ন্যায় ঐ রক্ত অন্য স্থানে চালাইয়া দেয়।

ক	খ	গ	ঘ

মনে কর, ক, খ, গ ও ঘ একটী ধমনীর প্রশস্ত টুকরা, উহার ক টুকু রক্তে ফুলে উঠে, তাহার পরক্ষণেই পিচকারীর ন্যায় চোপ্সাইয়া ঐ রক্ত খ স্থানে চালাইয়া দেয়। খ কয়ের মত প্রথমতঃ ফুলে, তাহার পর সঙ্কীর্ণ হয়, সঙ্কীর্ণ হইয়া খ হইতে গ খণ্ডে রক্ত চালায় এবং গ হইতে ঐরূপ ভাবে ঘয়ে রক্ত আইসে। তবেই দেখ, যত লম্বা ধমনী হউক না কেন, সকল স্থানে সমানভাবে সমান জোরে রক্ত সঞ্চালন হইতে লাগিল। এই জন্যই শরীরের কোন কোন স্থানে ধমনী কাটিয়া গেলে পিচকাবীর ন্যায় জোরে রক্ত বাহির হয়। আবার ধমনী যখন ঐ রকম সংকীর্ণ হয়, আর পিচকারীর মত এক স্থান হইতে অন্য স্থানে রক্ত ছট্‌কাইয়া দেয়, সেই সময় ঐ ধমনীর টুকরাটুকু ঊর্দ্ধদিগে একটু উঠে, সেই জন্যই নাড়ীর উপর অঙ্গুলী রাখিলে ধক্ ধক্ করিয়া অঙ্গুলীর নীচে আসিয়া লাগে। হৃদ্‌পিণ্ডেরও এইরূপ গতি। হৃদ্‌পিণ্ড যখন সঙ্কীর্ণ হইয়া গুঁড়ি ধমনী দিয়া পরিষ্কার রক্ত ছট্‌কাইয়া দেয়, তখন হৃদ্‌পিণ্ডের সর্ব্বাঙ্গ একটু উঠে, আর ঐরূপ উঠিয়া আমাদের বুকে, পাঁজরের নীচে ধড়াস্ ধড়াস্ করিয়া লাগে, আর বুকের ভিতরে যে ঐরূপ ধড়াস্ ধড়াস্ করিয়া লাগে, তাহা হৃদ্‌পিণ্ডের উপরে হাত দিলে বেশ বুঝিতে পারা যায়। হৃদ্‌পিণ্ডে ঐরূপ লাফাইয়া উঠিবার কথা এখানে উল্লেখ মাত্র

করিলাম, হৃদ্‌পিণ্ডের বর্ণনার সময় এই বিষয়টী ভাল করিয়া বলিব। ধমনী যতই লম্বা হউক না কেন, আর যত ছোট বা সঙ্কীর্ণ হউক না কেন, শরীরের সমস্ত ধমনীরই ঐ রকম স্থিতি-স্থাপক গুণ আছে। বলা আবশ্যক যে, ধমনীর রক্ত ও শিরার রক্ত দুইয়ের তফাত আছে। ধমনীর রক্ত খুব ডগ্‌ডগে লাল; শিরা অর্থাৎ ভেনের রক্ত কাল। পরিষ্কার রক্তের রং লাল। প্রথমতঃ হৃদ্‌পিণ্ড হইতে পরিষ্কার রক্ত ধমনীতে পড়ে, ও ধমনী হইতে শরীরের নানা স্থানে সঞ্চালিত হইয়া ঐ পরিষ্কার রক্ত শরীরের স্থানে স্থানে ক্লেদ্ দ্বারা অপরিষ্কার হইয়া কাল হইয়া যায়। আর পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, রক্ত অপরিষ্কার হইয়া শিরা দিয়া পুনরায় হৃদ্‌পিণ্ডের উপরের ডান-কুঠরিতে আইসে। ধমনী দিয়া পরিষ্কার রক্ত শরীরের নানা স্থানে সঞ্চালিত হয়, শিরা দিয়া সমস্ত অপরিষ্কার রক্ত পুনরায় হৃদ্‌পিণ্ডে আইসে। অতএব সমস্ত ধমনীর রক্ত পরিষ্কার লাল রক্ত, সমস্ত শিরার রক্ত অপরিষ্কার কাল রক্ত। অনেকের গায়ের চামড়ার নীচেই কাল কাল শিরা দেখা যায়, ভেনের নিজের রং কাল নয়, কিন্তু অপরিষ্কার রক্তের রং নীলবর্ণ কাল, সেই জন্য ঐ শিরগুলি নীলবর্ণ কাল দেখায়।

VEIN. (ভেন্)।

শিরা গুলি লাল, ধমনীর মত তত পুরু নয়, স্থিতিস্থাপক গুণও নাই। নেকড়ার মত, রক্ত ভরা থাকিলে ফুলিয়া উঠে, রক্ত না থাকিলে চোপ্সাইয়া যায়, ধমনীর ভিতরে রক্ত আছে কি না তাহার আকার দেখিলে বাহির হইতে বুঝা যায় না। যেমন একটী

রবরের নলীর ভিতরে জল আছে কি না তাহার বাহিক আকার দেখিলে কিছুই বুঝা যায় না, কারণ ভিতরে জল থাকিলেও যে ভাবে ফুলিয়া থাকে, জল না থাকিলেও সেই ভাবে থাকে। ভেন্ অর্থাৎ শিরা এরূপ নয়। ভিতরে রক্ত থাকিলে বিলক্ষণ স্থূল ও পুরু বোধ হয়, আর রক্ত না থাকিলে নেকড়ার মত চোপ্সাইয়া থাকে। শিরার স্থিতিস্থাপক গুণ নাই বটে, কিন্তু মধ্যে মধ্যে মাংসপেশীর চাপে শিরার ভিতর দিয়া রক্ত চলাচলের সুবিধা হয়। শরীরের নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কার্য্য মাংসপেশীর দ্বারা হইয়া থাকে। আর ঐ সকল কার্য্যের সময় মাংসপেশী কখন সঙ্কোচ হয় কখন বিকাসিত হয়। সঙ্কোচের সময় স্থানে স্থানে পুরু হইয়া ফুলিয়া উঠে; আর ঐরূপ নেকড়ার মতন শিরা সকলকে হাতের অঙ্গুলী দ্বারা চাপিলে রক্ত যেমন এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যায়, মাংসপেশী ঐরূপ ভাবে রক্তের শিরাকে চাপিয়া শিরার এক অংশ হইতে অন্য অংশে রক্ত চালাইয়া দেয়। শরীরে সকল স্থানে যেরূপ রক্তের শিরা আছে, সেই সেই স্থানে মাংসপেশীও আছে, অতএব যেখানে রক্তের শিরা, সেইখানেই রক্তের শিরাকে চাপিয়া ধরিবার জন্য মাংসপেশী। শিরার ভিতরে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে রক্ত যাইলে ঐরূপ স্থানান্তরিত রক্ত আর পূর্ব্বস্থানে আসিতে পারিবে না বলিয়া ঈশ্বর শিরার ভিতরে এক ইঞ্চি আধ ইঞ্চি অন্তর দুইটী করিয়া অর্থাৎ কপাটের দুই বাইলের ন্যায় দুইটি পাতলা চামড়ার কপাট করিয়া দিয়াছেন। আর ঐ কপাটের দুইটী বাইল এমন ভাবে আছে যে, রক্ত পুনরায় পূর্ব্বস্থানে যাইতে গেলেই দুটী বাইল পড়িয়া বন্ধ হইয়া যায়। আর এমন ভাবে বন্ধ হইয়া যায় যে, এক বিন্দু রক্তও পূর্ব্বস্থানে যাইতে পারে না। এইরূপে ক্রমেই অগ্রসর

হইয়া শীঘ্রই নিজ স্থানে আসিয়া পৌছে। পূর্ব্বে অনেকবার বলিয়াছি যে, হৃদ্‌পিণ্ডের ডানদিক অপরিষ্কার রক্তের স্থান, অতএব রক্ত ঐরূপ ভাবে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইতে হইতে হৃদ্‌পিণ্ডের ডানদিকের উপর কুঠরী অর্থাৎ Right Auricle রাইট দক্ষিণ অরিকলে আইসে। ভেনের স্থিতিস্থাপক গুণ নাই বলিয়া ভেন্ কাটিলে ধমনীর ন্যায় পিচকারী দিয়া রক্ত পড়ে না। শিরার রক্ত চুয়াইয়া পড়ে। কিন্তু ধমনীর রক্ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি পিচকারীর ন্যায় তেজে বাহির হয়।

VACUUM. (ভ্যাকুয়ম্)।

যেস্থানে কিছু নাই, তাহাকে ইংরাজিতে Vacuum বলে। প্রকৃতির এমনই একটী আশ্চর্য্য নিয়ম যে, কোন স্থানে কিছু থাকিবে না, এরূপ হইতেই পারে না। যে স্থানে কিছু নাই দেখা যায়, সে স্থানে বায়ু আছে। যেমন একটী কুঠরীর ভিতর বায়ু ভরা না থাকিলে, সেই ঘরটী তৎক্ষণাৎ পড়িয়া যাইত। ঘটি, বাটী, বাসনের ভিতর হাওয়া না থাকিলে, ভাঙ্গিয়া যাইত ইত্যাদি। এক স্থানে ভেকুয়াম্ হইলে, তাহার নিকটস্থ সংলগ্ন স্থানে জল, পাথর, ইট, সোণা, রূপা যাহা কিছু থাকে, ঐ দ্রব্যগুলি অতি সজোরে আসিয়া ঐ ভেকুয়ামের স্থানটী পরিপূর্ণ করে। এইটী প্রকৃতির একটী প্রধান নিয়ম। ভ্যাকুয়াম্ হইলেই যে কিছু দ্রব্য হউক সে স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইবে, ইহা প্রকৃতির নিয়ম। সেই জন্যই বলিতেছিলাম যে, ঘরের ভিতরে যদি হাওয়া না থাকে, অর্থাৎ কুঠরীর সমস্ত দরজা বন্ধ করিয়া একটী ফুকর দিয়া কুঠরীর

ভিতরের হাওয়া টানিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে, ঐ কুঠরীর ভিতরে ভ্যাকুয়ম্ করা হইল। আর ভ্যাকুয়াম্ হইলেই, তাহা পরিপূর্ণ হওয়া চাই, অতএব ঐ কুঠরীর উপরের ছাদ, নীচের মেজে, পার্শ্বের দেয়াল সকলেই অতি ত্রস্তে আসিয়া ঐ ভ্যাকুয়ম পূর্ণ করিবে। প্রকৃতিব এই নিয়ম। এইরূপ ভাবে কুঠরিটী সমস্ত ভাঙ্গিয়া যাইবে। হাঁড়ি, কলসী, ঘটি, বাটী খালি থাকিলে তাহার ভিতর বাতাস আছে, আর বাতাস যাইবার পথ না থাকিলে, কোন তরল পদার্থ ঐ পাত্র হইতে বাহিয়ে পড়ে না। গাড়ু বা ঝারির বড় মুখ একখানি ভিজা গামছা দিয়া বেশ করিয়া ঢাকিয়া রাখিলে, নল দিয়া কোন মতে জল পড়ে না। তাহার কারণ এই যে, গাড়ু বা ঝারির বড় মুখ ঢাকিলে, তাহার ভিতর বাতাস যাইবার রাস্তা বন্ধ হইয়া যায়, আর জলের বদলে যদি বাতাস না যায়, তাহা হইলে, গাড়ুর ভিতর "ভ্যাকুয়ম" হয়; কিন্তু তাহা প্রকৃতির নিয়ম নহে। এই যে ঝড়ের এত জোর যে, ঘর, তুয়ার, কপাট, জানালা, পাহাড়, পর্ব্বত সজোরে ভাঙ্গিয়া চলিয়া যায়, সেও প্রকৃতির এই নিয়ম। শূন্যে যে স্থানে আমরা, কিছু নাই বলিয়া মনে করি, সে স্থানে হাওয়া আছে। আর সেই বায়ু কোন রকমে কোন স্থানে অতিশয় গরম হইলে, অতিশয় পাতলা, সূক্ষ্ম ও হাল্কা হয়। আর ঐরূপ পাতলা, হাল্কা হইয়া নিজের স্থান হইতে অন্য স্থানে সরিয়া যায়। আর পূর্ব্বে যে স্থানে ঐ হাওয়া ছিল, সে স্থানে ভ্যাকুয়ম্ হওয়াতে পার্শ্ববর্ত্তী হাওয়া এত জোরে সেই স্থানে আইসে। পার্শ্ববর্ত্তী হাওয়া ঐ স্থানে আসিলে, পার্শ্ববর্ত্তী হাওয়া স্থানে পুনর্ব্বার ভ্যাকুয়ম্ হইল। অতএব পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের পার্শ্ববর্ত্তী হাওয়া পুনরায় ঐ পার্শ্ববর্ত্তী

স্থানে আসাতে ক্রমান্বয়ে হাওয়া আসিতে লাগিল, ভ্যাকুয়ম্ হইতে লাগিল, পুনরায় হাওয়া আসিতে লাগিল। অর্থাৎ প্রথম স্থানের হাওয়া, স্থান পরিত্যাগ করিলে, দ্বিতীয় স্থানের হাওয়া প্রথম স্থানে আইসে, আর ঐ দ্বিতীয় স্থানে সেই রূপ তৃতীয় স্থানের হাওয়া আইসে, তৃতীয় স্থানে চতুর্থ স্থানের ইত্যাদি। ঐরূপ অতিশয় জোরে একে অন্যের স্থানে আসিলেই প্রলয় ঝড় উপস্থিত হইল, প্রকৃতির অনেক কার্য্য, এই নিয়ম জন্য হইয়া থাকে। আর প্রকৃতির সব জিনিসই এই নিয়মের বশবর্ত্তী, সে সমস্ত কথা এ স্থানে বলা অনাবশ্যক। পূর্ব্বে যেরূপ বলিয়াছি, ক, খ, গ, ঘ, রক্তের শিরের অংশটুকুর মধ্যে ঐ নিয়মের বশতাপন্ন হইয়া গ স্থানের রক্ত ঘ স্থানে আসিলে গ স্থানটী খানিক ভ্যাকুয়াম হইল, অতএব খ স্থান হইতে গ স্থানটিতে রক্ত আসিয়া পরিপূর্ণ করিল। খ স্থানটী ভ্যাকুয়াম হওয়াতে ক স্থানের রক্ত খ স্থানে আসিল। আবার ক স্থানে ভ্যাকুয়ম্ থাকিলে তাহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের রক্ত ঐ ক স্থানে আসে ইত্যাদি।

CIRCULATION OF BLOOD.

রক্তচলাচলের গতি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, হৃদ্‌পিণ্ডের ভিতর চারিটী কুঠরী আছে। বাঁ-দিকের ও ডানদিকের কুঠরীর মধ্যে একটী দেয়াল আছে। অতএব বাঁ-দিকের দুটী কুঠরী ও ডানদিকের দুটী কুঠরী স্বতন্ত্র ভাবে আছে। ডানদিক হইতে বাঁ-দিকে রক্ত আসিবার রাস্তা নাই। কিন্তু ডানদিকের উপরের কুঠরী হইতে ডানদিকের নীচের

কুঠরীতে রক্ত আসিবার দ্বার আছে। সেইরূপ বাঁদিকের উপর কুঠরী হইতে বাঁদিকের নীচের কুঠরীতে রক্ত আসিবার দ্বার আছে। উপরের দুদিকের দুটী কুঠরীকে Auricle অরিকল্ বলে। নীচের দুদিকের দুটী কুঠরীকে Ventricle ভেণ্ট্রিকল্ বলে। তবেই অরিকল্ দুদিকে একটী করিয়া দুটী, ভেণ্ট্রিকল্ও এক একদিকে একটী করিয়া দুদিকে দুটী। হৃদ্‌পিণ্ড আমাদের বুকের বাঁদিকে একটু আড় ভাবে আছে। অর্থাৎ একটী আব কি একটী বড় পীচ যদি এমন ভাবে বুকের উপর রাখা যায় যে, একটু আড়ভাবে আছে বটে, তথাপি বোঁটার দিকটী আমাদের মুখের দিকে আছে, আর অপরদিকটা আমাদের পেটের দিকে থাকে। তবে ডাইনে ও বাঁয়ের বোঁটার দিকের দুটী কুঠরী উপরের দিকের দুটী কুঠরী বলা যাইতে পারে। আর অপরদিকের দুটী কুঠরী উপর কুঠরীর নীচে আমাদের পেটের দিকে আছে। অতএব সে দুটীকে নীচের কুঠরী বলা যাইতে পারে। বাঁদিকের নীচের কুঠরী হইতে বেশ একটী মোটা ধমনী উঠিয়াছে, ইহাকে ইংরাজীতে Aorta এওর্টা বাঙ্গালাতে গুঁড়ি ধমনী বলে। প্রথমতঃ পরিষ্কার রক্ত হৃদ্‌পিণ্ড হইতে ঐ গুঁড়ি ধমনীতে যায়, আর ঐ গুঁড়ি ধমনী নানা প্রকার শাখা প্রশাখায় শরীরের নানা স্থানে বিস্তৃত হইয়াছে। অতএব ঐ রক্ত শরীরে সমস্ত ধমনীতে ধমনীতে বহিয়া শরীরের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ইত্যাদি বর্দ্ধন করে। আর ধমনী সকল ছোট বড় শাখা প্রশাখায় সমস্ত শরীরে বিস্তীর্ণ হইয়া, অবশেষে চুলের ন্যায় সরু হইয়া আসিয়াছে। আবার শিরা সকল অর্থাৎ ভেন্‌ও ঐরূপ ছোট বড় শাখায় বিভক্ত হইয়া অবশেষে চুলের ন্যায় হইয়া পূর্ব্বোক্ত চুলের ন্যায় ধমনীর সহিত মুখে মুখে মিলিয়া

একেবারে জুড়িয়া গিয়াছে। আর ঐ জোড়ের স্থান এত চমৎকার যে, কোন্ স্থানে জোড় লাগিয়াছে, তাহা স্থির করা যায় না। কেবল অনুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখিয়া কতটুকু ধমনী কতটুকু শিরা তাহা স্থির করিতে হয়।—ধমনীর ঐরূপ চুলের মত প্রত্যেক শাখা এক একটী ঐরূপ চুলের মত শিরার সঙ্গে মিলিত হইয়াছে। অতএব সকল স্থানে যতগুলি চুলের মত ধমনী, ততগুলি চুলের মত শিরা আছে। আর উভয়ে মিলিত হইয়া একখানি যেন ছোট জাল প্রস্তুত করিয়া আছে। ইহাকে ইংরাজীতে Network of vessels নেট্ ওয়ার্ক অফ ভেসেল্স বলে। শরীরের যে কোন স্থানে হউক না কেন, ধমনী ও শিরার মিলন হইলে প্রায় সর্ব্ব স্থানেই এইরূপ ভাবে হয়। ফুস্ফুসের ভিতরে ক্রমে ক্রমে, একে একে, শরীরের সমস্ত অপরিষ্কার রক্ত যাইয়া পরিষ্কার হয়, আর পরিষ্কার হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ঐ পরিষ্কার রক্ত হৃদ্পিণ্ডের বাঁদিকে আসিয়া পৌছে। অতএব ফুস্ফুসে অপরিষ্কার রক্ত যাইয়া পরিষ্কার হইবার পরক্ষণেই ঐ পরিষ্কার রক্ত পরিষ্কার রক্তের শিরে আসা আবশ্যক, তখন পরিষ্কার ও অপরিষ্কার উভয় রক্তের শির সমস্ত ফুস্ফুস্ ভরিয়া থাকা দরকার। আর বাস্তবিক ফুস্ফুসে যাইয়া যে রক্ত পরিষ্কার হয়, তাহাও এইরূপেই হইয়া থাকে। ফুস্ফুসের ভিতরে এইরূপ চুলের মত অসংখ্য অসংখ্য শিরা ও ধমনী আছে। অতএব ঐ এক প্রকার চুলের মত রক্তের ধমনী হইতে অন্য প্রকার চুলের মত রক্তের শিরায় যাইতে যে সময় লাগে, ঐ সময় টুকুতেই অপরিষ্কার রক্ত পরিষ্কার হয়। অর্থাৎ রক্ত যেমন ধমনী হইতে শিরার ভিতরে যাইতেছে, অমনই পরিষ্কার হইতেছে। ফুস্ফুসের রক্তের শির অতীব সূক্ষ্ম, এমন কি, অনেক

স্থানে চুল হইতেও সূক্ষ্ম। অতএব অতীব সূক্ষ্ম শিরে রক্তের গতিবিধির জন্য অপেক্ষাকৃত একটু বেশী সময় লাগে। আর রক্ত যাহাতে ফুস্‌ফুসের ভিতরে একটু বেশীক্ষণ থাকে, তাহার আবশ্যক আছে। অপেক্ষাকৃত একটু বেশীক্ষণ থাকিলেই একটু পরিষ্কারও বেশী হয়। যাহা হউক বলিতেছিলাম, শরীরের সকল স্থানে রক্ত ধমনী হইতে চুলের মত শিরায় আইসে। শিরায় যখন রক্ত আসিয়া পৌছিল, তখন আর রক্ত পরিষ্কার নয়। রক্তের রংও পৃথক্। এখন শিরার রক্তের রং নীলা নীলা কাল, যাহা হউক, ঐ সরু সরু রক্তের শিরা হইতে ঐ রক্ত ক্রমে মোটা মোটা শিরায় আসিয়া পৌছিল। পরে দুইটী রক্তের মোটা শিরা দিয়া রক্ত ডানদিকের উপর কুঠরীতে আসিয়া পৌছে। এখন রক্ত একেবারে অপরিষ্কার, ঐ রক্ত হৃদ্‌পিণ্ডের ডানদিকের উপর কুঠরী হইতে ঐ দিকের নীচের কুঠরীতে যায়। আর তাহার পর ডানদিগের নীচের কুঠরী থেকে ঐ রক্ত ফুস্‌ফুসে যাইয়া পরিষ্কার হইয়া বাঁদিকের উপর কুঠরীতে আইসে। তখন রক্ত একেবারে বিশুদ্ধ পরিষ্কার আর বাঁদিকের উপর কুঠরী হইতে ঐ দিকের নীচের কুঠরীতে যায়। আর বাঁদিকের নীচের কুঠরী হইতে যে গুঁড়ি ধমনী উঠিয়াছে, ঐ বিশুদ্ধ পরিষ্কার রক্ত এখন বাদিকের নীচের কুঠরী হইতে ঐ গুঁড়ি ধমনীতে আসিয়া নানা আকারের ধমনী দিয়া শরীরের সমস্ত স্থানে আসিয়া পৌছে। ফুস্‌ফুসে যেমন রক্ত পরিষ্কার হয়, তেমনই রক্ত পরিষ্কারের আরও কয়েকটী স্থান আছে। যথা—প্রথম যকৃৎ, ইহাও একটী রক্ত পরিষ্কারের প্রধান স্থান, দ্বিতীয় মূত্রগ্রন্থি।

এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যে রক্তের সঞ্চালন হয়, তাহার

এক একটীর পৃথক্ পৃথক্ নাম আছে। ১ম, সমস্ত শরীরের ভিতরে রক্ত সঞ্চালনের নাম Systematic Circulation সিষ্টে-মেটিক্ সার্কুলেশন। ২য়, ফুস্ফুসের ভিতরে রক্ত সঞ্চালনের নাম Pulmonary Circulation পল্মনারি সার্কুলেশন। ৩য়, যকৃতের ভিতর যে রক্ত সঞ্চালিত হইয়া পরিষ্কার হয়, তাহাকে Portal Circulation পোর্টেল সার্কুলেশন বলে। ৪র্থ, দুই পার্শ্বের মূত্রগ্রন্থিতে রক্ত সঞ্চালিত হইয়া যে পরিষ্কার হয়, তাহাকে Renal Circulation রিনেল্ সার্কুলেশন বলে। শরীরের সমস্ত স্থানে যেরূপে রক্ত সঞ্চালন হয় ও ফুস্ফুসের ভিতরে যেরূপে রক্ত সঞ্চালিত হইয়া পরিষ্কার হয়, তাহার কথা এক রকম সংক্ষেপে বলা হইল ; এখন Portal পোর্টেল আর Renal Circulation রিনেল সার্কুলেশনের কথা কিছু বলা আবশ্যক।

PORTAL CIRCULATION.

পোর্টেল সার্কুলেশন।

রক্তের সঞ্চালনের কথা এক রকম বলা হইয়াছে বটে, কিন্তু আমাদের খাদ্য দ্রব্য কিরূপে রক্তের সহিত মিলিত হয় ও কিরূপে রক্তের আকার ও রং ধারণ করে, এ সম্বন্ধে কিছু বলা অতি আবশ্যক।

আমরা যে সকল জিনিস খাই, তাহা প্রথমতঃ পাকস্থলীতে যাইয়া, পাকরস অর্থাৎ Gastric juice গ্যাষ্ট্রিক জুসের দ্বারা এক রকম হজম হইয়া, পাকস্থলী হইতে ক্ষুদ্র অন্ত্রে Small intestine স্মল ইন্টেষ্টিনে আসিয়া পৌঁছে। আর সেখানে আমাদের পিত্তের

সহিত মিলিত হইয়া ঐ সকল ভুক্ত দ্রব্যের আকার পরিবর্ত্তন হইয়া যায়। এ স্থানে খাদ্য দ্রব্যের সার অংশের আকার ঘন খড়ি গোলার ন্যায় সাদা, উহাকে ইংরাজীতে Chyme কাইম বলে। পাকস্থলীতে অন্যান্য দ্রব্য হজম হইয়া পরিবর্ত্তিত হয় বটে, কিন্তু আমাদের আহারের সহিত ঘি, তৈল ইত্যাদি তৈলাক্ত দ্রব্যের পরিবর্ত্তন বিশেষ কিছু পাকস্থলীতে হয় না। ক্ষুদ্র অন্ত্রে আসিয়া পিত্তের সহিত মিলিত হইয়া ঐ সকল তৈলাক্ত দ্রব্য পরিবর্ত্তিত হয়, অর্থাৎ রীতিমতে পরিপাক পায়। তৈলাক্ত দ্রব্য পিত্তের সহিত মিলিত হইয়া পরিপাক হয় ও যে কিছু অবশিষ্ট থাকে, তাহা Liver অর্থাৎ যকৃতের ভিতরে সম্পূর্ণরূপে পরিপাক হয়। ডাক্তারেরা যকৃতের পীড়ায় দুধ, ঘি ইত্যাদি তৈলাক্ত দ্রব্য খাইতে যে এত নিষেধ করেন, তাহার প্রকৃত কারণ এই যে, যকৃৎ প্রকৃতিস্থ থাকিয়া আপন কার্য্যে সক্ষম অবস্থায় না থাকিলে ও তাহা হইতে ভাল পিত্ত আসিয়া ক্ষুদ্র অন্ত্রে না পড়িলে সমস্ত ভুক্ত দ্রব্যের পরিপাক ভালরূপ হয় না। বিশেষতঃ তৈলাক্ত দ্রব্যের পরিপাক একেবারে ভালরূপ হয় না। যাহা হউক, আমাদের ছোট অন্ত্র সরু কিন্তু লম্বায় অধিক, অতএব খাদ্য দ্রব্য উহার ভিতর দিয়া যাইতে বেশী সময়ের আবশ্যক। খাদ্য দ্রব্য ছোট অন্ত্রে অগ্রসর হইয়া আর সূক্ষ্ম অবস্থা ধারণ করে, তাহাকে ইংরাজীতে Chyle কাইল বলে। কাইল কাইম হইতে আর সূক্ষ্ম ও মিশ্রিত, যেন ঘন দুধের ন্যায়। এত ঘন যে ইহাতে আর ছিবড়ে ছিবড়ে কিছু দেখা যায় না। ইহাই ভুক্ত দ্রব্যের একেবারে সার অংশ। ভুক্ত দ্রব্যের অসার অংশ আঁতুরীতেই থাকে, আর ক্ষুদ্র আঁতুরী হইতে বড় আঁতুরীতে আসিয়া

মল আকারে গুহ্য দ্বার দিয়া বাহির হইয়া যায়। কোন দ্রব্য ভালরূপ পরিপাক না হইলেও ঐ দ্রব্য বড় অন্ত্রে আসিয়া গুহ্যদ্বার দিয়া আস্ত নির্গত হয়, যেমন ডাইলের খোসা ইত্যাদি হজম না হইয়া বাহ্যের সহিত পড়ে। আমাদের অন্ত্রের অর্থাৎ আঁতুরীর কথা পরে বিশেষ করিয়া বলা হইবে। শরীরের ধমনী ও শিরা অর্থাৎ রক্ত যাইবার শির ভিন্ন, আর এক রকমের শির আছে, তাহাদিগকে Absorbents, Lymphatics বা Lacteals বলে। এ সকলের কথা যথা স্থানে ভাল করিয়া বলা হইয়াছে। যাহা হউক, বলিতেছিলাম, ক্ষুদ্র অন্ত্র হইতে ঐরূপ শির আসিয়া Thoracic duct এর-থোরাসিক ডাক্টের সহিত মিলিত হইয়াছে, ক্ষুদ্র অন্ত্র হইতে যে সকল শির আসিয়া Thoracic duct থোরাসিক ডক্টে মিলিয়াছে, তাহার ভিতর দিয়াই Chyle কাইল আসিয়া রক্তের সহিত মিলিত হয়। আর ঐ থোরাসিক্ ডাক্ট বাঁদিগের Subclavian vein সব্‌ক্লেভেন ভেনের সহিত মিলিত হওয়াতে ঐ ভুক্ত দ্রব্যের সার অংশ কাইল রক্তের সহিত মিলিত হয়। আর উর্দ্ধগামী Superior vena cava সুপিরিয়ার ভিনাকেবা যে গুঁড়ি শির, Subclavian vein তাহার একটী প্রশাখা মাত্র। পরে ঐ ভুক্ত দ্রব্যের সার অংশ কাইল মিশ্রিত রক্ত Portal vein পোর্টাল ভেন দিয়া যকৃতের ভিতর আসিয়া পরিষ্কার হইয়া পুনরায় হিপাটিক ভেন দিয়া বাহির হইয়া ইন্‌ফিরিয়র ভিনাকেবা অর্থাৎ নিম্নগামী গুঁড়ি শিরের ভিতর যাইয়া পড়ে। এ স্থানে বলা আবশ্যক যে, অন্যান্য সকল স্থানেই ধমনী দিয়া একবার পরিষ্কার রক্ত আইসে ও পরে শিরা অর্থাৎ ভেন দিয়া বাহির হইয়া যায়। অতএব সকল স্থানেই একটী করিয়া ধমনী আর একটী করিয়া শিরা আছে।

একটী ধমনী ও একটী শিরা ঐ স্থানে যাইয়া অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু তথাপি গোড়ায় প্রায় প্রত্যেক স্থানে একটী করিয়া শিরা ও একটী করিয়া ধমনী। কিন্তু যকৃতে দুইটী শিরা ও একটী ধমনী। অর্থাৎ যকৃতের ভিতরে একবার একটী ধমনী দিয়া রক্ত আইসে, আবার পোর্টেল ভেন নামক শিরা দিয়া যকৃতে রক্ত আইসে। কিন্তু ফিরিয়া যাইবার সময় হিপাটিক ভেন্ দিয়া রক্ত পরিষ্কার হইয়া পুনরায় নিম্নগামী ভিনাকেভাতে পড়ে। যকৃতে রক্ত পরিষ্কার হয়, অতএব পরিষ্কার হইবার স্থানে যত বেশী রক্ত যায় ততই মঙ্গল। সেই জন্য ঈশ্বর এমনই কৌশল করিয়া দিয়াছেন যে, হিপাটিক্ আর্টারী ও পোর্টেল ভেন্ এই উভয় স্থান দিয়া রক্ত পরিষ্কার হইবার জন্য যকৃতে যায়।

RENAL CIRCULATION.

রিনেল্ সার্কুলেসন্।

ফুস্ফুসে রক্তের ক্লেদ দগ্ধ হইয়া বাষ্পাকারে নিশ্বাসের সহিত বাহির হইয়া যায়। যকৃতে রক্তের ক্লেদ পিত্তে পরিণত হইয়া ভুক্ত দ্রব্য হজম হইবার অনেক সুবিধা জন্মায়। মূত্রগ্রন্থিতে রক্তের ক্লেদ মূত্রাকারে শরীর হইতে বাহির হইয়া যায়। মূত্রগ্রন্থিতে যকৃতের ন্যায় দুই স্থান হইতে রক্ত আইসে না, একটী Renal artery দিয়া রক্ত আইসে ও আর একটী Renal vein দিয়া বাহির হইয়া যায়। রক্তের ক্লেদ অন্য একটী পদার্থ হইয়া শরীরের কোন বিশেষ কার্য্যে লাগিলে তাহাকে ইংরাজিতে Secretion সিক্রিসন্ বলে। যেমন পিত্ত একটী রক্তের

ক্লেদ, কিন্তু ঐ পিত্ত আমাদিগের ভুক্ত দ্রব্য পরিপাকের জন্য অতি আবশ্যক। অতএব পিত্ত একটী সিক্রিসন্ Secretion। মূত্রগ্রন্থিতে যে রক্তের ক্লেদে প্রস্রাব প্রস্তুত হয়, তাহা শরীরে থাকার কোন আবশ্যক নাই, অর্থাৎ প্রস্রাব যে কোন আকারে হউক বা যে কোন অবস্থায় হউক না কেন, শরীরে থাকিলে অনিষ্ট উৎপাদন করে। এইরূপ পদার্থকে ইংরাজিতে Excretion এক্সক্রিসন্ বলে। অতএব পিত্ত একটী Secretion সিক্রিসন্, প্রস্রাব একটী Excretion এক্সক্রিসন্। সিক্রিসনের শরীরে থাকা আবশ্যক, এক্সক্রিসন্ শরীরে থাকিলে প্রাণনাশ করে। এরূপ মনে হইতে পারে যে, একটী ধমনী দিয়া এক স্থানে রক্ত যাওয়া, আর তাহার পর শিরা দিয়া রক্ত বাহির হইয়া আসা, এরূপ ত সকল স্থানেই আছে, তবে ফুস্ফুস্, যকৃৎ ও মূত্রগ্রন্থির এরূপ পৃথক্ ব্যাখ্যা কেন? শরীরের সকল স্থানেই ধমনী দিয়া রক্ত যায়, শিরা দিয়া রক্ত আইসে সত্য, কিন্তু এই কয়েকটী স্থান ভিন্ন রক্ত পরিষ্কার হবার বন্দোবস্ত আর কোথাও নাই। অতএব অন্য কোন কারণ জন্য হউক আর না হউক, এই তিনটী স্থানে যে দূষিত রক্ত পরিষ্কার হয়, এই জন্যই পৃথক্ ব্যাখ্যার আবশ্যক।

এস্থলে বলা আবশ্যক যে, সাধারণতঃ ধমনীতে লাল ডগ্‌ডগে পরিষ্কার রক্ত থাকে, আর শিরাতে নীল, কাল রঙ্গের অপরিষ্কার রক্ত থাকে। কিন্তু Palmonary vein, Hepatic vein ও Renal vein এই তিনটী শিরা দিয়া পরিষ্কার রক্ত আইসে। অতএব যদিচ ইহাদিগের নাম Vein ভেন্ অর্থাৎ শিরা বটে, কিন্তু কার্য্যে ধমনীর ন্যায়। সেইরূপ পল্‌মনারি আর্টরি Pulmonary artery অর্থাৎ যে ধমনী দিয়া হৃদ্‌পিণ্ডের ডানদিকের নীচের কুঠরী হইতে

অপরিষ্কার রক্ত ফুস্‌ফুসে যায়, তাহার নাম ধমনী বটে, কিন্তু কার্য্যে একটী প্রধান শিরার ন্যায়। কারণ পল্‌মনারি ধমনীর রক্ত যাহার পর নাই অপরিষ্কার।

নিশ্বাস লইবার নলী ও ফুস্‌ফুস্‌।

Trachea (ট্রেকিয়া), Bronchi (ব্রঙ্কাই) ও Lungs (লঙ্গস্‌)।

হৃদ্‌পিণ্ড কি, হৃদ্‌পিণ্ডে কয়টী কুঠরী আছে, রক্ত কোন্‌ কুঠরী হইতে কোন্‌ কুঠরীতে যায়, হৃদ্‌পিণ্ডের কার্য্য কি রকমে হয়, ধমনীই বা কাহাকে বলে, শিরাই বা কাহাকে বলে, শিরা ও ধমনী কিরূপে একত্রে মিলিয়াছে, এ সকল কথা সংক্ষেপে এক রকম বলিয়াছি, এখন শরীরের নিশ্বাস প্রশ্বাসের কার্য্য কিরূপে হয়, আর নিশ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে মনুষ্যজীবনের ও রক্ত চলাচলের সম্বন্ধ কি? কেনই বা নিশ্বাস বন্ধ হইলে, তৎক্ষণাৎ মানুষের জীবন শেষ হয়? এ সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক।

মানুষের গলাতে দুইটী নলী আছে, একটী নলীতে মনুষ্যের ভুক্ত দ্রব্য মুখ হইতে আসিয়া পাকস্থলীতে পড়ে, এই নলীটীর কথা যথাস্থানে ভাল করিয়া বলিব। তাহার সম্মুখে আমাদিগের নিশ্বাস লইবার নলী। অনেকেই বোধ হয় ছেলে বেলায় পাঁঠার কাপাসে লইয়া খেলা করিয়াছেন। পাঁঠার কাপাসে যেরূপ, আমাদের কাপাসেও সেইরূপ, তবে আমাদের ফুস্‌ফুস্‌ পাঁঠার কাবাসে অপেক্ষা অনেক বড়। কিন্তু আকারে ও পদার্থে সমান। যে নলীটীর মুখে ফুঁ দিয়া খেলিবার সময় পাঁঠার কাপাসে বাতাসে ফুলাইয়া বড় করিতে হয়, সেই নলটী ট্রেকিয়া Trachea নিশ্বাস লইবার নল।

পাঁঠার কাপাসে যেরূপ ফুঁ দিয়া অর্থাৎ হাওয়া প্রবেশ করাইয়া বড় করা হয়, আমরা নিশ্বাস লইলে, আমাদের কাপাসের ভিতরে হাওয়া প্রবেশ করিয়া ঐরূপভাবে ফুলিয়া উঠিয়া বড় হয়। আমাদের ফুস্‌ফুস্ ডাইনে বাঁয়ে দুইটী আছে, বুকের ডান দিকের খোলে একটী ও বাঁদিকের খোলে আর একটী থাকে। তবেই নিশ্বাসের নলীটী প্রথমতঃ একটী হইয়া আরম্ভ হইয়াছে বটে, কিন্তু নীচে দুইধারে দুইটী ফুস্‌ফুসে প্রবেশ করিবার জন্য প্রথমতঃ দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে। দুইভাগে বিভক্ত হইয়া ট্রেকিয়ার নিশ্বাসের নলীর দুইটী শাখা যে দুইধারে ফুস্‌ফুসের ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে, তাহার এক একটীকে Bronchus ব্রংকাস্ বলে। দুইটীকে Bronchi ব্রংকাই বলে। Bronchi ব্রংকাই Bronchus ব্রংকাসের বহুবচন মাত্র। অতএব Bronchi পদার্থে ঠিক ট্রেকিয়া, কিন্তু যে স্থান হইতে ঐরূপ শাখা হইয়া ফুস্‌ফুসের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে, সেই স্থান হইতে ট্রেকিয়ার ঐ দুইটা শাখাকে, আর ট্রেকিয়া না বলিয়া ব্রংকাই বলে, অর্থাৎ ব্রংকাই, ট্রেকিয়ার নিশ্বাসের নলীর ঐ দুইটা শাখার নাম মাত্র। আমাদিগের খাদ্য যাইবার নলী একটী সক রকম গেজের মত চামড়ার নল, অনেকটা যেন মোটা শিরার মত, আর ট্রেকিয়াটী অনেকটা ধমনীর মত। নিশ্বাস লইবার নলীটী গুড়্‌গুড়ীর নলের মত সর্ব্বদা খোলা থাকা আবশ্যক। অতএব গুড়্‌গুড়ীর নলে যেমন লোহার বা দস্তার তার জড়ান না থাকিলে ধোঁয়া আসিবার সুবিধা হয় না, নিশ্বাস লইবার নলীতেও ঐ রকম ফাঁক মত আছে। অর্থাৎ ৫০।৬০টী আংটী একটীর উপর আর একটী রাখিয়া ঐ আংটীর ভিতর দিকে ও বাহিরদিকে

চামড়া দিয়া ঢাকিলে যেরূপ একটী নল হয়। আমাদের নিশ্বাস লইবার নলীও ঠিক সেইরূপ। ট্রেকিয়া ও ব্রংকাই ছোট ছোট শাখা হইয়াছে, ছোট ছোট শাখা হইয়া যে ফুস্‌ফুসের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে, সকলেতেই ঐরূপ আংটির মত আছে। নিশ্বাস লইবার ছোট বড় নলী ঐরূপ খোলাভাবে থাকিলে, নিশ্বাস প্রশ্বাসের পথ পরিস্কার থাকে বলিয়া নিশ্বাস প্রশ্বাসের ছোট বড় নলী সকলই ঐরূপ। ঐ যে আংটির কথা বলিলাম, তাহা হাড়ের মত হইলে, বড় শক্ত ও কঠিন হয়, আর মাংসের মত হইলে অতিশয় নরম হয়, মাংসের মত আংটি থাকায় না থাকায় সমান, অতএব ঐ আংটিগুলি এমন একটী পদার্থে নির্ম্মিত হওয়া আবশ্যক যে, হাড়ের মতন অত কঠিন না হয়, আর মাংসের মত অত নরম না হয়। ঐরূপ পদার্থ আমাদের শরীরের আরও অনেক স্থানে আছে, উহাকে ইংরাজীতে Cartilage কার্টিলেজ বলে। আমাদের কাণ দুইটী ঐ পদার্থে নির্ম্মিত, আমাদের কাণ মাংসের মত তত নরম নহে, আর অস্থির ন্যায় তত কঠিনও নহে। কাণ যে রকম ভাবে হয় চাপিয়া রাখা যায়, কিন্তু ছাড়িয়া দিলে অর্থাৎ চাপা না থাকিলে পূর্ব্বমত কাণের আকার ধারণ করে। নিশ্বাস লইবার নলীর আংটিগুলিও ঐরূপ, চাপিলে বিলক্ষণ চাপা যায়, আর চাপ না থাকিলেই স্বাভাবিক মত গোল আংটির আকৃতি ধারণ করে। নিশ্বাসের নলী ফুস্‌ফুসের ভিতর প্রবেশ করিয়া ক্রমেই সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতম শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। আর ঐ গোল গোল আংটিগুলি ক্রমে অতি সূক্ষ্ম ডিম্বের আকারে শিকলের মত হইয়া ফুস্‌ফুসের সর্ব্ব স্থানে আছে। শিকলের মত হইয়া যে অতি সূক্ষ্ম ডিম্বের আকার হইয়াছে, তাহার ভিতরেও একটী

খোল আছে, ঐ খোলগুলিকে ইংরাজিতে Air cell এয়ার কেল ভাল বাঙ্গালায় বায়ুকোষ বলে। বায়ুকোষের সকল গায়ে চুলের মত সরু সরু শির আছে। আর ঐ শির দিয়া যখন রক্ত চলাচল করে, তখন উক্ত বায়ুকোষের ভিতরের বায়ুর সহিত সংলগ্ন হইয়া রক্ত পরিষ্কার হয়। ফুস্‌ফুসের ভিতরে ঐরূপ বায়ুকোষ অসংখ্য আছে, অতএব ঐ অসংখ্য বায়ুকোষে একত্রে প্রতি নিশ্বাসে রক্ত পরিষ্কার হইলে, এক সময়ে অনেক রক্ত পরিষ্কার হইল। আমাদিগের ফুস্‌ফুস্ যে স্পঞ্জের মত, আর হাওয়া প্রবেশ করিলে যে ফুলিয়া উঠে, সে কথা বলিবার আর বিশেষ আবশ্যক নাই। পাঁঠার ফুস্‌ফুস্ দেখিলেই, আমাদের ফুস্‌ফুস্ কিরূপ, তাহার বিশেষ উপলব্ধি হয়। আর একটী কথা, আমাদের কি পাঁঠার, অর্থাৎ যে জীব জন্তুর হউক না কেন, ফুস্‌ফুস্ দুইটী কেবল বায়ুকোষের সমষ্টি মাত্র। সাধারণ কথায় যেমন বলে যে, কম্বলের লোম বাছিতে যাইলে, আর কম্বলের কিছুই থাকে না, ফুস্‌ফুস্ সম্বন্ধেও সেইরূপ বলা যায় যে, বায়ুকোষ বাছিতে গেলে, আর ফুস্‌ফুসের অস্তিত্বই থাকে না।

পরিষ্কার রক্ত প্রথমতঃ পল্‌মোনারি ভেন্ (Pulmonary vein) দিয়া (Left Auricle অর্থাৎ হৃদ্‌পিণ্ডের) বাঁদিকের উপর কুঠরীতে আইসে, আর তাহার পর ঐ দিকের (Ventricle) ভেণ্ট্রিকেলে গিয়া গুঁড়ী ধমনী (Aorta) এ্যাওর্টায় আইসে, আর ঐ এ্যাওর্টার ছোট বড় শাখা প্রশাখা দিয়া (Vein) ভেন্ অর্থাৎ শিরায় আসিয়া অপরিষ্কার হওয়ার জন্য হৃদ্‌পিণ্ডের অপরিষ্কার রক্তের দিকের Auricle অরিকলে প্রথমতঃ আসিয়া, ঐ দিকের ভেণ্ট্রিকেলে যায়। আর ডানদিকের ভেণ্ট্রিকল

হইতে ঐ অপরিষ্কার রক্ত পরিষ্কার হইবার জন্য পল্‌মোনারি আর্টারি (Pulmonary Artery) দিয়া ফুস্‌ফুসের ভিতরে আইসে। ঐ রক্ত ফুস্‌ফুসে পরিষ্কার হইয়া হৃদ্‌পিণ্ডের পরিষ্কার রক্তের দিক্‌ বাঁ দিকে পল্‌মোনারি ভেন্‌ দিয়া যাইয়া উপস্থিত হয়। প্রথমতঃ বাঁদিকের অরিকলে যাইয়া তাহার পর বাঁ দিকের ভেণ্ট্রিকলে যাইয়া তথা হইতে গুঁড়িধমনী ও অন্যান্য ছোট বড় ধমনীতে আসিয়া পুনরায় পূর্ব্বমত শরীরে সঞ্চালিত হয়। এ সমস্ত কথা এক প্রকার বলা হইয়াছে। এখন হৃদ্‌পিণ্ডের কার্য্য কিরূপে হয়, এ সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা আবশ্যক। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, হৃদ্‌পিণ্ডে চারিটাটী কুঠরী আছে। যাহা হউক, হৃদ্‌পিণ্ডের বাঁদিকের ভেণ্ট্রিকেল হইতে কিরূপেই বা গুঁড়ী ধমনীতে রক্ত সঞ্চালন হয়, আর পরিষ্কার রক্তই বা কিরূপে হৃদ্‌পিণ্ডের ডানদিকের অংশে আইসে, এই সকল বিষয় একটু জানা আবশ্যক। হৃদ্‌পিণ্ড একটী মাংসপিণ্ড বই আর কিছুই নয়। আজ কাল ঘা ইত্যাদি ধোয়াইবার জন্য এক রকম রবরের পিচকারী ব্যবহার হয়। একটী বড় ডিম্বের আকারের গোলা, আর তাহার দুইদিকে দুইটী রবরের নল লাগান আছে। ঐ গোলাটীও রবরের, ভিতরে ফাঁপা। দুই দিকে যে রবরের নল লাগান আছে, তাহার একটী নল জলে ডুবাইয়া রাখিয়া ঐ পিচ-কারীর ডিম্বের মত গোলাটী একবার ধরিয়া চাপিয়া তাহার হাওয়া বাহির করিয়া দিলেই ঐ ডিম্বটী জলপূর্ণ হইতে আরম্ভ হয়। এমনি দুই চারিবার একবার সঙ্কোচ করিয়া চাপিয়া ধরা আবার ছাড়িয়া দেওয়া এইরূপ করিলেই ঐ ডিম্বটীর আর একটী নল দিয়া জোরে জল বাহির হইতে আরম্ভ করে। বলা অনাবশ্যক যে, দুটী

নল ডিম্বের দুই ধারে লাগাইলে প্রত্যেক নলের যে দুটী মুখ আছে, তাহার একটী করিয়া মুখ ডিম্বের সঙ্গে লাগান থাকে আর একটী মুখ খোলা থাকে, অতএব ঐ দুইটী নলের মধ্যে যে কোন নলটী হউক না কেন তাহার খোলা মুখটী জলে ফেলিয়া ডিম্বের ন্যায় ঐ রবরের গোলাটী একবার করিয়া চাপিয়া ছাড়িয়া দিলে এরূপ দুই চারিবার করিতে করিতেই অপর নলের খোলা মুখটী দিয়া জোরে জল বাহির হইতে আরম্ভ হয়। তবেই ঐ ডিম্বের ন্যায় রবরের গোলাটী চাপিয়া ছাড়িয়া দিয়া ক্রমান্বয়ে ঐরূপ করিতে থাকিলে জলও ক্রমান্বয়ে এক মুখ হইতে আসিয়া অন্য মুখ দিয়া বাহির হইতে থাকে। অতএব আমাদের হৃদ্‌পিণ্ড যেন ঐ পিচকারীর গোলাটী ক্রমান্বয়ে চাপিয়া ছাড়িয়া দিলে এক মুখ হইতে রক্ত আইসে, আর মুখ দিয়া রক্ত বাহির হইয়া যায়। হৃদ্‌পিণ্ড কাহাকেও চাপিতে হয় না, ঈশ্বরের কৌশলে আপনা হইতেই সঙ্কোচ হয় ও আবার ফুলিয়া উঠে, হৃদ্‌পিণ্ড ক্রমাগত এরূপ সঙ্কোচ হইতেছে ও ফুলিয়া উঠিতেছে ও রক্ত শিরা দিয়া হৃদ্‌পিণ্ডে আসিতেছে ও গুঁড়ী ধমনী দিয়া পিচকারীর ন্যায় পরিষ্কার রক্ত সর্ব্বশরীরে সঞ্চালিত হইয়া শরীরের সর্ব্ব স্থান জীবিত রাখিয়া বর্দ্ধন করিতেছে। হৃদ্‌পিণ্ডের সঙ্কোচ হওয়াকে ইংরাজিতে Systole সিষ্টোল বলে। আর সঙ্কোচ হইয়া যে পুনরায় ফুলিয়া উঠে, তাহাকে Diastole ডায়াষ্টোল বলে। হৃদ্‌পিণ্ডের উপরে কাণ রাখিয়া শুনিলে লব্ লব্, ডুব্ ডুব্ শব্দ বুঝিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ধমনীর আর হৃদ্‌পিণ্ড সঙ্কোচ হইবার সময় একটু যেন উপর দিকে লম্বা হয়, আর লম্বা হইয়া যেন লাফাইয়া উঠে, আর সেই জন্যই আমাদের বুকে খাঁচার ভিতরে ডুব্ ডুব্

করিয়া লাফাইয়া উঠিয়া খাঁচার ভিতরে যেন পাঁজরাতে ধক্ ধক্ করিয়া আসিয়া লাগে বোধ হয়। বলা আবশ্যক যে, হৃদ্‌পিণ্ডের ভিতরে হৃদ্‌পিণ্ডের সমস্ত দ্বারে এমন কপাট আছে যে, একবার রক্ত বাহির হইয়া আসিলে আর পুনরায় সেদিকে যাইতে পারে না। যথা,—Superior vena cava সুপিরিয়র ভিনা কেবা আর Inferior vena cava ইন্‌ফিরিয়র ভিনা কেবা হইতে যে অপরিষ্কার রক্ত হৃদ্‌পিণ্ডের ডান দিকের উপর কুঠরিতে আইসে, ঐ উভয়দ্বারেই এমনই কৌশল আছে যে, হৃদ্‌পিণ্ডে একবার রক্ত আসিলে আর বাহিরে যাইতে পারে না। সেইরূপ শুঁড়ী ধমনী দিয়া পরিষ্কার রক্ত হৃদ্‌পিণ্ডের বাহিরে আসিলে আর পুনরায় হৃদ্‌পিণ্ডের ভিতরে যাইতে পারে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, হৃদ্‌পিণ্ডের নীচের দিক, অর্থাৎ পায়ের দিক হইতে যে শিরা দিয়া অপরিষ্কার রক্ত হৃদ্‌পিণ্ডে আইসে, তাহাকে ইন্‌ফিরিয়র ভিনা কেবা বলে এবং মস্তক হাত ইত্যাদি স্থান হইতে যে শিরা দিয়া অপরিষ্কার রক্ত হৃদ্‌পিণ্ডে আইসে, তাহাকে সুপিরিয়র ভিনা কেবা বলে। হৃদ্‌পিণ্ডের এক কুঠরী হইতে যে অন্য কুঠরীতে রক্ত আইসে, অর্থাৎ ডান দিকের উপর কুঠরী হইতে যে ডান দিকের নীচের কুঠরীতে রক্ত আইসে ও ডান দিকের নীচের কুঠরী হইতে যে অপরিষ্কার রক্ত Pulmonary Artery পল্‌মোনারি আর্টারী দিয়া ফুস্‌ফুসে পরিষ্কার হইবার জন্য যায় এবং ফুস্‌ফুস হইতে পরিষ্কার হইয়া আসিয়া পল্‌মোনারী ভেন দিয়া যে পরিষ্কার রক্ত বাম দিকের উপর কুঠরীতে আইসে, ও তৎপরে উপর কুঠরী হইতে যে নীচের কুঠরীতে যায় এই সমস্ত আসা যাওয়ার দ্বারেই ঐরূপ বন্দোবস্ত আছে। অর্থাৎ বাহির হইয়া

আসিলে আর ভিতরে যাইতে পারে না ইত্যাদি। হৃদ্‌পিণ্ডের কার্য্যের আরও অনেক সূক্ষ্ম কথা আছে, তাহা এই সামান্য পুস্তকে বিস্তারিত করিয়া বলা অনাবশ্যক।

রক্ত শরীরের কোন্ স্থান হইতে কোন্ স্থানে যায় এ সমস্ত কথা এক রকম বলা হইল, কিন্তু শরীরের ভিতরে রক্ত সঞ্চালন সম্বন্ধে আর একটী সূক্ষ্ম কথা আছে। এ কথা মনে উঠিতে পারে যে, শরীরে রক্ত সঞ্চালন হইবার সময় এক রকম নলী হইতে রক্ত অন্য রকম নলীতে আসিল। অর্থাৎ এক হিসাবে রক্ত কোন স্থানে ঢালিয়া দেওয়া হইল না, কোন স্থানে বাহিরে আসিয়া পড়িল না, কেবল ধমনীর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শাখা হইতে আবার মুখে মুখে জোড় লাগিয়াছে যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরার শাখা তাহার ভিতরেই আসিল, অতএব রক্ত পরিষ্কারই হউক আর অপরিষ্কারই হউক, ঐ নলীর রক্ত নলীর ভিতরেই রহিল, ধমনী হইতে রক্ত শিরায় আসিল, আর শিরা হইতে হৃদ্‌পিণ্ডে আসিল। তবে শরীরের অস্থি চর্ম্ম ইত্যাদির সঙ্গে রক্তের সংলগ্ন হইয়া তাহাদের বর্দ্ধন কিরূপে হয়?

ENDOSMOSIS, EXOSMOSIS.

এণ্ডস্‌মোসিস্, একস্‌মোসিস্।

গরুর কি পাঁঠার বা অন্য যে কোন জানোয়ারের হউক পাকস্থলী বা খানিকটা আঁতুড়ী লইয়া যদি পাকস্থলী বা আঁতুড়ার ভিতরে কোন রঙ্গিন জল পোরা যায়, বোধ কর যেন পাঁচ সাত হাত পাঁঠার আঁতুড়ী লইয়া তাহার ভিতরে লাল ম্যাজেণ্টা গোলা জল পোরা হইল, আর তাহার পর ঐ আঁতুড়ীর দুটী মুখ

বেশ মজবুত করিয়া বাঁধিয়া একটী পরিষ্কার জলপূর্ণ গামলায় এমনভাবে ফেলিলে যে গামলার দুই কিনারা ছাড়াইয়া আর একহাত বা ততোধিক আন্দাজ নল দুই ধারেই গামলার বাহিরে রহিল, কারণ নলটী মাঝামাঝি করিয়া গামলার জলে ফেলিলে অতিশয় অধিক হইলেও মোট একহাত কি দেড়হাত নল ঐ গামলার জলের ভিতর থাকিবে, আর পাঁচ সাত হাত নলটীর মাঝামাঝি জলের ভিতরে রাখিলে কাজে কাজেই গামলার দুই ধারে প্রায় দুই হাত আড়াই হাত করিয়া নল বাহিরে রহিল। নলটী এরূপভাবে গামলায় ভিজাইয়া রাখিবার অভিপ্রায় এই যে, যদি কোনরূপে নলের মুখের বন্ধন উপযুক্ত মত না হয়, তাহা হইলে ঐ লাল ম্যাজেণ্টার জল নলের দুই ধারের মুখ দিয়া আস্তে আস্তে চোয়াইয়া পড়িলেও ঐ ম্যাজেণ্টার জলের সহিত গামলার জলের সহিত সংশ্রব থাকে না। অর্থাৎ ঐরূপ পড়িলেও মাটিতে পড়িবে আর গামলার প্রত্যেক ধার হইতে প্রায় দুই হাত অন্তরে মাটিতে পড়িবে। অতএব গামলার জলের সহিত ঐ নলেব মুখ দিয়া চোয়াইয়া পড়া জলের সহিত কোন সংশ্রব থাকিবে না। যাহা হউক, এই ভাবে ঐ নলটী গামলার জলে ডুবাইয়া রাখিলে পাঁচ সাত ঘণ্টা বা ২৪ ঘণ্টা অন্তর দেখা যাইবে যে, গামলার পরিষ্কার জল ক্রমে লাল রং হইয়াছে ও ঐ নলের ভিতরের ম্যাজেণ্টার জলে ক্রমে জল প্রবেশ করিয়া ঐ জলের রং পাতলা হইয়াছে। অর্থাৎ তখন আর পূর্ব্বমত তত লাল নাই। এরূপ হইবার কারণ এই যে, নলের লাল জল ক্রমে ঐ নলের গা দিয়া আস্তে আস্তে বাহিরে অর্থাৎ গামলার জলে আসিয়া মিশিয়াছে। ও গামলার পরিষ্কার জল কতকটা নলের ভিতরে

গিয়াছে। এইরূপ হওয়া প্রকৃতির নিয়ম। নলের ভিতরের জল যে বাহিরে আইসে, তাহাকে ইংরাজীতে Exosmosis এক্সস্‌মোসিস্‌ বলে, আর গামলার পরিষ্কার জল যে নলের ভিতরে যাইয়া মিশে, তাহাকে Endosmosis এণ্ডস্‌মোসিস্‌ বলে। আমাদিগের ধমনী বা শিরার রক্ত ঐরূপে বাহিরে আসিয়া পড়ে, আর তাহার দ্বারা শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বর্দ্ধন হয়। আর শরীরের অন্যান্য জলীয় অংশ ও ধমনীর বা শিরার ভিতরে রক্তে আসিয়া মিশিয়া রক্তকে অপরিষ্কার করে। ঐ সকলই রক্তের ক্লেদ্‌। ইহা ভিন্ন রক্তের ভিতরে যে পরমাণু আছে, অর্থাৎ যাহাকে ইংরাজীতে Red corpuscles রেড্‌ কর্পাসেল্‌স্‌ বলে, ঐ রেড কর্পাসেল্‌ ধমনীর গা ফাটিয়া বাহিরে আইসে। আর ঈশ্বরের এমনই কৌশল যে, ধমনীর ঐ ফাটা গা এমন ভাবে পুনরায় জুড়িয়া যায়, যে ধমনীর গাত্রে ঐ ফাটার চিহ্নমাত্র থাকে না।

Red Corpuscles and White Corpuscles.—রক্তের যে লাল বিন্দুর কথা বলিলাম, এ সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা আবশ্যক। আমাদিগের রক্ত দেখিতে যেন লাল ম্যাজেণ্টা গোলা জলের মত হইলেও ইহাতে দুই রকম বিন্দু মিশ্রিত আছে। এক রকম বিন্দু লাল আর এক রকম বিন্দু সাদা। বিশুদ্ধ রক্তে লাল বিন্দুর অংশ অধিক, সাদা বিন্দুর অংশ কম। এমন কি, বিশুদ্ধ রক্তে ৫০০।৬০০ বিন্দুর মধ্যে হয় ত একটী বিন্দু সাদা। আর রক্তের অপরিপক্ক বিন্দুই প্রথমে সাদা থাকে পরে লাল হইয়া যায়। আমাদের রক্তের রং যে লাল, তাহার কারণ ঐ লাল বিন্দু অধিক থাকার জন্যই রক্তের রং ঐরূপ লাল হইয়াছে। মানুষ রক্তহীন হইয়া যে ফ্যাকাসে হল্‌দে হল্‌দে সাদা রং হয়, চক্ষের পাতার

ভিতরেও একেবারে সাদা হইয়া যায়, তাহার অর্থ এই যে, ঐ ব্যক্তির রক্ত স্বাভাবিক মত নহে। ঐ রক্তে স্বাভাবিকমত লাল বিন্দুর অংশ খুব কম। আর সাদা বিন্দুর অংশই অধিক বলিয়া গায়ের রংও ঐরূপ হল্‌দে হল্‌দে, ফ্যাকাসে বা সাদা। মানুষ অধিক দিন পীড়িত থাকিলে যে এক রকম রক্ত বিহীন হইয়া যায়, তাহার কারণ এই যে, ঐ ব্যক্তির শরীরে রক্ত আছে বটে, কিন্তু সে রক্তে লাল বিন্দুর অংশ অনেক কম, অর্থাৎ রক্ত স্বাভাবিকমতে বিশুদ্ধ নহে। রক্তে লাল বিন্দুর অংশ না থাকিলে তাহাকে ইংরাজিতে Anæmia এনিমিয়া বলে, আর শরীরে বা শরীরের কোন স্থানে রক্তের লালবিন্দু অধিক পরিমাণে থাকিলে ঐ অবস্থাকে Hyperœmia হাইপেরিমিয়া বলে। রক্তের লাল বিন্দু বেশ ভাল বটে, তবে অধিক পরিমাণে লালবিন্দু থাকাও দোষ আর সাদা বিন্দু থাকাও দোষ। অতএব এনিমিয়াও একটী রোগ, হাইপেরিমিয়াও আর একটী রোগ। রক্তের লাল ও উভয় সাদা বিন্দু স্বাভাবিকমত থাকিলেই মঙ্গলের কথা।

ওলাউঠায় বা অন্যান্য রোগে যে কোমা হয়, সেই কোমার কথাই ভালরূপ বুঝাইয়া বলিবার জন্য শরীরের রক্ত চলাচল সম্বন্ধে এত কথা বলিতে হইল। এখন কোমা কিরূপে হয় ও তাহার চরমাবস্থা কি বলিয়া কোমার কথা শেষ করি। কেবল কোমার কথা কেন? রক্তের চলাচল সম্বন্ধে ভালরূপ বুৎপত্তি না থাকিলে কোন পীড়ারই নিগূঢ় তত্ব পাওয়া যায় না। আর মনুষ্য কিরূপে বাঁচিয়া থাকে ও মানুষের মৃত্যুই বা কি কি রকমে, কি কি কারণে হইয়া থাকে, তাহাও কিছু বুঝিতে পারা যায় না। রক্তের চলাচলের কথা যাহা বলিয়াছি, তাহাতে এক রকম

ভালই বুঝা উচিত যে, রক্তের চলাচল ও নিশ্বাস প্রশ্বাসের কার্য্যেই মনুষ্যজীবন রহিয়াছে। অতএব যে কোন কারণেই হউক না কেন, নিশ্বাস বন্ধ হইলে বা রক্তের চলাচল রোধ হইলে মনুষ্য তৎক্ষণাৎ মরিবে। গলা টিপিয়া ধরিলে বা গলায় দড়ি দিয়া বা ফাঁসী দিয়া মানুষ মরে, কারণ ইহাতে নিশ্বাস প্রশ্বাসের কার্য্য একেবারে হঠাৎ রোধ হইয়া যায়। নিশ্বাস প্রশ্বাস রোধ হইয়া যাইলে তৎক্ষণাৎ মনুষ্যের জীবন নাশ হওয়া ত অধিক কথা নয়। আবার ভয়ে হঠাৎ লোক মরিয়া যায়। ভয়ে হৃদ্‌পিণ্ডের কার্য্য একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। আর হৃদ্‌পিণ্ডের কার্য্য রোধ হইলেই তাহার সঙ্গে সঙ্গেই রক্তের চলাচল বন্ধ হয়। অতএব মনুষ্য-জীবন আর কিরূপে থাকে? শরীরে রক্ত চলাচল হওয়াই যাহার পর নাই আবশ্যক। এমন কি, নিশ্বাস বন্ধ হইয়াও যে মানুষ মরে, তাহার প্রকৃত কারণই রক্তের চলাচল বন্ধ হওয়া। নিশ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হইয়া, নিশ্বাস বন্ধ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ফুস্‌ফুসের কার্য্যের অবরোধ জন্মে। অর্থাৎ উহার ভিতরে রক্তের চলাচল বন্ধ হয়। আর তাহাতেই মানুষ মরে। পূর্ব্বে যে বলিয়াছি, ধমনী বা শিরার ভিতর রক্তের টুকরা জমিয়া যে রক্তের চলাচলের গতি-রোধ করে, যাহাকে ইংরাজীতে Embolism এম্বোলিসম্ বলে, তাহাতেও রক্তের চলাচল বন্ধ হওয়ার জন্য মানুষের জীবন নাশ হয়। ফুস্‌ফুসেই হউক, আর অন্য কোন স্থানেই হউক, রক্তের চলাচল বন্ধ হইলে রক্ত স্বাভাবিক মতে হৃদ্‌পিণ্ড হইতে সঞ্চালিত হইতে পারে না, অর্থাৎ এক স্থানে রক্তের পথ বন্ধ হইলে রক্তের চলাচল স্বাভাবিকমত না হওয়ার জন্য, সমস্ত রক্ত হৃদ্‌পিণ্ডে আসিয়া ঠেল মারিয়া থাকে। অবশেষে হৃদ্‌পিণ্ডের

রক্ত হৃদ্‌পিণ্ডেই থাকে। কারণ রক্ত স্থানান্তরিত হইবার রাস্তা বন্ধ। হৃদ্‌পিণ্ডে রক্ত ঠেল মারিয়া থাকিলে হৃদ্‌পিণ্ড সর্ব্বদাই একেবারে কাণাকাণি রক্ত ভরা থাকে। অতএব হৃদ্‌পিণ্ড স্বাভাবিকমত সঙ্কোচও হইতে পারে না, আর বিকশিতও হইতে পারে না। অতএব হৃদ্‌পিণ্ডের কার্য্য হইল না। হৃদ্‌পিণ্ড যেন অগত্যা এক রকম স্থির ভাবেই থাকে। আর যে কোন কারণেই হউক হৃদ্‌পিণ্ডের কার্য্য স্বাভাবিকমত না হইয়া স্থির ভাবে থাকিলেই মৃত্যু ঘটে। অনেক সময় হয়ত হৃদ্‌পিণ্ড ফাটিয়া যায়। আর মৃত্যুও তৎক্ষণাৎ ঘটিয়া থাকে। পূর্ব্বে যেরূপ বলিয়াছি যে, মনুষ্য হঠাৎ ভয় পাইলে হৃদ্‌পিণ্ডের কার্য্য বন্ধ হইয়া যায়। এও একপ্রকার সেই রকম। অর্থাৎ যে কোন কারণেই হউক, হৃদ্‌পিণ্ডের কার্য্য বন্ধ হইলে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু ঘটিবে। হৃদ্‌পিণ্ডের কার্য্য বন্ধ হইলে কি আর মানুষ বাঁচিতে পারে? রক্ত চলাচল বন্ধ হওয়ায় যে মনুষ্য মরিয়া যায়, তাহাকে ইংরাজীতে Syncope সিন্‌কোপে মরা বলে। Syncope সাধারণতঃ দুই কারণে হইতে পরে। ১ম, শরীরে একেবারে রক্তের অভাব হওযাতে, ধমনী ও শিরাতে একেবারে রক্ত নাই বলিয়া রক্তের চলাচল বন্ধ হইয়া যায়। যেমন স্ত্রীলোকদিগের জরায়ু হইতে বা অন্য স্থান হইতে অধিক পরিমাণে রক্তস্রাব হইলে, শরীরের সমস্ত রক্ত প্রায় এক রকম নিঃশেষ হইয়া যায়। আর শরীরের সমস্ত রক্ত বাহির হইয়া যাইলে হৃদ্‌পিণ্ডের কার্য্যও বন্ধ হইল। আর হৃদ্‌পিণ্ডের কার্য্যের আবশ্যকও রহিল না। কারণ হৃদ্‌পিণ্ডের কার্য্যই কেবল পিচকারীর ন্যায় শরীরের নানা স্থানে রক্ত সঞ্চালন করা। যে শরীরে রক্তই নাই সে শরীরে হৃদ্-

পিণ্ডের কার্য্য কোথায়? অতএব কোন স্থান হইতে বেশী পরিমাণে রক্তস্রাব হইলে যে মনুষ্য মরে দেখা যায়, সে মৃত্যু সিন্‌কোপে হইয়াছে বলিয়া মনে করিতে হয়। ২য়, হৃদ্‌পিণ্ডের কার্য্য শরীরে রক্ত থাকা সত্বেও হঠাৎ বন্ধ হইয়া যাইতে পারে। যেমন হৃদ্‌পিণ্ডের নিজের কোন পীড়ার জন্য বা কোন বিষাক্ত দ্রব্য শরীরে প্রবেশ করার জন্য, অতিশয় শোক বা ভয় ও বিদ্যুৎ পতন জন্য, শরীরের কোন স্থানে ধমনী বা শিরা ফাটিয়া বা ছিঁড়িয়া যাওয়ার জন্য, যে হঠাৎ হৃদ্‌পিণ্ডের কার্য্য বন্ধ হইয়া যায়, তাহাতেও মানুষের হঠাৎ মৃত্যু ঘটে। এই সকল কারণে মৃত্যু ঘটাকে ইংরাজিতে Asthenia এস্থিনিয়া বলে। বলা আবশ্যক যে, কোন কোন স্থলে ন্যূনাধিক দুই রকম কারণেই মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। অর্থাৎ কতক Anaemia এনেমিয়া, কতক Asthenia এস্থিনিয়া উপস্থিত থাকাতে মৃত্যু ঘটায়। যেমন মনুষ্য অনশনে মরিলে ক্রমে রক্তেরও অভাব হয়, আর শরীর ক্রমেই দুর্ব্বল হইয়া পড়ে বলিয়া হৃদ্‌পিণ্ড আপন কার্য্যে অক্ষম হয়। ক্ষয়-কাশ, রক্ত আমাশয় ইত্যাদি পুরাতন রোগে এইরূপ ঘটিয়া থাকে।

আবার কোন কারণে ফুস্‌ফুসের কার্য্যে বিঘ্ন জন্মাইলে বা একেবারে বন্ধ হইলে রক্ত আর রীতিমত পরিষ্কার হইতে পারে না। অতএব ধমনী দিয়া পরিষ্কার রক্তের স্থলে অপরিষ্কার রক্তই চলাচল করিতে থাকে। ফুস্‌ফুসের কার্য্য বন্ধ হইলে, রক্ত পরিষ্কার না হওয়ার জন্য পরে ত মনুষ্য মরেই, কিন্তু প্রথমেই নিশ্বাস বন্ধ হইয়া প্রাণনাশ হয়। নিশ্বাস বন্ধ হওয়াকে ইংরাজীতে Asphyxia এস্‌ফিক্‌সিয়া, Apnœa এপ্‌নিয়া বা Suffocation সফোকেসন

বলে। ফুস্‌ফুসে বায়ু যাইবার পথ একেবারে রোধ হইলেই এরূপ হইয়া থাকে। জলে ডুবে মরা, গলায় দড়ি বা ফাঁসি দিয়ে মরা, গলা টিপিয়া ধরিলে মরা, বা কোন ব্যায়রাম জন্য শ্বাস প্রশ্বাসের মাংসপেশী অবশ হইলে নিশ্বাস বন্ধ হইয়া মরা ইত্যাদিকে সফোকেশন্ জন্য মরা কহে। নিশ্বাস বন্ধ হইবার সঙ্গে সঙ্গে তিনটী কারণ একত্রিত হইয়া মৃত্যু ঘটায়। কারণ কেবল নিশ্বাস বন্ধ হইলেই ত মৃত্যু ঘটিতে পারে না। নিশ্বাস বন্ধ হইলে কেবল হাওয়া যাইবার পথ রোধ হইল, কিন্তু হাওয়া যাইবার পথ রোধ হওয়া, বা নিশ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হওয়ার নাম ত মৃত্যু নয়। নিশ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হইলেও ত রীতিমত শরীরে রক্ত চলাচল থাকা প্রথমতঃ একপ্রকার সম্ভব বলিয়া মনে হয়। কারণ নিশ্বাস প্রশ্বাসই বন্ধ হইল, রক্ত চলাচল কি কারণে বন্ধ হয়। আব রক্ত চলাচল থাকিলে মানুষ কি করে মরে। কেবল নিশ্বাস প্রশ্বাসের পথ রোধ হইলে মনুষ্য একেবাবে মবিতে পাবে না বটে, কিন্তু নিশ্বাস বন্ধের সঙ্গে সঙ্গে রক্তের পরিষ্কার হওয়া কার্য্যের বিশেষ ব্যাঘাত ঘটে। আর পরিষ্কার কার্য্যের ব্যাঘাত ঘটিলেই অপবিষ্কার রক্ত হৃদ্‌পিণ্ডের পরিষ্কার রক্তের কুঠরীতে যায়। সুতরাং এই অপরিষ্কার রক্ত ছোট বড় নানা আকারের ধমনীতে যাইয়া পৌছে। এমন ত কোন কথা নাই যে, রক্ত একেবারে পরিষ্কার না হইলে হৃদ্‌পিণ্ডের বাঁদিকে যাইতে পাবে না। হৃদ্‌পিণ্ডের ডানদিগ হইতে প্রথমতঃ অপরিষ্কার রক্ত ফুস্‌ফুসে যাইবে, আর ফুস্‌ফুস হইতে রক্ত পরিষ্কার হউক বা অপরিষ্কার অবস্থায়ই থাকুক, হৃদ্‌পিণ্ডের বাঁদিকে, অর্থাৎ পরিষ্কার রক্তের কুঠরীতে আসিতেই হইবে। পূর্ব্বেই বলিযাছি যে, যে স্থান হইতেই হউক, রক্ত একবার

যাইলে, আর পুনরায় সে স্থানে ফিরিয়া আসিতে পারে না। অতএব অপরিষ্কার রক্ত ফুস্‌ফুসে যাইবার পর সে স্থলে যদি এক বিন্দু রক্তও পরিষ্কার না হয়, তথাপি ঐ হৃদ্‌পিণ্ডের বাঁদিক্ অর্থাৎ পরিষ্কার রক্তের কুঠরীতে আসিতেই হইবে। কারণ রক্ত সঞ্চা-লনের গতির নিয়মই এই যে, যত ইচ্ছা যাও, যতদূর পার অগ্রসর হও, একবিন্দুও পুনরায় ফিরিয়া আসিতে পারিবে না। অতএব যুদ্ধের নিয়মের মত মর বাঁচ অগ্রসর হও, রক্তের গতিও সেইরূপ। পরিষ্কার হউক আর অপরিষ্কার অবস্থায় থাকুক, স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া অগ্রসর হইতেই হইবে। আর স্থান পরিত্যাগ করিয়া অগ্র-সর হইতে গেলেই প্রথমতঃ বাঁদিকের উপর কুঠরীতে, তাহার পর ঐ দিকের নীচের কুঠরীতে, তাহার পর শুঁড়ী ধমনী দিয়া শরীরের নানাস্থানে আসিতেই হইবে। তবে এখন দেখিতে হইবে যে, এখন কথাটা দাঁড়াইল কি? কথাটা দাঁড়াইল এই যে, অপরিষ্কার রক্ত অর্থাৎ Veinous blood পরিষ্কার না হইয়াই ধমনীর ভিতর আসিয়া পড়িল। আর অপরিষ্কার রক্ত শরীরে সঞ্চালন হওয়াতে হৃদ্‌পিণ্ড, ধমনী, মাংসপেসী ইত্যাদি শরীরের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিস্তেজ ও অবশ হইয়া পড়িল। অতএব নিশ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই আর তুইটা অবস্থা হয়। ১ম, হৃদ্‌পিণ্ডের পরিষ্কার রক্তের কুঠরীতে অপরিষ্কার রক্ত যাইয়া শরীরের ছোট বড় ধমনীতে ঐ অপরিষ্কার রক্ত সঞ্চালিত হওয়া; ২য়, শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বর্দ্ধন জন্য পরিষ্কার রক্তের স্থলে অপরিষ্কার রক্ত যাওয়াতে ঐ সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ভালরূপ বর্দ্ধন না হওয়া ও স্নায়ুর নিস্তেজতার জন্য ঐ সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিজে নিস্তেজ হইয়া পড়া।

হৃদ্‌পিণ্ড নিজে একটী শরীরের অঙ্গ ও একটী মাংসপেশী মাত্র। ধমনী সকলও ঐরূপ। অতএব হৃদ্‌পিণ্ড ছোট বড় ধমনীর সহিত একেবারে অবশ হইয়া পড়িলে শরীরে রক্ত সঞ্চালন তৎক্ষণাৎ বন্ধ হইয়া যায়। অতএব নিশ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ, হৃদ্‌পিণ্ড অবশ, শরীরে রক্ত সঞ্চালন রহিত, এই অবস্থার নামই মৃত্যু। মানুষের অবস্থায় ইহা ভিন্ন আর কি হইতে পারে বা হইয়া থাকে?

কোন কারণে নিশ্বাস প্রশ্বাসের পথ রোধ করিলে এইরূপ অবস্থা ঘটে। ইহা ভিন্ন এরূপ অনেক পীড়া আছে, যাহাতে ফুস্‌ফুসে রীতিমত রক্ত পরিষ্কার হয় না। আর সেই কারণে অল্পে অল্পে অপরিষ্কার রক্ত শরীরের নানা স্থানে সঞ্চালিত হইতে ্াকে। অপরিষ্কার রক্তে শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কোন অংশেরই ৺. হয় না। আর স্নায়ুসমষ্টিও একেবারে নিস্তেজ ও অকর্ম্মণ্য বর্দ্ধন ্ড়। অতএব গলা টিপিয়া ধরিলে এই তিনটী কারণ হইয়া প. পশ্বাস বন্ধ হওয়া, ২য়, শরীরে অপরিষ্কার রক্ত অর্থাৎ নিশ্বাস জন্য হৃদ্‌পিণ্ড ও শরীরের সমস্ত স্নায়ু হঠাৎ সঞ্চালিত হওয়া, ৩য়, ৬ একত্রিত হইয়া হঠাৎ মৃত্যু ঘটে। অকর্ম্মণ্য ও অচল হইয়া পড়া লি একত্রিত হইলে, অর্থাৎ কিন্তু পীড়া জন্য এই সকল কারণও. ী সময়ে মৃত্যু ঘটায়। অল্পে অল্পে সঞ্চিত হইয়া অপেক্ষাকৃত বে. হওয়াই চাই। অর্থাৎ মৃত্যু ঘটাইবার একত্রে এই তিনটী কারণ ন্ধ হওয়া তবে গলা টিপিয়া ধরা ইত্যাদি কারণে নিশ্বাস প্রশ্বাস ব. ম্বা প্রথম, দ্বিতীয় অপরিষ্কার রক্ত শরীরে সঞ্চালিত হওয়া ঘা৬. থাকে। কিন্তু ব্যারাম জন্য হইলে ফুস্‌ফুসের ভালরূপ কার্য্য না হওয়া বা পীড়া জন্য রক্ত অপরিষ্কার হওয়া প্রথমেই ঘটে, আর ফুস্‌ফুসের তত রক্তের ক্লেদ পরিষ্কার করিতে পারে না বলিয়া

শরীরে অপরিষ্কার রক্ত সঞ্চালিত হওয়া দ্বিতীয়, আর অপরিষ্কার রক্তে শরীরের কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বৰ্দ্ধন হয় না বা শরীরের কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্বাভাবিক সবল অবস্থায় থাকিতে পারে না; পরে অবশ ও অচল হইয়া পড়ে। হৃদ্‌পিণ্ড, স্নায়ু, ফুস্‌ফুস্ সকলই শরীরের অঙ্গ মাত্র, অতএব হৃদ্‌পিণ্ড, স্নায়ু, ফুস্‌ফুস্ অবশেষে যে অচল হইয়া পড়ে, এইটী এস্থলে তৃতীয় অবস্থা।

সংক্ষেপে গলা টিপিয়া ধরিলে প্রথমেই একেবারে ফুস্‌ফুসের কার্য্য বন্ধ হয় বলিয়া রক্ত পরিষ্কার হইতে পারে না। অতএব অপরিষ্কার রক্ত অপরিষ্কার অবস্থাতেই রহিল, আর সেই অপরিষ্কার রক্ত এত অপরিষ্কার হওন জন্য হঠাৎ হৃদ্‌পিণ্ড ও শরীরের অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে অবশ করিয়া ফেলে। কিন্তু পীড়ার জন্য ফুস্‌ফুসের কার্য্য একেবারে বন্ধ না হইয়া ও অল্পে অল্পে রক্ত অপরিষ্কার হইতে থাকে। আর অধিক দিনের পুরাতন পীড়ায় শরীরের সকল ইন্দ্রিয়ই ক্রমে ক্রমে দুৰ্ব্বল হইয়া পড়ে। অতএব পীড়ার জন্য রক্তে ক্লেদ ও বেশী জমে ও ফুস্‌ফুস্ বহুদিনের পীড়ায় দুৰ্ব্বল হইয়াছে বলিয়াও স্বাভাবিক মত রক্ত পরিষ্কার করিতে পারে না। এই দুই কারণ বশতঃ সৰ্ব্বদাই রক্তে কতক ক্লেদ রহিয়া যায়। এই সকল ক্লেদ সঞ্চিত হওয়ায় অবশেষে রক্ত এতদূর পর্য্যন্ত দূষিত হইয়া পড়ে যে, হৃদ্‌পিণ্ড ফুস্‌ফুস্ ইত্যাদি সকল অঙ্গকেই অবশ করিয়া ফেলে। আর সেই জন্যই মানুষ মরে। ফুস্‌ফুস্ অবশ, নিশ্বাস প্রশ্বাস চলে না, হৃদ্‌পিণ্ড অবশ, রক্ত সঞ্চালন হয় না, ইহারই নাম মৃত্যু। অতএব গলা টিপিয়া ধরা ইত্যাদি যে কোন কারণে হউক নিশ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হওয়া প্রথমই হয়, পরে অন্যান্য অবস্থা। কিন্তু পীড়াজন্য হইলে নিশ্বাস

প্রশ্বাসের কার্য্য একেবারে বন্ধ হওয়া হৃদ্‌পিণ্ডের অবশের সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্ব শেষে ঘটে।

কোন বিষাক্ত দ্রব্য রক্তের সহিত মিলিত হইয়া শরীরে সঞ্চালিত হওন জন্য স্নায়ু বা শরীরের অন্যান্য দ্রব্যকে নিস্তেজ ও অবশ করে। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, ওলাউঠার বিষ রক্তের সহিত মিলিয়া শরীরের নানা স্থানে প্রবেশ করিয়া শরীরের সমস্ত স্নায়ুকে অ।শ কবিয়া ফেলে বলিয়া Collapse কোলাপ্স ঘটে। শরীরের সমস্ত স্নায়ুর উৎপত্তির স্থান মস্তিষ্ক অর্থাৎ মাথার মগজ ও মেরু-দণ্ডের মজ্জা। সমস্ত স্নায়ু যেমন অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে, তেমনই কোন বিষাক্ত দ্রব্যেই হউক, কোন পীড়ার বিশেষ বিষেই হউক, বা শরীরের অবস্থা জন্যই হউক, মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডের মজ্জা অকর্ম্মণ্য ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে। মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডের মজ্জা স্নায়ুর উৎপত্তি স্থান এবং স্নায়ু জন্যই শরীরের সমস্ত মাংসপেশীর কার্য্য হইয়া থাকে। স্নায়ুই প্রকৃত মাংসপেশীর বল। সুতরাং স্নায়ু প্রকৃতিস্থ না থাকিলে শরীরের কোন কার্য্যই হইতে পারে না৷ পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমাদিগের হৃদ্‌পিণ্ড একটী মাংসপেশী মাত্র। ফুস্‌ফুসের কার্য্যও মাংসপেশীর জন্য হইয়া থাকে। শরীরের ধমনী শিরাতেও মাংসপেশী আছে। অতএব মস্তিষ্কের নিস্তেজতা জন্য স্নায়ুর নিস্তেজতা জন্মিয়া সমস্ত মাংসপেশীর কার্য্যের প্রতিবন্ধকতা জন্মায়। মাংসপেশীর কার্য্যের প্রতিবন্ধকতা জন্মাইলে অন্যান্য বিঘ্নের সহিত রক্ত পরিষ্কারের বিঘ্ন জন্মে। অতএব এখন মস্তি-ষ্কের নিস্তেজতা জন্য শরীরে ধমনী দিয়া অপরিষ্কার রক্ত বহিতে আরম্ভ হইল। আর অপরিষ্কার রক্তে কোন ইন্দ্রিয়ের বর্দ্ধন হয় না। আর শরীরের কোন কার্য্য চলে না। আর শরীরের কার্য্য

বন্ধ হইবার নামই মৃত্যু। কোনরূপ বিষেই হউক, আর মস্তিষ্কের কোন বিকৃতি জন্যই হউক, মস্তিষ্কের নিস্তেজ অবস্থার নামই কোমা। যেমন সমস্ত শরীরের নিস্তেজ অবস্থার নাম কোলাপ্স, তেমনই কেবল মস্তিষ্কের নিস্তেজ অবস্থার নাম কোমা। তবেই সমস্ত শরীরের নিস্তেজ অবস্থায় মনুষ্য শীঘ্র মরে, কোমায় এত শীঘ্র নয়, আস্তে আস্তে মৃত্যু ঘটে। আর একটী কথা বলা আবশ্যক। Suffocation সাফোকেসনে অর্থাৎ নিশ্বাস বন্ধ হইয়া মৃত্যু হইলে নিশ্বাস বন্ধ হওয়া প্রথম, দ্বিতীয় অপরিষ্কার রক্ত শরীরের ধমনী দিয়া সঞ্চালিত হওয়া, তৃতীয় তজ্জনিত শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের নিস্তেজতা হওয়া। কিন্তু কোমায় ইহার ঠিক বিপরীত। প্রথমেই মস্তিষ্কের নিস্তেজতা জন্য স্নায়ু ও মাংসপেশীর নিস্তেজতা জন্মে, তাহার পর শরীরে অপরিষ্কার রক্ত সঞ্চালিত হওন জন্য নিশ্বাসের কার্য্যের বিঘ্ন জন্মে, পরে নিশ্বাস রোধ হইয়া যায়। এস্থানে এ কথা বলিবার আবশ্যক এই যে, কখন কখন ওলাউঠায় Asphyxia এস্ফিক্সিয়া অর্থাৎ নিশ্বাস বন্ধ হইয়া মানুষ মরে। এইরূপ ওলাউঠায় সকল বিঘ্নের আগেই ফুস্ফুসীয় স্নায়ু শিথিল ও অকর্ম্মণ্য হয়। এমন কি, ফুস্ফুস একেবারে স্থিরভাবে থাকে, নড়েও না চড়েও না। কাজে কাজেই মানুষ মরে। আর গলা টিপিয়া মারিলে মানুষ যেরূপে মরে, ইহাতেও সেইরূপে মরে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভাল ভাল ডাক্তারেরা স্থির করিয়াছেন যে, হাতে পায়ে খাল বা আঁকড়ি ধরিয়া যে এক রকম সিকের মতন হইয়া যায়, ফুস্ফুসেও খাল ধরিয়া শক্ত হইয়া থাকে বলিয়া ফুস্ফুসের ভিতরে না হাওয়ার গতিবিধি হইতে পারে, না রক্তের চলাচল

হইতে পারে। তবেই এ রকম ওলাউঠায় মানুষ হাঁপাইয়া মরে। ভাল ভাল ডাক্তারেরা এই রকম ওলাউঠাকে Cholera Asphyxia কলেরা এস্‌ফিক্‌সিয়া বলেন।

কোন কোন স্থলে রক্তের সহিত রক্তের ক্লেদ বা অন্য বিষাক্ত দ্রব্য মিশ্রিত হইয়া যেমন শরীরের সর্ব্ব স্থানে সঞ্চালিত হয়, তেমনই মস্তিষ্কে যাইয়াও পৌঁছে। কিন্তু মস্তিষ্ক সকল স্থান অপেক্ষা সূক্ষ্ম ও নাজুক অর্থাৎ অতি সামান্যেই তাহার বিকৃতি জন্মে। অতএব ঐ বিষাক্ত দ্রব্য মস্তিকে যাইয়া পৌঁছিলে মস্তিষ্কের বিকৃতি জন্মে। সেই জন্যই আফিং ইত্যাদি বিষাক্ত দ্রব্যে জ্ঞানের বৈলক্ষণ্য মৃত্যুর অনেক পূর্ব্ব হইতেই হয় ও খারাপ রকম জ্বরে কোমা হয়। কারণ খারাপ রকম জ্বরে রক্ত এক প্রকার বিষাক্ত হয়। পূর্ব্বে বলিয়াছি, আমাদের প্রস্রাবের সহিত যে রক্তের ক্লেদ নির্গত হয়, তাহাকে Urea ইউরিয়া বলে। কিন্তু ওলাউঠা রোগে প্রস্রাস বন্ধ হইয়া যাইলে রক্তের ক্লেদ যে ইউরিয়া তাহা আর নির্গত হইতে পারে না। রক্তের ইউরিয়া রক্তেই থাকিয়া যায়। আর ঐ ইউরিয়া মিশ্রিত রক্ত মস্তিষ্কে যাইয়া মস্তিষ্কের এক রকম কোমা জন্মায়। উহাকে ইংরাজীতে Uræmic Coma ইউরিমিক কোমা বলে। Uræmia ইউরিমিয়াও বলিয়া থাকে। ইহাকে ইউরিমিক কোমা বা ইউরিমিয়া বলিয়া ব্যাখ্যা করিবার অর্থ এই যে, রক্তে ইউরিয়া থাকা জন্য যে কোমা হয়, তাহার নাম ইউরিমিক কোমা হওয়া উচিত।

শরীরের সর্ব্বস্থানেই রক্তের চলাচল আছে। আর রক্তই সকল দ্রব্যের প্রকৃত জীবন ও পোষক। রক্ত না পাইলে শরীরের কোন

স্থান বা কোন ইন্দ্রিয় বাড়িতে বা জীবিত থাকিতে পারে না। অতএব মস্তিষ্কের বর্দ্ধন জন্য রক্ত-চলাচলের আবশ্যক। কারণ মস্তিষ্কে প্রচুর পরিমাণে রক্ত না যাইলে মস্তিষ্কের বর্দ্ধনতা হয় না, মস্তিষ্কও স্বাভাবিক প্রকৃত অবস্থায় থাকিতে পারে না। শরীরের যেমন কোন স্থানে রক্তের গতিবিধি না থাকিলে সে অঙ্গ বা স্থান শুকাইয়া নিস্তেজ হইয়া যায়, মস্তিষ্কও সেইরূপ আমাদের একটী অঙ্গ; প্রচুর পরিমাণে রক্ত প্রাপ্তির অভাব হইলে মস্তিষ্কের বিকার বা বিঘ্ন জন্মে। অতএব মস্তিষ্কে বেশী রক্ত যাওয়ায় বা বিষাক্ত রক্ত যাওয়ায় যেরূপ মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটে, মস্তিষ্ক স্বাভাবিকমতে প্রচুর পরিমাণে রক্ত না পাইলেও বিকৃত ভাবাপন্ন হয়। আর সেই বিকৃতিকেও কোমা বলে। অতএব কোমা তিন কারণে হইতে পারে। ১ম—রক্ত অধিক পরিমাণে মস্তিষ্কে জমিয়া যে কোমা হয়, তাহাকে Congestive Coma কঞ্জেষ্টিভ বা Hyperemic হাইপিরিমিক কোমা বলে। ২য়—শরীরের রক্তে কোন রকম বিষ, পীড়ারই হউক বা অন্য কোন পদার্থের বিষ হউক বা রক্তের ক্লেদ হউক, মস্তিষ্কে উপস্থিত হইয়া যে কোমা উৎপাদন করে, তাহাকে বিষাক্ত কোমা বলে। অনেক স্থলে ঐ বিষ কি ঐ ক্লেদের নাম দিয়া ঐ কোমার নামকরণ করা যায়, যেমন ইউরিমিক কোমা। ৩য়—সমচিত পরিমাণে মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চালিত না হওয়ার জন্য মস্তিষ্কের বিকৃতি অর্থাৎ কোমা ঘটিয়া থাকে, এইরূপ কোমাকে ইংরাজিতে Anæmic Coma এনিমিক কোমা বলে অর্থাৎ এ কোমা মস্তিষ্কে রক্তের স্বল্পতা জন্য হইয়াছে মনে করিতে হইবে। তবেই মস্তিষ্কের বিকৃতি অবস্থার নামই কোমা। আর ঐ বিকৃত অবস্থা সাধারণতঃ পূর্ব্বোক্ত

তিন প্রকার কারণ জন্য হইয়া থাকে। মস্তিষ্ক মনুষ্যের জ্ঞানের আধার, অতএব মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটিলে জ্ঞানের বৈলক্ষণ্য হওয়া অবশ্যম্ভাবী। তবে ঐ তিন প্রকার কোমাতে জ্ঞানাভাবের তারতম্য থাকিতে পারে। রক্ত আধিক্য হইলে যে বিকৃতি জন্মে, তাহা মস্তিষ্কের নিস্তেজ অবস্থা নহে। অতএব হাইপিবিমিক কোমায় রোগীর স্বভাবতঃ একটু প্রচণ্ড ও উগ্রমূর্ত্তি হইয়া থাকে। সেইজন্যই বিকারের রোগী রোগের প্রথমাবস্থায় ঝাঁকিয়া ঝাঁকিয়া উঠে ও খুব জোরে চীৎকার করে। এই সব লক্ষণেই বুঝা উচিত যে, ঐ রোগীর কোমা রক্তাধিক্যের জন্য হইয়াছে, আর সেইজন্যই রোগীর এত জোর ও জ্ঞান বৈলক্ষণ্যের কার্য্য করিলেও ঐ সমস্ত কার্য্যে প্রচণ্ডতা ও উগ্রভাব লক্ষণ বেশী দৃষ্ট হয়। কিন্তু ঐ বিকারের রোগী ১৫।২০ দিনের দিন আর ঐ রকম করিয়া ঝাঁকিয়া ঝাঁকিয়া উঠে না আর চীৎকারও করে না, কিন্তু স্পন্দ রহিতের ন্যায় অজ্ঞান অবস্থায় থাকে বা যেন মনে মনে আপনা আপনি কি বিড়্ বিড়্ করিয়া বকে। যে রোগী পূর্ব্বে এরূপ প্রচণ্ড ছিল, সে যে এখন এরূপ নিস্তেজ সুস্থির অবস্থায় আছে, তাহার কারণ এই যে, ১৫।২০ দিন ব্যায়রামে ভুগিয়া নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে। প্রথম অবস্থার মত শরীরে তত আর রক্ত নাই। অতএব এখন সেই অজ্ঞান অবস্থা হইলেও এ অজ্ঞান অবস্থা রক্তের স্বল্পতা জন্য মস্তিষ্কের যে নিস্তেজ অবস্থা হইয়াছে তাহার জন্যই ঘটিয়াছে, আর সেই জন্যই পূর্ব্বেকার কোমা হইতে এখনকার কোমার ভিন্নরূপ আকার। ইহাতেই বুঝা উচিত যে, হাইপিরিমিক্ কোমা আর এনিমিক্ কোমার বাহ্যিক লক্ষণে প্রভেদ আছে। আর সে প্রভেদ পূর্ব্বেই বলা হইল। অতএব মাথায় বেশী রক্ত

জমিয়া জ্ঞানের বৈলক্ষণ্য জন্মিয়াছে বা রক্তের স্বল্পতা জন্য হইয়াছে, তাহা রোগীর বাহ্যিক লক্ষণে অনেকটা বুঝা যায়।

রক্ত বিষাক্ত হইয়া যে কোমা হয়, তাহাও এক প্রকার নিস্তেজ অবস্থার কোমার সদৃশ। কারণ রোগী বেশী দিন না রোগে ভুগিলে রক্ত বিষাক্ত হয় না। আর রক্তের ঐ বিষে শরীরের সমস্ত স্নায়ুকে দুর্ব্বল করে। অতএব রক্ত বিষাক্ত হইয়া কোমা হওয়াও অনেকটা শরীরের নিস্তেজ অবস্থার কোমার ন্যায়। ইউরিমিয়া অথবা ইউরিমিক্ কোমা রক্ত বিষাক্তের কোমা, অতএব ইউরি-মিক্ কোমার লক্ষণ অনেকটা এনিমিক্ কোমার মতন। তবে ইউরিমিক্ কোমার রোগী একটু অজ্ঞান আচ্ছন্ন বেশী।

নিস্তেজ অবস্থার কোমায় শরীরের রক্ত, বল, বীর্য্য নাই বলিলেই হয়। সেই জন্যই, নিস্তেজ অবস্থার কোমা হাইপিরিমিক্ কোমা হইতে বেশী ভয়ের কথা। হাইপিরিমিক্ কোমাতে রক্তের স্বল্পতা নাই, কিন্তু রক্ত চলাচলের ব্যাঘাতের জন্য হইয়াছে। ঐ টুকু সারিয়া গেলেই রোগী সহজে আরোগ্য হয়। যেমন অমাবস্যা, পূর্ণিমার বাতিক জ্বরে, বা পূর্ব্বদেশের সাঁজর জ্বরে রোগী কত কি এলো মেলো বকে, ঝেঁকে ঝেঁকে উঠে, আবার জ্বর ত্যাগ হইলেই রোগী একেবারে সুস্থ।

মস্তিষ্কে স্বাভাবিক দ্রুতবেগে রক্ত চলাচল না হওন জন্য মস্তিষ্কে কতকটা রক্ত জমিয়া ও মস্তিষ্কে রক্তের স্বল্পতা জন্য কোমা হইবার আর একটী কারণ আছে। পূর্ব্বে এক প্রকার উল্লেখ করিয়াছি যে, আমাদের শরীর যত লম্বা এক প্রকার তাহার মধ্যস্থলে রক্তের আধার হৃদ্‌পিণ্ডের থাকিবার স্থান। সেই জন্যেই লোকের শরীরের নিস্তেজ অবস্থায়, অর্থাৎ

কোলাপ্সে বা মৃত্যুর পূর্ব্বে হাত পা সমস্ত শরীরের অগ্রেই বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা হয়। তাহার কারণ এই যে, শরীরের নিস্তেজ অবস্থায় হৃদ্‌পিণ্ড দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। আর স্বাভাবিকমত পিচকারীর ন্যায় জোরে রক্ত সঞ্চালন করিতে পারে না। আমাদের হাত পা সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অপেক্ষা হৃদ্‌পিণ্ড হইতে অধিক দূরে, সেই জন্য হৃদ্‌পিণ্ডে রক্ত সঞ্চালনের শক্তি কম হইলে হৃদ্‌পিণ্ড অতদূর পর্য্যন্ত রক্ত চালাইতে পারে না, আর রক্তই শরীরের উষ্ণতার কারণ। রক্তবিহীন স্থান শীতল। অতএব হাত পায়ে স্বাভাবিক মত রক্তের গমনাগমন থাকে না বলিয়া সর্ব্বাগ্রেই হাত পা ঠাণ্ডা হয়। অনেক সময় জ্বর আসিবার পূর্ব্বেও হাত পা ঠাণ্ডা হয়, তাহার কারণ এই যে, জ্বর আসিবার পূর্ব্বে হৃদ্‌পিণ্ড দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, আর হৃদ্‌পিণ্ডের দুর্ব্বলতা জন্য হাত পা পর্য্যন্ত স্বাভাবিক পরিমাণে রক্ত আসিয়া পৌঁছে না। সুতরাং অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অপেক্ষা রক্তের অভাব জন্য হাত পা অবশ্য ঠাণ্ডা হইবে। অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইতে হাত পা হৃদ্‌পিণ্ড হইতে বেশী দূরে। আমাদের মস্তিষ্ক হাত পার মত তত দূরে না হউক, অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অপেক্ষা কতকটা দূরে বটে। অতএব হৃদ্‌পিণ্ড দুর্ব্বল হইলে মস্তিষ্কেও সমধিক পরিমাণে রক্ত সঞ্চালিত হইতে পারে না। ইহা ভিন্ন মস্তিষ্কে রক্তের শির অধিক, মস্তিষ্কের রক্তের আবশ্যকও অধিক। সুতরাং মস্তিষ্কে রক্তের স্বল্পতা হইলে অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অপেক্ষা বিকৃতি বা বিঘ্ন অতি গুরুতর হইয়া পড়ে। সুতরাং মস্তিষ্কের বিকৃতিতে বাহ্যিক লক্ষণও একটু বেশী ভয়ানক।

ওলাউঠায় হাত পা নীলবর্ণ হইবার কারণ।

খারাপ রকম ওলাউঠায় কোলাপ্স শীঘ্র হয়। আর কোলাপ্সের সঙ্গে সঙ্গেই হাত পা নীলবর্ণ হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আমাদিগের ভেন অর্থাৎ শিরার রক্তের রং নীলবর্ণ, হাত পায়ে রক্তের চলাচলের শক্তি কম হইলে ভেন অর্থাৎ শিরা হইতে রক্ত স্বাভাবিকমতে সঞ্চালিত হইয়া হৃদ্‌পিণ্ডে আসিয়া পৌঁছে না। শিরার রক্ত শিরাতেই থাকে। আর ঐ শিরার রক্ত নীলবর্ণ বলিয়া হাত পায়ের রং নীলবর্ণ হয়। মনে হইতে পারে যে, হৃদ্‌পিণ্ডের দুর্ব্বলতায় যদি রক্ত সমুচিত দ্রুতবেগে সঞ্চালিত না হয়, তবে কেবল শিরাতে কেন ছোট ছোট সরু সরু ধমনীতেও কতকটা রক্ত জমিয়া থাকিবে। অবশ্য তাহা অনেক সম্ভব বটে, কিন্তু ইহার মধ্যে একটী কথা। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ধমনী ছোট হউক বড় হউক, ধমনীমাত্রেই স্থিতিস্থাপক গুণসম্পন্ন, অতএব স্থিতিস্থাপক গুণসম্পন্ন যে রক্তের নাড়ী, তাহাতে হৃদ্‌পিণ্ড হইতে শক্তি প্রাপ্ত না হইলেও আপন আপন স্থিতিস্থাপক শক্তিতে কতক পরিমাণে রক্ত সঞ্চালিত করিতে পারে। কিন্তু শিরার সে স্থিতিস্থাপক শক্তি নাই। কাযে কাযেই হৃদ্‌পিণ্ডের দুর্ব্বলতায় শিরার রক্ত যেমন স্থিরভাবে এক স্থানে থাকিবে, ধমনীর রক্ত সেরূপ ভাবে বা সেরূপ পরিমাণে কখন থাকিতে পারে না। তবেই দেখ যে, যে কোন অঙ্গে হউক না কেন, রক্তের চলাচলশক্তি কম হইলে সে স্থানে নীলবর্ণ শিরার রক্ত বেশী পরিমাণে থাকিবে কি না। আর যে রকম রক্ত বেশী বাহিরে তাহারই রং বেশী প্রকাশ। সেইজন্যই ওলাউঠা রোগীর কোলাপ্সের সঙ্গে

সঙ্গেই হাত পা অগ্রে নীলবর্ণ হয়। আর এই কারণেই ডাক্তা-রেরা ঐরূপ ওলাউঠাকে ব্লু কলেরা বলিয়া থাকেন। ব্লু কলেরাতে অবশ্য হাত পায়ের নীলবর্ণ বেশী, কিন্তু ন্যূনাধিক শরীরের সকল স্থানেরই রং একপ্রকার শিটা শিটা নীলবর্ণ হইয়া যায়। হৃদ্‌পিণ্ডের দুর্ব্বলতায় কেবল হস্ত পদে কেন, শরীরের অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গেও সমুচিত পরিমাণে রক্তের চলাচল হয় না। অর্থাৎ সেই সেই স্থলেও শিরার নীলবর্ণ রক্তের আধিক্য হয়। অতএব কমবেশ রোগীর সমস্ত অঙ্গই একপ্রকার নীলবর্ণ হইয়া যায়।

আর একটী কথা, এ কথা মনে হইতে পারে যে, রক্তের চলাচলশক্তি কম হইলে যদি সে অঙ্গ নীলবর্ণ হইয়া যায়, আর ঠাণ্ডা হয়, তবে মৃত্যুর পূর্ব্বে মনুষ্যের রক্তের চলাচলের শক্তির স্বল্পতা জন্য হাত পা শীতল হইবার সঙ্গে সঙ্গে নীলবর্ণ হয় না কেন? ইহার একটী বেশ কারণ আছে, ওলাউঠায় মানুষ সুস্থ শরীরে থাকিয়া হঠাৎ এইরূপ ভয়াবহ রোগগ্রস্ত হয়। অর্থাৎ মনুষ্যের স্বাভাবিক অবস্থায় যত পরিমাণে রক্ত থাকা উচিত, সেই পরিমাণে রক্ত থাকিতে থাকিতেই হৃদ্‌পিণ্ডের ঐরূপ সর্ব্বনাশ ঘটে। কিন্তু যে রোগী অধিক দিন রোগে ভুগিতেছে, তাহার শরীরের রক্ত দীর্ঘকাল রোগ জন্য এমনিই খুব অল্প হইয়া আসিয়াছে। সে শরীর প্রায় এক প্রকার রক্তবিহীন। অতএব ওরূপ রুগ্ন শরীরে শিরার নীলবর্ণ রক্ত অধিক পরিমাণে কম। অতএব এরূপ অবস্থায় মৃত্যুর পূর্ব্বে শিরাতেও অধিক পরিমাণে রক্ত থাকে না বলিয়া হাত পায়ে শিরার রক্তের রংও দেখা যায় না। শিরার রক্তও ত রক্ত, তবে অপরিষ্কার। অধিক দিনের রুগ্ন শরীরে পরিষ্কার রক্তই হউক আর অপরিষ্কার রক্তই

হউক, সমস্ত রক্তই একেবারে পরিমাণে কম হয়। অতএব এরূপ শরীরে আর শিরার রক্তের রং কিরূপে দেখা যাইবে?

PULSE পল্‌স্, হৃদ্‌পিণ্ডের ধড়ধড়ি ও নাড়ী।

কোমার কথা বলিতে শরীরে রক্ত সঞ্চালনের কথা সংক্ষেপে এক রকম বলিলাম। এক্ষণে হৃদ্‌পিণ্ডের ধড়ধড়ি কিরূপে হয়, মনুষ্যের নাড়ী জিনিষটা কি? নাড়ী কত রকমের আছে? সে সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলিতে হয়। নাড়ী পরীক্ষা করা সম্বন্ধে এক রকম মোটামুটী কয়েকটা কথা বলিব বটে, কিন্তু ফল কথা এই যে, নাড়ী দেখা সম্বন্ধে বহুদর্শীতা না জন্মাইলে নাড়ীপরীক্ষা সম্বন্ধে সমস্ত কথা একেবারে তিন দিনে বুঝা যায় না। তবে এ কথাও বটে যে, মোটামুটি এক রকম নাড়ীর গতি না বুঝিলে নাড়ী পরীক্ষা করিবার সন্ধান পাওয়া যায় না। সেইজন্যে নিম্নে নানারকম নাড়ীর কি কি পরীক্ষা, আর নাড়ী পরীক্ষা সম্বন্ধে কয়েকটী প্রধান প্রধান কথা বলিতে চাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, হৃদ্‌পিণ্ডের কার্য্যেই নাড়ীর উৎপত্তি অর্থাৎ ধমনীতে যে জোরে রক্ত চলাচল হয়, আর হৃদ্‌পিণ্ডের ন্যায় ধমনী যে সেই রূপ সংকোচ হইয়া ধমনীর অন্য অংশে রক্ত সঞ্চালনের সময় একটু লাফ দিয়া উঠে, আর ঐ রকম প্রতি লাফে মণিবন্ধে হাত রাখিলে আমাদের আঙ্গুলে আসিয়া ধক্ ধক্ করিয়া যে লাগে, তাহাকেই নাড়ী বলে। এই হইল নাড়ীর উৎপত্তির কারণ। অতএব পীড়া জন্য হৃদ্‌পিণ্ডের দুর্ব্বলতা, অথবা হৃদ্‌-পিণ্ডের নিজের কোন বিকৃত জন্য নাড়ীর স্বাভাবিক গতিতে

বৈলক্ষণ্য জন্মে। রক্ত চলাচল ভাল না হইলে, বা হৃদ্‌পিণ্ড স্বাভাবিক সজোর অবস্থায় না থাকিলে স্বাভাবিক সুস্থ শরীরের ন্যায় রক্ত চলাচলও হয় না, আর নাড়ীও স্বাভাবিক সুস্থ শরীরের ন্যায় থাকে না। তবে নাড়ীর ও হৃদ্‌পিণ্ডের স্বাভাবিক অবস্থা কি? স্বাভাবিক অবস্থায় কিরূপে এক মিনিটে কতবার হৃদ্‌পিণ্ড ও নাড়ী ধক্ ধক্ করে, তাহা সর্ব্বাগ্রে জানা আবশ্যক। স্বাভাবিক অবস্থা না জানিলে অস্বাভাবিক অবস্থা কিরূপে নিরূপণ হইবে। পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি তাহাতেই ঠিক বুঝা উচিত যে, যে হৃদ্‌পিণ্ডের ধক্ ধক্, সেই নাড়ীর ধক্ ধক্। হৃদ্‌পিণ্ডের ধক্‌ধকের সঙ্গে সঙ্গেই নাড়ীর ধক্ ধকানি টের পাওয়া যায়। প্রকৃত হৃদ্‌পিণ্ডের ধক্ ধক্ ও নাড়ীর ধক্ ধক্ ঠিক একসময়েই হইয়া থাকে। অতএব হৃদ্‌পিণ্ডে কাণ দিয়া নাড়ীর উপর হাত দিয়া থাকিলে হৃদ্‌পিণ্ডের ধক্ ধকানী যেমন কাণে আসিয়া লাগে, এ দিকে নাড়ীর ধক্‌ধকানীও আঙ্গুলে আসিয়া লাগে এবং সেইজন্যেই একমিনিটে যদি ৭২ বার হৃদ্‌পিণ্ডের ধক্ ধকানী হয়, নাড়ীর ধক্ ধকানীও ঐ ৭২ বার। আর হৃদ্‌পিণ্ডের ধক্‌ধকানী মৃদু হইলে নাড়ীর ধক্‌ধকানীও মৃদু অর্থাৎ দুর্ব্বল নাড়ী; তবে মণিবন্ধে একেবারে নাড়ী না পাওয়া গেলেও হৃদ্‌পিণ্ডের ধক্‌ধকানী দুর্ব্বল অবস্থায়ও কতকটা পরিমাণে থাকে। যেমন ওলাউঠার কোলাপ্স অবস্থায় হয় ত তিন দিন পর্য্যন্ত বা ততোধিক মণিবন্ধে নাড়ী থাকে না। কিন্তু হৃদ্‌পিণ্ডের কার্য্য হয়, আর মানুষও বাঁচিয়া থাকে, সুতরাং এমন মনে করিতে হইবে না যে হাতে নাড়ী নাই বলিয়া হৃদ্‌পিণ্ডের কার্য্য একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। হৃদ্‌পিণ্ডের কার্য্য একেবারে

শেষ হইলে মানুষের প্রাণ শেষ হয়। তবে হৃদ্‌পিণ্ড অতিশয় দুর্ব্বল বলিয়া হাত পর্য্যন্ত রক্ত পৌছাইতে পারে না বলিয়া হাতে নাড়ী পাওয়া যাইতেছে না।

হৃদ্‌পিণ্ড সকল সময় সমানভাবে থাকে না। সহজ অবস্থায় হৃদ্‌পিণ্ডের ধক্‌ধকানী প্রমাণ বয়স্ক ব্যক্তিদের সুস্থ অবস্থায় এক মিনিটে ৭২ বার। কিন্তু পীড়িত শরীরে ত কথাই নাই, সুস্থ শরীরেও সমস্ত দিনের মধ্যে হৃদ্‌পিণ্ডের ধক্‌ধকানী অর্থাৎ নাড়ী কম বেশী হয়। বয়স অনুযায়ী, শরীরের শীতলতা বা উষ্ণতা অনুযায়ী, পুরুষ বা স্ত্রীলোক অনুযায়ী, খাবার বেশী কম হিসাবে, বেশী পরিশ্রম হিসাবে, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দিবা রাত্রি হিসাবে, শোওয়া বসা দাঁড়ান ইত্যাদি হিসাবে, বাসস্থানের উচ্চতা হিসাবে আমাদিগের নাড়ীর পরিবর্ত্তন হয়। এই রকম অবস্থা অনুযায়ী পরিবর্ত্তনের একটা আনুমানিক জায় দেওয়া গেল।

জন্মাইবার পর এক বৎসরের মধ্যে এক মিনিটে নাড়ী ১৪০ বার হইতে ১৩০ বার পর্য্যন্ত চলে। এক বৎসরের পর দুই বৎসর পর্য্যন্ত ১৩০ হইতে ১১৫। দুই বৎসর হইতে তিন বৎসর পর্য্যন্ত ১১৫ হইতে ১০০। তিন বৎসর বয়স হইলে ১০০ হইতে ৯০। সাত বৎসর বয়সে ৯০ হইতে ৮৫। ১৪ বৎসরে ৮৫ হইতে ৮০। আর প্রমাণ বয়েসে ৮০ হইতে ৭০। বৃদ্ধাবস্থায় ৭০ হইতে ৬০। জরাজীর্ণ ব্যক্তির ৭৫ হইতে ৬৫। এই হিসাবটীতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, শৈশবে নাড়ীর গতি অধিক ও বার্দ্ধক্যে কম। প্রমাণবয়স্ক ব্যক্তির নাড়ী সুস্থ শরীরেও সকলের সমান নয়। একজনেব নাড়ী যদি ৭০ হয় ত আর

একজনের নাড়ী ৭২, তৃতীয় ব্যক্তির ৭৫, চতুর্থ ব্যক্তির ৭৭, পঞ্চম ব্যক্তির ৮০। এইরূপ অবস্থায় একটা মধ্যবিত অঙ্ক লইয়া এক রকম অনুমান করা গিয়াছে যে, সুস্থ শরীরের নাড়ী এক মিনিটে ৭২ বার চলা উচিত। আর ৭২ বারই সুস্থ শরীরের নাড়ী ধরিয়া পীড়া বা অন্য কোন কারণে কম বেশী গণনা করা হয়। স্বাভাবিক অবস্থায় যে নাড়ীর কম বেশী হয়, তাহার কয়েকটী কথা নিম্নে বলা যাইতেছে।

প্রথম ;—বয়স হইলে, যেমন সকল শরীরের একটু জড়তা জন্মে, সেইরূপ হৃদ্‌পিণ্ডেরও কতকটা জড়তা হয়, অর্থাৎ বৃদ্ধকালে স্ফূর্ত্তির অভাব জন্য হৃদ্‌পিণ্ডের গতি কিছু মৃদু, আর সেইজন্য নাড়ী কিছু স্থূল ও গতিকে শিথিল হয়। কিন্তু বয়স খুব বেশী হইলে, মনুষ্য যেমন জ্ঞান চৈতন্যে শিশুর ন্যায় হয়, সেইরূপ নাড়ীর গতিও খুব বেশী বয়সে বাড়ে।

দ্বিতীয় ;—রাগী উদ্ধত স্বভাবের লোকদিগের নাড়ী স্বভাবতঃ একটু বেশী চঞ্চল, অতএব সুস্থির স্বভাবের ব্যক্তির নাড়ীর গতি যদি এক মিনিটে ৭০ হয়, তবে উদ্ধত কোপন স্বভাব ব্যক্তির নাড়ী এক মিনিটে ৭৫। স্ত্রীলোকেরা পুরুষ হইতে স্বভাবতঃ একটু দুর্ব্বল, সেই জন্য সমান বয়স্ক স্ত্রীলোকের পুরুষ অপেক্ষা নাড়ীর গতি একটু বেশী। অতএব ৩০ বৎসর বয়স্ক পুরুষের নাড়ী যদি ৭৫ হয়, তবে ঐ বয়সের স্ত্রীলোকের নাড়ী হয় ত ৮২। তবে বাধক বেদনাগ্রস্ত বা স্বভাবতঃ কোপনা স্ত্রীলোকের নাড়ী আরও বেশী।

তৃতীয় ;—আহারের পর শরীর স্বভাবতঃ পূর্ব্বাপেক্ষা উষ্ণ ও তজ্জন্য নাড়ী চঞ্চল হয়।

চতুর্থ ;—মনুষ্য কোপগ্রস্ত বা শোকগ্রস্ত অর্থাৎ যে কোন কারণে হউক উত্তপ্ত, উদ্বিগ্ন বা উদ্ধত হইলে নাড়ীর চাঞ্চল্য কিছু অধিক হয়।

পঞ্চম ;—প্রাতে অপেক্ষা বৈকালে নাড়ীর গতি বেশী। মানুষের দণ্ডায়মান অবস্থায় নাড়ীর গতি ঢের বেশী। উপবেশনে তদপেক্ষা কম। শয়নে উপবেশন অপেক্ষা কম। তবে শয়ন অবস্থাতেও যদি উদ্বিগ্ন বা পীড়ার জন্য অস্থিরতা থাকে, তাহা হইলে স্বভাবতঃ নাড়ীর চাঞ্চল্য জন্মে।

ষষ্ঠ ;—সমতল ভূমি অপেক্ষা কোন উচ্চস্থানে, যেমন পর্ব্বতশিখরে থাকিলে নাড়ীর চাঞ্চল্য অধিক।

সপ্তম ;—শীত অপেক্ষা গ্রীষ্মে নাড়ীর চাঞ্চল্য অধিক। শীতে যেরূপ মানুষের জড়তা জন্মে, কতক পরিমাণে শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, ধমনীর ও হৃদ্‌পিণ্ড ইত্যাদিরও জড়তা জন্মে।

নাড়ী ধক্ ধক্ করিয়া আসিয়া যে হাতে লাগে, তাহাকে ইংরাজিতে Wave ওয়েভ্ বলে। বাস্তবিক ইহা এক একটী রক্তের ঢেউ। ওয়েভ্ অর্থাৎ ঢেউ বা তরঙ্গ। বাস্তবিক যেন তরঙ্গের ন্যায়ই নাড়ী হাতে আসিয়া লাগে। চঞ্চল নাড়ীর তরঙ্গের স্থায়িত্ব অনেক কম অর্থাৎ নাড়ী শীঘ্র শীঘ্র ধক্ ধক্ করিয়া হাতে আসিয়া লাগে। অতএব তরঙ্গের স্থায়িত্বের কম বেশী অনুযায়ী মৃদু বা চঞ্চল বলিয়া গণ্য হয়।

তরঙ্গ ভিন্ন নাড়ীর সরু মোটা হওয়া আছে। অর্থাৎ কোন স্থলে নাড়ী একেবারে মোটা রজ্জুর ন্যায় স্থূল ও কোন স্থলে সূত্রের ন্যায় সূক্ষ্ম। স্থূল নাড়ীকে ইংরাজিতে Large Pulse

লার্জ পল্‌স্ বলে, সূক্ষ্ম নাড়ীকে ইংরাজিতে Thready or Wiry pulse থ্রেডি বা ওয়ারি পল্‌স বলে।

অনেক সময় নাড়ী একেবারে সূতার ন্যায় সূক্ষ্ম না হইলেও নাড়ীর এমন অবস্থা হয় যে, অঙ্গুলী দিয়া মণিবন্ধে একটু চাপিয়া ধরিলেই আর যেন নাড়ী পাওয়া যায় না। এরূপ নাড়ীকে ইংরাজিতে Compressible pulse কম্‌প্রেসিবল্ পল্‌স্ কোমল নাড়ী বলে। নাড়ীর স্থূলতা বা সূক্ষ্মতা হিসাবে কোমল বা শক্ত হয় না। কারণ এদিকে নাড়ী তত সূক্ষ্ম নয় এক প্রকার যেন স্থূল, কিন্তু অঙ্গুলী দিয়া চাপিয়া ধরিলে সে নাড়ী যেন মিলাইয়া যায়, আঙ্গুলের নীচে আর ধক্ ধক্ করে না। আবার এমন নাড়ীও আছে যে, সূতার ন্যায় সূক্ষ্ম, কিন্তু যেন লোহার তারের ন্যায় শক্ত। হাজার চাপিয়া ধর, তথাপি যেন সেতারের তারের ন্যায় ধুক্ ধুক্ করিয়া হাতে আসিয়া লাগে। সেতারের তারের মত সূক্ষ্ম অথচ কঠিন নাড়ী নিউমণিয়ার রোগীর হইয়া থাকে। কম বেশ কোন স্থলে অধিক প্রদাহ হইলে নাড়ী ঐরূপ সেতারের তারের ন্যায় সূক্ষ্ম অথচ কঠিন হইয়া থাকে। ইংরাজিতে ঐরূপ নাড়ীকে Wiry pulse ওয়ারি নাড়ী বলে। ইংরাজিতে লোহার তারকে Wire বলে। সেই জন্যই লোহার তারের মত নাড়ীকে ইংরাজিতে Wiry pulse বলে। ঐ রকম কোমল নাড়ী এক রকম স্থূল থাকিলেও স্থির সূতার ন্যায় সূক্ষ্ম নাড়ী অপেক্ষা খারাপ। সূতার ন্যায় সূক্ষ্ম স্থির নাড়ী শীঘ্র ছাড়িয়া যায় না। কিন্তু এ রকম স্থূল কোমল নাড়ী কখন যে যায়, তাহার কোন স্থিরতা নাই। হয় ত এই আছে আর এই নাই। ইহা ভিন্ন ও রকম নাড়ীর একটী বিশেষ দোষ

আছে। ও রকম কোমল নাড়ী একবার ডুবিলে আর ভাসে না। যাইলে আজও গেল কালও গেল। ম্যালেরিয়া জ্বরে যে কোলাপ্সের কথা বলিয়াছি, সেই কোলাপ্স হইবার আগে নাড়ীর এইরূপ কোমল অবস্থা ঘটে। অন্যান্য পীড়ায় যে রূপ হউক, ম্যালেরিয়া জ্বরে নাড়ীর কোমল অবস্থা হইলে আসন্ন মৃত্যুর অবস্থা মনে করিতে হইবে। অন্যান্য অবস্থায়ও নাড়ীর কোমল অবস্থা অতিশয় মন্দ, তবে ম্যালেরিয়া জ্বরে নাড়ীর হঠাৎ ঐরূপ কোমল অবস্থা ঘটে, ম্যালেরিয়া জ্বরে জ্বরত্যাগ কালীন নাড়ীর কোমল অবস্থা হয়। জ্বর থাকিতে নাড়ীর কোমল অবস্থা ঘটে না, সেই জন্য কবিরাজেরা জ্বর ভুক্ত নাড়ীকে ভাল বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

নাড়ীর ধুক্ ধুকে অসমতা, অর্থাৎ নাড়ীর তরঙ্গ আসিয়া হাতে লাগিতেছে ইহার মধ্যে ২।৪ বার তরঙ্গের অভাব হইল। অর্থাৎ নাড়ী যেন একেবারে নিভে গেল। আবার তড়তড় করিয়া আসিল। এ নাড়ীকে ইংরাজিতে Intermittent ইণ্টারমিটেণ্ট পল্‌স বলে। এরূপ নাড়ী সর্ব্বাপেক্ষা মন্দ। এরূপ নাড়ী হইবার কারণ এই যে, হৃদ্‌পিণ্ড এত দুর্ব্বল যে, কার্য্য করিতে পারে না। চলে চলে আবার স্থির হইয়া থাকিয়া যায়। আর এইরূপ থামিতে থামিতে একবার এমন থামিবে যে আর চলিবে না। এমত অবস্থায় এরূপ নাড়ীতে ভয়ের কথা খুবই আছে।

নাড়ীর চাঞ্চল্যের নানা কারণ আছে, তাহার মধ্যে জ্বরই একটী প্রধান কারণ। জ্বরে শরীরের উত্তাপও বেশী হয়, নাড়ীর চাঞ্চল্যও বেশী হয়, সুস্থ অবস্থায় সকলকার শরীরের উত্তাপ সমান নহে। যেমন স্বাভাবিক অবস্থায়ও সকলকার নাড়ী সকল অন-

সকল সময় সমান নয়, শরীরের উত্তাপও সেইরূপ। যাহা হউক ৯৮'৪ সহজ শরীরের উত্তাপ বলিয়া স্থির করা হইয়াছে। জ্বরে শরীরের উত্তাপও যেরূপ বাড়ে, নাড়ীও সেই পরিমাণে বেশী চঞ্চল হয়, আর সকল সময়ে শরীরের উত্তাপের সহিত নাড়ীর চাঞ্চল্যের সমান থাকে না। কারণ সাধারণতঃ ১ ডিগ্রি শরীরের উত্তাপ বাড়িলে নাড়ীর ' ধক্‌ধকানী অর্থাৎ beat বীট দশবার বেশী হয়। যদিচ বীট ইংরাজি কথা কথাটী সহজ বলিয়া এবার পর্য্যন্ত ধক্‌ধকানী না বলিয়া বীট বা তরঙ্গই বলা যাইবে। শরীরের স্বাভাবিক উত্তাপ ৯৮'৪ অর্থাৎ একপ্রকার ৯৮৷৷০ অতএব উত্তাপ ৯৯৷৷০ হইলে নাড়ীর বীট ৮২ হওয়া উচিত। কারণ সুস্থ শরীরের নাড়ী ৭২, তাহার উপর ১০ বাড়িলেই ৮২ হইল। সেইরূপ ১০০'৪ হইলে নাড়ীর গতি ৯২ হইবে। এই হিসাবে ১০২ ডিগ্রি হইলে প্রতি মিনিটে ১০৫ বার নাড়ীর গতি হইবে। ১০৩ ডিগ্রিতে ১১০ বার, ১০৪ ডিগ্রিতে ১২০, আর ১০৫ ডিক্রিতে ১৪০ বার নাড়ী পড়িবে। হিসাবমত অঙ্ক হিসাবে উত্তাপ ১০৫ ডিগ্রি হইলে নাড়ী ১৪০ বার হওয়া উচিত বটে, কিন্তু বস্তুত তাহা কদাচিত হয়। মোট কথা ১০২৷৩ পর্য্যন্ত শরীরের উত্তাপের সহিত নাড়ীর বীটের ঐ রকম ১ ডিগ্রিতে নাড়ীর ১০ বার বীট বাড়িতে পারে বটে, কিন্তু উত্তাপ ১০৪, ১০৫, ১০৬ কি ১০৭ হইলে নাড়ীর বীট এক ডিগ্রিতে দশবার করিয়া প্রকৃত প্রস্তাবে বাড়ে না। ম্যালেরিয়া জ্বরে সাধারণতঃ জ্বরের সময় শরীরের উত্তাপ অতিশয় বেশী হয়, কিন্তু সেই পরিমাণে কি নাড়ীর চাঞ্চল্য দেখা যায়? ম্যালেরিয়া জ্বরে কখন কখন ১০৭ পর্য্যন্ত টেম্পারেচার দেখা যায়। ঐরূপ হিসাবমতে ১০৭ টেম্পারেচারে নাড়ীর বীট ১৬০

হওয়া উচিত। তা কি বাস্তবিক হয়? আর ১৬০ বার যে রোগীর নাড়ীর বীট, সে কি আর বাঁচে? অতএব ম্যালেরিয়া জ্বরে টেম্পারেচার যত বেশী হয়, নাড়ীর বীট বাস্তবিক তত বেশী হয় না।

সুস্থশরীরে প্রমাণবয়স্ক ব্যক্তিদিগের শরীরের উত্তাপ যেমন ৯৮'৪, নাড়ীর বীট এক মিনিটে ৭২, নিশ্বাস সাধারণতঃ এক মিনিটে ১৪—১৮ বার পড়িয়া থাকে। ছেলেদের নিশ্বাস কিছু বেশী পড়ে। সুস্থ শরীরে প্রমাণ বয়স্ক ব্যক্তিদের একবার, নিশ্বাস পড়িলে নাড়ীর বীট ৪ বার হয়। কোন অবস্থায় ৫ বার। গায়ের উত্তাপ যেরূপ সুস্থশরীর অপেক্ষা বেশী হইলেও দোষের কথা, কম হইলেও দোষের কথা, নাড়ীর বীট ও নিশ্বাসের গতি স্বাভাবিক অবস্থা হইতে এক মিনিটে বেশী হইলেও পীড়ার চিহ্ন, কম হইলেও শরীরের বিকৃত অবস্থা বুঝায়। নাড়ীর সহিত নিশ্বাসের গূঢ় সম্বন্ধ আছে বলিয়া এস্থলে নিশ্বাসের কথা সংক্ষেপে একটু বলা গেল। এখন নাড়ীর কথা যে বলিতেছিলাম, সেই সম্বন্ধেই আর একটু বেশী করিয়া বলি।

নাড়ীর বীট বেশী হইলে সেটা দুর্ব্বল নাড়ীর চিহ্ন। অতএব নাড়ীর গতি মিনিটে ১২০ বার হওয়া একটু ভাবনার কথা। ১৩০।৪০ হইলে আরও বেশী ভয়ানক অবস্থা। নাড়ীর বীট ১৬০ হইলে রোগীর আসন্ন মৃত্যু মনে করিতে হইবে। যে কোন রোগে বা যে কোন অবস্থাতেই হউক না কেন, যে রোগীর নাড়ীর বীট মিনিটে ১৬০ বার হয়, সে রোগীর মানবলীলার একপ্রকার শেষ হইয়াছে। তবে রোগীর বাতরোগ জন্য নাড়ীর বীট এত অধিক হইলে কোন কোন সময় একটু ভরসা থাকে। তবে বাতরোগ জন্য প্রদাহিক জ্বরে রোগীর ১২০ নাড়ী যথেষ্ট

ভয়ের কথা। ১২০র অধিক হইলে তাহার ত কথাই নাই। কথন কথন হৃদ্‌পিণ্ডে প্রদাহ বা অন্যান্য রোগ জন্য নাড়ীর বীট বেশী হয়। সাধারণতঃ এরূপ বেশী হওয়া অধিক ভয়ের কথা নয়। এরূপ অবস্থায় জ্বরের উত্তাপ বেশী থাকে না, হয় ত ১০১ কি ঊর্দ্ধ সংখ্যায় ১০২ পর্য্যন্ত জ্বর থাকে, আর পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বাত রোগ জন্য জ্বর যদি অধিক থাকে, আর গায়ের উত্তাপ ১০৪ কি ১০৫ হয় ও নাড়ীর বীট মিনিটে ১২০, ১৩০ বা ১৪০ এরূপ অবস্থা যথেষ্ঠ ভয়ের কথা। বেশী দিনের পুরাতন রোগে চঞ্চল দুর্ব্বল নাড়ী স্বভাবতঃই ভয়াবহ। এরূপ অবস্থায় নাড়ী প্রায় নেকড়ার মতন নরম ও Compressible অর্থাৎ চাপিলে নাড়ীর তরঙ্গ যেন একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। দুর্ব্বল অবস্থায় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যেমন শিথিল হইয়া যায়, দুর্ব্বল অবস্থার নাড়ীরও সবল অবস্থার মতন আঁট থাকে না। মানুষের যত বয়স বেশী হয়, শরীরের চর্ম্ম ক্রমে তত লোল হইয়া পড়ে। অর্থাৎ যৌবনাবস্থা শরীরের সবল অবস্থা, বার্দ্ধক্যে শরীরের বলহানি জন্য লোলিত চর্ম্ম হয়। সেইরূপ আমাদের ধমনী সকলও শরীরের পীড়িত নিস্তেজ অবস্থায় লোলিত হইয়া পড়ে। অর্থাৎ তাহাদের স্বাভাবিক স্থিতিস্থাপক শক্তির স্বল্পতা জন্মে। আর স্থিতিস্থাপক শক্তির স্বল্পতা বা ঐ শক্তির একেবারে অভাব হইলেই রক্তের চলাচল কার্য্যের বিঘ্ন হয়। কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ধমনীর স্থিতি-স্থাপক শক্তি রক্তের চলাচলের একটী প্রধান কারণ। অতএব স্থিতিস্থাপকশূন্য ধমনী নেকড়ার মত নরম হইয়া পড়ে। সুতরাং নেকড়ার মত নরম নাড়ী যে এত ভয়ের কথা তাহার অর্থ এই যে, অধিক দিন পীড়া জন্য শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এক রকম

ভিতরে ভিতরে শিথিল ও লোলিত হইয়া পড়িয়াছে। শরীরের ভিতরের জিনিষ সকল যে এক রকম আধমরা তাহা নাড়ীর অবস্থাতেই বিশেষ প্রকাশ, অতএব আধমরা, মানুষের বাঁচিবার আশা যেমন অতিশয় কম, ঐরূপ নেকড়ার মতন নরম যে রোগীর নাড়ী, তাহারও বাঁচিবার আশা তত কম।

সূক্ষ্ম সূতার মতন নাড়ীও অনেকটা ভয়ের কথা, তবে শরীরে রক্ত বা বল থাকিতে থাকিতে নাড়ীর ওরূপ অবস্থা হইলে তত ভয়েব কথা নয়। যেমন ওলাউঠা বোগী তিন দিন চারি দিন নাড়ী ছাড়িয়া থাকিবার পরও বাঁচে। আর সূতার সঞ্চারের মতন নাড়ীও হয়ত ওলাউঠা রোগীর তত ভয়ের কথা নয়, তাহার কারণ এই যে, শরীরে তখন পর্য্যন্ত রক্ত এক রকম সমুচিত পরিমাণ আছে। রোগীও দীর্ঘকাল রোগে ভুগিয়া তখনও তত দুর্ব্বল হয় নাই। কিন্তু মেঘে যেমন সূর্য্যকে ঢাকিয়া অন্ধকার করে, সেইরূপ রোগের বিষে হৃদ্‌পিণ্ডকে আচ্ছন্ন করিয়া তৎকালীন নিস্তেজ করিয়া রাখিয়াছে। আর ঐ রোগের বিষের স্বল্পতা হইলেই হৃদ্‌পিণ্ড স্বাভাবিক মত আপন কার্য্য আরম্ভ করে, আর রোগীও একটু সুস্থ হয়। সুতরাং এরূপ পীড়ায় হৃদ্‌পিণ্ডের নিস্তেজ অবস্থা ক্ষণিক। কিন্তু বহুদিনের পুরাতন বোগে হৃদ্‌পিণ্ডের নিস্তেজ অবস্থা স্থায়ী। অতএব বহুকালের পুরাতন রোগীর সূতার মত নাড়ী তরুণ রোগীর ঐরূপ নাড়ী অপেক্ষা অধিক সাংঘাতিক। আমি যখন প্রথম চিকিৎসা করিতে আরম্ভ করি, একদিন একটী রোগীকে দেখিতে গিয়াছিলাম, তাহার একটু সামান্য জ্বর। তাপমান যন্ত্রটী ৫ মিনিট কাল রাখিয়া দেখিলাম শরীরের উত্তাপ ১০২। শুনিলাম বৈকালে কিছু জ্বর বেশী হয়।

তাহার পর বৈকালেও তাহাকে দেখিয়াছিলাম। আর ঐরূপ তাপমান যন্ত্র রাখিয়া দেখিলাম, বৈকালে শরীরের উত্তাপ ১০৩ হয়। রোগী বেশ স্বচ্ছন্দ শরীরে বসিয়া আছে, কথা বা স্বরের বৈলক্ষণ্য কিছুই নাই, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ঐরূপ বসিয়া আপনার রোগের অবস্থা সমস্ত নিজেই বলিল ও তাহা ভিন্ন আর আর অন্যান্য বিষয়েরও অনেক কথা আমার সহিত আলাপ করিল। জীব পরিষ্কার সরস, তবে একটু যেন ছাতলা পড়া ছাতলা পড়া, আহারে বিলক্ষণ রুচি আছে, পরিপাকশক্তিরও বিশেষ বৈলক্ষণ্য কিছুই নাই, যা আহার করে, বিলক্ষণ হজম করিতে পারে। রোগীটী মুসলমান, মুর্গীর যুষ, রুটী, বেগর মসলার কোর্ম্মা ইত্যাদি বেশ রুচিপূর্ব্বক আহার করে। রাত্রে বিলক্ষণ নিদ্রা হয়, মাথার কোন রকম কষ্ট বা মস্তিষ্কের কোন বৈলক্ষণ্য কিছুই নাই। বাস্তবিক রোগীকে দেখিয়া বেশী কিছু ব্যারাম আছে বলিয়া বোধ হয় না। নাড়ীর অবস্থা পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম। নাড়ীর বীট এক মিনিটে ১৩০। নাড়ী সূক্ষ্ম দ্রুতগামী ও চাপিলে যেন আর থাকে না, যাহাকে ইংরাজিতে Compressible Pulse বলে। রোগীটী দেখিয়া ঔষধ পত্র দিয়া আসিলাম আর মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, পুস্তকে যেরূপ পড়িয়াছি, নাড়ীর অবস্থা একটু খারাপ বটে, কিন্তু রোগী আর সর্ব্ব রকমেই ভাল। বিশেষ পীড়িত বলিয়া বোধ হইল না। রোগী ও রোগীর আত্মীয়-দিগকে অনেকটা ভরসা দিয়া আসিলাম, আর নিজেও মনে মনে করিলাম যে, হউক না কেন নাড়ীর অবস্থা এইরূপ, তাই বলিয়া কি এ রকম সুস্থ রোগী একেবারে হঠাৎ মরিয়া যাইবে? কিন্তু পৃথিবীর কোন শাস্ত্রেই ভুল নাই। গুরুজনের উপদেশের ভ্রান্তি

নাই, দুই তিন দিন পরে এক দিন হঠাৎ যাইয়া দেখি যে, রোগীর অবস্থা হঠাৎ পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতেছে, হাত পা ঠাণ্ডা, নাড়ী ক্রমেই ডুবিয়া আসিতেছে, বাস্তবিক তিন চারি ঘণ্টার মধ্যেই ঐ রোগীর প্রাণ শেষ হইল। মনে মনে করি তাই ত, ঐরূপ নাড়ী যে বিশেষ ভয়ের কথা পুস্তকে পড়িয়াছি, এখন তাহা ত চক্ষের সম্মুখে হাতে হাতে ফলিল। অকপটে স্বীকার করিলে আমার মতন অনেক নূতন চিকিৎসকের এ রকম হইয়াছে।

নরম নাড়ী ধমনীর দুর্ব্বল অবস্থা হইলে হইয়া থাকে, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ধমনী দুর্ব্বল হইয়া লোলিত হইয়া পড়িলে তাহার ভিতরের আয়তন পরিসরে বড় হয় বটে, কিন্তু তাহার ভিতরে রক্তের ধার অতি সূক্ষ্মভাবে আসে বলিয়া ধমনীর ভিতরের পরিসর বড় হইলেও নাড়ী হাতে বড় লাগে না। কারণ রক্ত নিজেই সূক্ষ্মধারে আইসে। অতএব রক্তের ধার যেরূপ সূক্ষ্ম, নাড়ীও সেইরূপ সূক্ষ্ম। মাংস লোলিত হইলে কোন দ্রব্যের আঁট থাকে না। অতএব নাড়ী আঁট না থাকিলে তাহার ভিতরের ছিদ্র যে পরিসরে বড় হইবে, তাহা সহজেই বুঝা যায়। ধমনীর প্রাচীর পাতলা হইয়া যায় অর্থাৎ ধমনীর প্রাচীর স্বভাবতঃ যেরূপ দলে পুরু, দুর্ব্বল হইলে ঐ প্রাচীর সেরূপ পুরু থাকে না। আর ধমনীর প্রাচীরের দল পাতলা হইলে কাজে কাজেই তাহার ভিতরের ছিদ্র পরিসরে বড় হইবে ও বড় হইবার সঙ্গে সঙ্গে নরম হইবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ধমনীর ভিতরের পরিসর বড় হয় বটে, কিন্তু হৃদ্‌পিণ্ডের দুর্ব্বলতা জন্য রক্ত অতিশয় সরু ধারে তাহার ভিতরে চলাচল

করে। আর রক্তের ধার অনুযায়ী নাড়ীর অবস্থা। সুতরাং নাড়ী নরম ও সূক্ষ্ম দেখা যায়। যাহা বলিলাম তাহাতে সহজেই বুঝা যায় যে, নরম নাড়ীতে রক্তের ধার সরু বলিয়া নাড়ীর অবস্থা সরু ও সূক্ষ্ম। কিন্তু কোন গতিকে নরম নাড়ীর অবস্থায় যদি হৃদ্‌পিণ্ড স্বাভাবিক মত সবল কি তদপেক্ষা সবল থাকে, তাহা হইলে নাড়ী স্বাভাবিক অবস্থা হইতে বেশী মোটা অনুভব করা যাইবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, নাড়ী নরম হইলে নাড়ীর ভিতরের পরিসর অধিক হয়। আর সেই অধিক পরিসরের নাড়ীর ভিতর যদি সম্পূর্ণরূপে রক্ত ভরা হয়, তাহা হইলে ঐ নাড়ী স্বাভাবিক মত আঁটা সাঁটা নাড়ী অপেক্ষা অধিক স্থূল অর্থাৎ মোটা হইবে। আর নাড়ীর বলও একটু বেশী বলিয়া মনে হইবে। হৃদ্‌পিণ্ড দুর্ব্বল হইলে কার্য্যের জড়তা জন্মানই স্বভাব, কিন্তু কখন কখন দুর্ব্বলতা জন্য কার্য্যের আধিক্যও হয়। মানুষ বৃদ্ধ হইলে অনিচ্ছায় হাত পা সদাই কাঁপে, তাহার কারণ এই যে, মনুষ্য বৃদ্ধ হইলে হাত পায়ে যুবাকালের ন্যায় বল থাকে না। আর বার্দ্ধক্যের দুর্ব্বলতা জন্যই হাত কি পা সদাই নড়ে, অর্থাৎ তাহার কার্য্যের আধিক্য হয়। বলিতে ছিলাম যে, দুর্ব্বল অবস্থায় স্বভাবতঃ সে ইন্দ্রিয়ের কার্য্যের শিথিলতা বা জড়তা জন্মে, কিন্তু কখন কখন সেই ইন্দ্রিয়ের ক্ষণিক চাঞ্চল্য জন্মিয়া থাকে। অতএব হৃদ্‌পিণ্ডের চাঞ্চল্যের কার্য্য এই যে, হৃদ্‌পিণ্ড অধিক পরিমাণে রক্ত সঞ্চালন করিতে থাকে। অতএব শরীরের অবস্থা যাহার পর নাই ক্ষীণ, কিন্তু নাড়ী অতিশয় বলবতী ও স্থূল। এই রকম নাড়ীকেই কবিরাজেরা "ক্ষীণে বলবতী নাড়ী, সা নাড়ী

প্রাণঘাতিকা” বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইংরাজীতে ইহাকে Soft, compressible, bounding pulse বলে। যা নাড়ী প্রাণঘাতিকা, তাহা হওয়াই সম্ভব। কারণ এ অবস্থায় প্রধান দোষ এই যে, হৃদ্‌পিণ্ডে যে কিছু অবশিষ্ট শক্তি থাকে, তাহা ঐরূপ অধিক পরিমাণে কার্য্য করিবার জন্য অতি অল্প সময়েই ফুরাইয়া যায়। উক্ত অবস্থায় যে হৃদ্‌পিণ্ড দুর্ব্বল তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। তবে সেই বল টুকু রহিয়া বসিয়া খরচ করিলে হয় ত ১০।১৫ দিন থাকিত অর্থাৎ রোগী ১০।১৫ দিন বাঁচিত, কিন্তু ঐরূপে অধিক পরিমাণে খরচ করিলে দুই দিনেই সেই বলের ক্ষয় হইবে। সেই জন্যই ক্ষীণে বলবতী নাড়ী। খুব ধপ্ ধপ্ করিয়া চলিতেছে, আর হয় ত আধ ঘণ্টার মধ্যেই হঠাৎ সে নাড়ীর আর চিহ্নমাত্র রহিল না। রোগী যায় যায় বলিতে বলিতে দেখিতে দেখিতে একেবারে অনন্ত নিদ্রায় নিদ্রিত হয়।

রোগীর অধিক ঘর্ম্ম হইলে নাড়ীর অবস্থা ঐরূপ নরম হইয়া যায়। এমন কি সহজ শরীরে অধিক ঘর্ম্ম হইলেও নাড়ীর অবস্থা তৎকালীন নরম হইবেই হইবে। অধিক ঘর্ম্ম হইয়া যে জ্বর ত্যাগ হয়, তাহাতেও নাড়ীর অবস্থা একটু নরম হয়। তবে সে নরম অবস্থা অধিকক্ষণ থাকে না, রোগীর ঘর্ম্ম বন্ধ হইলেই নাড়ী পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থা ধারণ করে। তবে ক্রমেই যদি বেশী ঘর্ম্ম হইতে আরম্ভ হয়, নাড়ীও ক্রমেই ডুবিতে থাকে, আর তাহার পর কোলাপ্স হয়। ম্যালেরিয়া জ্বরে যে কোলাপ্সের কথা বলিয়াছি, তাহা এইরূপেই হইয়া থাকে। অতএব ম্যালেরিয়া জ্বরে অধিক ঘর্ম্ম হইতে আরম্ভ

হাত পা ইত্যাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গে যেরূপ বল বাড়ে, ধমনীর মাংসপেশীও সেইরূপ বলবতী হয়। আবার যে কারণে হাত পা ও অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মাংসপেশী দুর্ব্বল ও লোল হয়, অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মাংসপেশীর সঙ্গে সঙ্গে ধমনীর মাংসপেশীও দুর্ব্বল ও লোল হইয়া পড়া স্বাভাবিক। ধমনী দিয়া রক্তের চলাচল হয়। আর ঐ ধমনী স্বাভাবিক মত আঁটাসাঁটা থাকিলে যেরূপ ভাবে রক্তের চলাচল হয়, উক্ত ধমনী সকল নিস্তেজ ও লোল হইয়া পড়িলে রক্তের চলাচলের গতির অবশ্য বিকৃতি বা পরিবর্ত্তন হইবে। অর্থাৎ রীতিমত আঁটাসাঁটা ধমনীর ভিতর দিয়া যেরূপে রক্ত সঞ্চালিত হয়, লোলিত, কোমল ধমনী দিয়া সেরূপ ভাবে কখন রক্ত চলাচল হইতে পারে না। এখন ধমনীর পরিবর্ত্তনে যে নাড়ীর বিকৃতি হয়, তাহার বিষয় বলিলাম। কিন্তু ইহা ভিন্ন রক্তের গতির পরিবর্ত্তনে নাড়ীর বিকৃতি হইতে পারে, অর্থাৎ ধমনী স্বাভাবিক মত আছে, কিন্তু রক্ত হয় ত তত জোরে তাহার ভিতর দিয়া চলে না, গতিতে তত জোর নাই, রক্তের ধারও হয়ত সরু, ইত্যাদি রক্তের গতির বৈলক্ষণ্য নানা রকম হইতে পারে, যেমন দুর্ব্বল অবস্থায় বা কোলাপ্সে মণিবন্ধে নাড়ী পাওয়া যায় না, ইহা একটী গতির বিকৃতি; অর্থাৎ হৃদ্‌পিণ্ডে তত শক্তি নাই যে, মণিবন্ধ পর্য্যন্ত রক্তের ধার পৌছায়, আর সেই জন্যই মণিবন্ধে নাড়ী পাওয়া যায় না। রক্তের গতির বিকৃতি আরও অনেক আছে, নীচে তাহা বলিব।

১ম। নাড়ীর দ্রুতগতি ;—জ্বরে, দৌর্ব্বল্যে, মন বা শরীরের উত্তেজিত অবস্থায়, Hysteria হিষ্টিরিয়া অর্থাৎ মূর্চ্ছা রোগে, হৃদ্-

পিত্তের পীড়ায়, নাড়ীর চাঞ্চল্য হইয়া থাকে। শরীরের বা মনের উত্তেজিত অবস্থায়, নাড়ীর চাঞ্চল্য কেবল স্বল্পকাল স্থায়ী। শরীর বা মন সুস্থির হইলেই নাড়ীও স্বাভাবিক মত সুস্থির হয়। হিষ্টিরিয়া রোগে: ফিট্ না থাকিলেও স্বভাবতঃ নাড়ী চঞ্চল থাকে। হিষ্টিরিয়া রোগগ্রস্ত স্ত্রীলোকের মিনিটে ১৫০, ১৬০ বার নাড়ীর বীট হইয়া থাকে। হিষ্টিরিয়া রোগগ্রস্ত নাড়ীর স্বাভাবিক এইরূপ অবস্থা বটে, কিন্তু হিষ্টিরিয়া রোগের আর একটী চমৎকারিত্ব আছে। অন্য কোন সাংঘাতিক রোগের সহিত হিষ্টিরিয়া থাকে না। অর্থাৎ পূর্ব্বে যে স্ত্রীলোকের হিষ্টিরিয়া ছিল, জ্বর বিকারে তাহার নাড়ী যদি ১৫০, ১৬০ হয়, ঐ ১৫০, ১৬০ নাড়ী হিষ্টিরিয়া জন্য হইয়াছে বলিয়া মনে করা বিশেষ ভ্রম। কারণ অন্যান্য সাংঘাতিক পীড়ার সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া হিষ্টিরিয়া রোগ থাকে না ও থাকিতে পারে না। অতএব ঐ স্ত্রীলোকের পূর্ব্বে হিষ্টিরিয়া ছিল বলিয়া তাহার জ্বর বিকারের ১৬০ নাড়ী হিষ্টিরিয়া জন্য হইয়াছে ও ওরূপ নাড়ী তত ভয়ের কারণ না বলিয়া আশ্বস্থ হওয়া ভুল। ১৬০ নাড়ী আসন্ন মৃত্যুর চিহ্ন পূর্ব্বে বলিয়াছি। ইহা অন্যান্য ব্যক্তির যেরূপ ভয়ের কথা, হিষ্টিরিয়া রোগগ্রস্ত স্ত্রীলোকেরও সেইরূপ। কারণ ইতিপূর্ব্বেই বলিলাম যে, অন্যান্য সাংঘাতিক রোগের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া হিষ্টিরিয়া কখন থাকে না। অতএব যে স্ত্রীলোকের পূর্ব্বে হিষ্টিরিয়া ছিল, কিন্তু এখন জ্বর বিকারে পীড়িত, তাহাকে কেবল সেই জ্বর বিকারে পীড়িতই মনে করিতে হইবে। অতএব জ্বর বিকারে যেমন ১৬০ নাড়ী আসন্ন মৃত্যুর চিহ্ন, যে স্ত্রীলোকের পূর্ব্বে হিষ্টিরিয়া ছিল, তাহার পক্ষেও বিকারের

১৬০ নাড়ী আসন্ন মৃত্যুর চিহ্ন। সংক্ষেপে অন্য রোগ না থাকিলে হিষ্টিরিয়া রোগীর ১৬০ নাড়ী কিছুই ভয়ের কথা নয় বটে, কারণ হিষ্টিরিয়া রোগে সাধারণতঃ নাড়ী এরূপ চঞ্চল হইয়াই থাকে। কিন্তু হিষ্টিরিয়া না থাকিলে ১৫০, ১৬০ নাড়ী ভয়ের কথা। অতএব হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত রোগীর জ্বর বিকারে বা অন্যান্য রোগে ১৬০ নাড়ী হইলে ঐ পীড়া জন্যই নাড়ীর ঐরূপ অবস্থা হইয়াছে মনে করিতে হইবে। কারণ হিষ্টিরিয়া অন্য কোন সাংঘাতিক রোগের সহিত জড়িত হইয়া কখন থাকে না।

জ্বরে যত শরীরের উত্তাপ বেশী, তত নাড়ীব চাঞ্চল্য বেশী পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তবে হাম ইত্যাদি চর্ম্মরোগ হইবার পূর্ব্বে যে জ্বর হয়, এরূপ চর্ম্মরোগের জ্বরে শরীরের উত্তাপ হইতে নাড়ীর চাঞ্চল্য অধিক। শিশু সন্তানদিগের নাড়ী স্বভাবতঃই চঞ্চল, অতএব শিশুদিগের জ্বর রোগে শরীরের উত্তাপ হইতে নাড়ীর চাঞ্চল্য অধিক হইয়া থাকে। যে সকল অবস্থার কথা বলিলাম, তাহা ছাড়া গায়ের উত্তাপ অধিক না হইয়া নাড়ীর চাঞ্চল্য বেশী হইলে হৃদ্‌পিণ্ডের পীড়া বা বিকৃতি বুঝায়। ইহার বিষয় হৃদ্‌পিণ্ডের রোগ বলিবার সময় ভাল করিয়া বলিব। জ্বরে বা অন্যান্য রোগে এক মিনিটে নাড়ী ১২০ হইতে অধিক চলিলে সে ভয়ের কথা, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

এইরূপ নাড়ীর চাঞ্চল্য ভিন্ন আর দুই রকম নাড়ীর বিকৃতি আছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, নাড়ী ধক্ ধক্ করিয়া যে হাতের নীচে লাফাইয়া উঠে, তাহাকে ইংরাজিতে Wave ওয়েভ, বাঙ্গালাতে নাড়ীর তরঙ্গ বলে। নাড়ীর তরঙ্গে গোলমাল হইতে পারে। যেমন রীতিমত ধুক্‌ধুক্ করিয়া নাড়ী বহিতেছে, এমন সময়

হয় ত দুই চারি বার ধুক্ ধুক্ করিল না, তাহার পরে আবার রীতিমত ধুক্ ধুক্ আরম্ভ হইল, অর্থাৎ ধুক্ ধুক্ করিতে করিতে মধ্যে মধ্যে যে থামিয়া যায়, সেই নাড়ীকে ইংরাজিতে Intermittent pulse ইণ্টার্মিটেণ্ট পল্‌স্ বলে। ইণ্টার্মিটেণ্ট পল্‌স্ সকল প্রকার নাড়ী অপেক্ষা খারাপ। বরং এক মিনিটে ১৬০ এর রোগী বাঁচে, কিন্তু ইণ্টার্মিটেণ্ট পল্‌সের রোগী বুঝি হাজারেও একটা বাঁচে না। তাহার কারণ সহজেই বুঝিতে পারা যায়। মানুষ যেমন অতিশয় দুর্ব্বল হইলে চলিতে চলিতে আর চলিতে পারে না, বসিয়া পড়ে, বা দাঁড়াইয়া থাকে। ইণ্টার্মিটেণ্ট পল্‌সে হৃদপিণ্ড যাহার পর নাই দুর্ব্বল। এত দুর্ব্বল যে, চলিতে চলিতে আটকাইয়া যায়, যেন চলিতে পারে না। আর তাহার পরে হয়ত এমত আটকায় যে, যেই আট-কানতেই শেষ। তবে কখন কখন হৃদ্‌পিণ্ডের পীড়ার জন্য এরূপ অবস্থা হইয়া থাকে। তাহা সাধারণতঃ তত ভয়ের কথা নয়।

এইরূপ ইণ্টার্মিটেণ্ট পল্‌স্ ভিন্ন নাড়ীর তরঙ্গের কখন কখন এলোমেলো ভাব হয়। তাহাকে ইংরাজিতে Irregular pulse ইরেগুলার পল্‌স্ বলে। আমরা বাঙ্গালাতে বিশৃঙ্খল নাড়ী বলিব। সাধারণতঃ মনে হইতে পারে যে, ইণ্টার্মিটেণ্ট নাড়ী সেই বিশৃঙ্খল নাড়ী, কিন্তু তাহা নয়। যেমন কোন রোগীর হয়ত শরীরের উত্তাপ ১০৪।১০৫, কিন্তু নাড়ী ৭২।৭৫, এই বিশৃঙ্খল নাড়ী কিন্তু ইণ্টার্মিটেণ্ট পল্‌স্ নয়। সেইরূপ ইণ্টার্মিটেণ্ট পল্‌স্ হইলে বিশৃঙ্খল না হইতে পারে। যেমন তরঙ্গ মধ্যে মধ্যে আটকাইয়া যায় বটে, কিন্তু যতগুলি

তরঙ্গ আইসে, তাহার ভাব গতিক সকলেরই সমান। অতএব এ নাড়ীতে শৃঙ্খলা আছে, কিন্তু আটকাইয়া যায় বলিয়া ইণ্টার্মিটেণ্ট পল্‌স্ বলা গেল। অতএব নাড়ী ইণ্টার্মিটেণ্ট হইলেই বিশৃঙ্খল হইবে ও বিশৃঙ্খল হইলে ইণ্টার্মিটেণ্ট হইবে তাহার কোন কারণ নাই।

পূর্ব্বে যেরূপ নাড়ীর বিশৃঙ্খলতার কথা বলিলাম, তাহা ভিন্ন অন্য রকম বিশৃঙ্খলা আছে। যেমন তরঙ্গ ছোট বড় হওয়া, তরঙ্গ আসিতে আসিতে মধ্যে মধ্যে আইসে না, তাহা নয়, কিন্তু তরঙ্গের ছোট বড় হওয়া আরও ভয়ের কথা। ইণ্টার্মিটেণ্ট পল্‌স্ অপেক্ষা ভয়ের কথা, কারণ ইহাতে হৃদ্‌পিণ্ডের বিশেষ বিকৃতি বুঝায়।

নাড়ী হয়ত ২।৪ মিনিট খুব সবল স্থূল, আবার হয়ত তাহার পরক্ষণেই যাহার পর নাই সূক্ষ্ম, এ নাড়ীর একটী বিশৃঙ্খল অবস্থা এবং ইহাও ভয়ের কথা। রোগীর ক্ষীণ অবস্থায় যে নাড়ী বলবতী পূর্ব্বে বলিয়াছি, হিসাব মত তাহা একটী নাড়ীর বিশৃঙ্খল অবস্থা।

নাড়ীর তরঙ্গ হিসাবে নাড়ীর আর এক রকম বিকৃতি আছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ধক্ ধক্ করিয়া যে নাড়ী ধমনীর উপর অঙ্গুলী রাখিলে অঙ্গুলীতে আসিয়া লাগে, এই এক একটী ধক্ ধক্ যেন তরঙ্গের ন্যায়। কখন কখন নাড়ীর খারাপ অবস্থা হইলে নাড়ীর একটী প্রকৃত তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে আর একটী যেন অপ্রকৃত তরঙ্গ আসিয়া উপস্থিত হয়। অর্থাৎ একটী প্রকৃত বড় তরঙ্গের পরই যেন আর একটী ছোট তরঙ্গ অঙ্গুলিতে আসিয়া লাগে। এইরূপ নাড়ীকে ইংরাজিতে Dicrotous (ডাই-

ক্রোট্‌স্) পল্‌স্ বলে। ডাইক্রোট্‌স্ নাড়ী টাইফয়েড ফিভার্, অর্থাৎ যাহাকে এণ্টিরিক ফিভার বলে, তাহাতেই হইয়া থাকে। এণ্টিরিক জ্বরের কথা পরে ভাল করিয়া বলিব। ডাইক্রোট্‌স্ নাড়ী নরম ও চাপিলে যেন আর নাড়ী চলে না, যাহাকে ইংরাজিতে Compressible কম্প্রেসিবল্ নাড়ী চলে।

নাড়ী সম্বন্ধে এত লিখিলাম বটে, কিন্তু নিজে নাড়ী পরীক্ষা করিয়া নাড়ীর নানা রকম গতি ও প্রকৃতি পরীক্ষা করিয়া না দেখিলে কেবল পুস্তক পাঠ করিয়া নাড়ী সম্বন্ধে কিছুই জ্ঞান লাভ করা যায় না। তবে সকল বিষয়ে গুরুর উপদেশ আবশ্যক। শিক্ষা করিবার আবশ্যক আছে। কিন্তু কি শিক্ষা করিতে হইবে? কিরূপে শিক্ষা করিতে হইবে? ইহা সর্ব্বাগ্রেই জানিতে হইবে। আর সেই জন্যই নাড়ী সম্বন্ধে এত কথা বলিলাম। তবে কথা এই যে, নাড়ীর বিষয় সাধ্যমত এত পরিষ্কার করিয়া লেখা গেল যে, নিজে একটু বুদ্ধি খরচ করিয়া দেখিলেই নাড়ী পরীক্ষা করিতে আর কোন উপদেষ্টারই আবশ্যক হইবে না। নাড়ী পরীক্ষা করা অতিশয় কঠিন বটে, কিন্তু যেমন সহজ করিয়া লেখা গিয়াছে, এই পুস্তক পড়িয়া নাড়ী পরীক্ষা করা বোধ হয় স্ত্রীলোকদিগের পক্ষেও কঠিন হইবে না। যাহা লেখা গিয়াছে, তাহার ভিতরে অনাবশ্যক কথা একটী বর্ণও নাই। মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিয়া নাড়ী ধরিয়া দেখিলেই সকল বিষয় প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হইবে।

ওলাউঠার চিকিৎসা।

আজ কাল ওলাউঠার আরম্ভে কোন না কোন রকমে ক্যাম্ফর (কর্পূর) দেওয়া এক রকম খুব প্রচলিত হইয়াছে।

১৮৬৬ সালে যখন বেরেণী কোম্পানীর ডিস্‌পেন্সারী প্রথম লালবাজারে খোলা হল, তখন বারাসত নিবাসী ৺বৃন্দাবন চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ঐ ডিস্‌পেন্সারির ম্যানেজার হন। বৃন্দাবন বাবু কারবার চালান সম্বন্ধে একটী বিশেষ বিচক্ষণ লোক ছিলেন। ডাক্তার রুবিণীর Saturated spirit camphor স্যাচুরেটেড স্পিরিট ক্যাম্ফর কিরূপে এদেশে এত প্রচলিত হইল, তাহা বলিতে গেলে নিজের একটু যেন অহঙ্কার করা হয়। পাঠকেরা সে বিষয় আমাকে ক্ষমা করিবেন। কারণ এতে হিসাব মত অহঙ্কারের কথা কিছুই নাই। আর সত্যের অনুরোধে সকলই বলিতে হয়। যাহা হউক, বলিতেছিলাম বেরিণী সাহেবের ডিস্‌পেন্সারী যখন খোলা হয়, তখন আমি কলিকাতার বহুবাজার নিবাসী পুণ্যশ্লোক ৺রাজেন্দ্র দত্তের নিকট থাকিতাম। তখন তাঁহার আমি হেড এসিষ্ট্যাণ্ট, ডান হাত বলিলে হয়। ভারতবর্ষে হোমিওপ্যাথি এত প্রচলিত করিবার বহুবাজার নিবাসী স্বর্গীয় মহাত্মা রাজেন্দ্র দত্তই তাহার মূল। দুষ্টমতি লোকেরা যে যতই বলুক, আমার বিশ্বাস, রাজেন্দ্র বাবু না হইলে ভারতবর্ষে হোমিওপ্যাথি কখনই এত প্রচলিত হইত না। আর এই হোমিওপ্যাথি প্রচার করার জন্যে তিনি বিস্তর পয়সাও খরচ করিয়াছিলেন।

এমন যে সমস্ত ভারতবর্ষের গৌরব ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, তিনিও এলোপ্যাথি পরিত্যাগ করিয়া হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় এমন শিরোভূষণ হইয়াছেন, তাহাও উক্ত রাজেন্দ্র বাবুর বিশেষ প্রযত্নে। যাহা হউক, রাজেন্দ্রবাবুর বিস্তর হোমিওপ্যাথিক পুস্তক ছিল, আর নানা রকম হোমিও-প্যাথিক বিলাতি ও আমেরিকান্ জর্ণ্যাল তিনি লইতেন। আমি এ সকল জর্ণ্যাল পড়িতাম। সেই সময় অর্থাৎ বোধ হয় ঠিক ১৮৬৭ সালে, নেপেল্‌সের ডাক্তার রুবিণী সাহেবের Saturated spirit of camphor দিয়া কলেরাব চিকিৎসার বিষয় জর্ণেলে প্রথম বাহির হইল। রাজেন্দ্র বাবুও পড়িলেন, আমিও পড়িলাম। আর আমিই প্রথম ঐ বৃত্তান্তটী বৃন্দাবন বাবুকে দেখাইয়া বলি যে, এই রকম একটা প্রিপরেশন করিয়া আপনারা যদি ডিস্পেন্সারিতে রাখেন, তাহা হইলে আমি দেখিতে পারি। Saturated spirit camphorএ ঐ রকম কাজ হয় কি না। আমি আরও বলিলাম যে, তখন তখন তৈয়ার করিয়া দেওয়া তত সুবিধা নাই, আর দেশে বিদেশে লইয়া যাইতেও পারা যাইবে, অতএব আপনারা একেবারে Saturated spirit camphor ডিস্পেন্‌সারীতে তৈয়ার করিয়া এক আউন্স শিশিতে ভরিয়া কতকগুলি প্রস্তত করিয়া রাখুন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বৃন্দাবন বাবু বৈষয়িক সম্বন্ধে বেশ একটী বিচক্ষণ লোক ছিলেন। তিনি এ কথাটী বেশ আদর করিয়া মনোযোগ দিয়া শুনিলেন। তখন এত পেটেণ্ট ঔষধের ছড়াছড়ি ছিল না। এমন যে ডিঃ গুপ্ত পেটেণ্ট ঔষধের শিরোমণি, তিনিও বাজারে তখন ভাল রূপ মাথা তুলেন নাই। বৃন্দাবন বাবু বলিলেন, "বেশ বলিয়া-

ছেন, আপনি একটা ব্যবস্থাপত্রের মতন ইংরাজী ও বাঙ্গালায় লিখুন, আমি উহাকে এক রকম পেটেণ্ট করিয়া বিক্রয় করিব।" ব্যবস্থাপত্র একটা লেখা হইল, রাজেন্দ্র বাবুকে দেখাইয়া লওয়া হইল, আর পাছে কর্পূরের হাওয়ায় অন্য ঔষধ খারাপ হইয়া যায়, সেই জন্যে ঐ Saturated spirit camphor ডিস্পেন্সারীতে আর একটা ঘরে প্রস্তুত করা হইতে লাগিল। আর এক বৎসরের মধ্যে অন্যূন ৫০ হাজার টাকার ঐ "Saturated spirit camphor" বিক্রয় হইল। যাহা হউক, এক কথা বলিতে অনেক কথা বলিয়া ফেলিলাম। একটা ঔষধ যখন বেশী প্রচলিত হয়, তখন লোকে আর ভাবে না, যে সে ঔষধটা দিবার লাভ কি, লোকসান কি। একটা প্রথা রক্ষা হিসাবে তখন দিতেই হইবে, সেই জন্যে এখন লোকের এমনই একটা ধারণা হইয়া গিয়াছে যে, যে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ২৪ ফোঁটা "Saturated spirit Camphor" না দিল, সে চিকিৎসকই নয়। কিন্তু যদি ঠিক বিবেচনা করা যায় তবে ওলাউঠার সব লক্ষণগুলি ক্যাম্ফরের সঙ্গে মিলে না। তবে ক্যাম্ফরের কতকটা ঐ রকম লক্ষণ আছে। আর ক্যাম্ফর একটী ষ্টিমিউলেণ্ট ঔষধ। অর্থাৎ উত্তেজক অর্থাৎ গরম ঔষধ। মোটামুটী এক রকম বাহ্যে বমি বন্ধ হয়, আর নাড়ী গরম হইয়া উঠে, এই রকম ঔষধ ওলাউঠায় আবশ্যক। ক্যাম্ফরও সেই রকম ঔষধ, অতএব ক্যাম্ফরে কতকটা ফলও অবশ্যই হইবে। তবে কোন বহুদর্শী হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক বলিতে পারেন না যে, একা ক্যাম্ফরে কোন একটা শক্ত ওলাউঠা আরাম হইয়াছে বা ক্যাম্ফর ওলাউঠার সকল রকম অবস্থার লক্ষণের সহিত মিলাইয়া দেওয়া যায়। আবার বলি যে, রীতি;

রক্ষার জন্য ওলাউঠার প্রথম অবস্থায় ক্যাম্ফর দেওয়া উচিত হইয়া উঠে। তবে ক্যাম্ফরের দোষ গুণ বিবেচনা করিয়া, ক্যাম্ফরের সঙ্গে আর কএকটী ঔষধ মিশাইয়া "কলেরা কিলার" নামক আমরা একটী ঔষধ প্রস্তুত করিয়াছি। ইং ১৮৯৪ সনে অর্থাৎ বাঙ্গালা ১৩০২সনের চৈত্রমাসে ব্রহ্মপুত্র স্নান উপলক্ষে বহু লোকের জনতা-প্রযুক্ত সেখানেই প্রথমতঃ ওলাউঠা আরম্ভ হইয়া ঢাকা ময়মনসিংহ জেলায় ভয়ানক ওলাউঠার এপিড্যামিক হয় এবং তত্রস্থ ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আমাদের CHOLERA KILLER ঔষধ লওয়াইয়া অনেক লোককে মৃত্যুগ্রাস হইতে রক্ষা করিয়াছেন। আমাদের জ্ঞান বিশ্বাস মত Saturated spirit camphor স্যাচুরেটেড স্পিরিট ক্যাম্ফরের পরিবর্ত্তে ঐ Cholera killer "কলেরা কিলার" ব্যবহার করিলে বেশী উপকার হয়, "কলেরা কিলারের" দামও সস্তা, আট ॥০ আনা শিশি। ব্যবস্থাপত্র উহার সঙ্গেই আছে।

ভেরেট্রম্ এল্‌বম্ Veratrum Album খুব বাহে, বমি, নাড়ী সূক্ষ্ম সূতার ন্যায়, আর না হয়ত এক বারেই পাওয়া যায় না, হাত পায়ে খাল ধরা, তৃষ্ণা, বারে বারে জল পানের ইচ্ছা, আর একেবারে খুব বেশী পান করিতে চাহে, জ্বালা, অস্থিরতা, হাত পায়ের নখের কাছে নীলবর্ণ, হাত পায়ের মাস যেন চুপ্সান, এ অবস্থায় ভেরেট্রম্ ৬।১২।৩০ আধ ঘণ্টা কি এক ঘণ্টা অন্তর।

কুপ্রাম্ মেটালিকম্ Cuprum Metallicum অল্প অল্প খাল ধরা থাকিলে ভেরেট্রমেই কমে, কিন্তু খাল ধরা যদি বেশী থাকে, আর আধ ঘণ্টা অন্তর ৩।৪ বার ভেরেট্রম দিয়া খাল ধরা যদি না কমে, তবে কুপ্রাম্ মেটালিকম্ ১২ ভেরেট্রমের সঙ্গে

উল্টা পাল্টা দেওয়া ভাল। উল্টা পাল্টা করিয়া ঔষধ দেওয়াকে Alternately অল্টারনেটলি দেওয়া বলে অর্থাৎ ৯টার সময় ভেরেট্রম দিলে ৯॥ টার সময় কুপ্রাম্ দিতে হয়। আবার ১০ টার সময় ভেরেট্রম্, ইত্যাদি এটা একবার ওটা আর একবার। একবার এটা একবার ওটা একবার করিয়া ঐ ঔষধ ১০ মিনিট অন্তরও দেওয়া যায়, আধ ঘণ্টা অন্তর, এক ঘণ্টা অন্তর, কি ২ ঘণ্টা অন্তর দেওয়া যায়, যে রকম রোগীর আবশ্যক।

আর্সেনিকম্ Arsenicum বাহ্যে বমি তত হয় না, কিন্তু রোগী দুর্ব্বল বেশী, পিপাসা খুব বেশী, কিন্তু তত বেশী জল খায় না, একটু জল খেয়েই আর খেতে চায় না, রোগীর গা ঠাণ্ডা, কিন্তু রোগী বলে শরীর একেবারে জ্বলে যায়, বিছানায় ছট্‌ফট্‌ করে, আর বাহ্যে বমি প্রায় একত্রে হয়। এ অবস্থায় আর্সেনিক ১২।৩০ বিশ কি ত্রিশ মিনিট অন্তর দিলে খুব উপকার হয়।

ভেরেট্রম্ আর আর্সেনিক দুইটাই ওলাউঠার প্রধান ঔষধ। তবে ভেরেট্রম আর আর্সেনিকের লক্ষণে একটু সূক্ষ্ম তফাত আছে, সেই জন্যে দুটী ঔষধের লক্ষণে কি তফাত একটু বিশেষ করিয়া লিখি।

আর্সেনিকের লক্ষণ।	ভেরেট্রমের লক্ষণ।
আর্সেনিকে তত হুড় হুড় করিয়া বাহ্যে আর বমি হয় না, আর রোগীর যত বাহ্যে কম রোগী তত দুর্ব্বল বেশী। অর্থাৎ বেশী বাহ্যেতে রোগী তত খারাপ	বাহ্যে বমি বেশী হয়, আর বাহ্যে বমি বেশী হইলে রোগী বেশী কম জোর হয়।

নয়, কিন্তু কম বাহ্যেতেই রোগী বেশী খারাপ।	
বাহ্যে বমি একত্রে হয়।	বাহ্যে বমি পৃথক্ সময়ে হয়, বাহ্যে অপেক্ষা হয়ত বমি অনেক বার হয়।
তৃষ্ণা ঢের বেশী কিন্তু রোগী এক সময়ে অনেক খানি জল পান করে না। একটু একটু করিয়া বারে বারে জল খায়, পিপাসা পিপাসা বলে, কিন্তু খুব বেশী করিয়া জল দিলেও অনেক খানি খায় না।	তৃষ্ণা খুব থাকে, কিন্তু রোগী অল্প জলে সন্তুষ্ট হয় না, একেবারে খুব বেশী করিয়া জল পান করিতে চাহে। তবে সর্ব্বদা জল খাইতে চায় না, একবার খানিকটা জল দিলে অনেকক্ষণ আর জল চায় না, অর্থাৎ বারে বারে জল পান করিতে চায় না, কিন্তু একবারে অনেক খানি চায় ও খায়।
রোগী ২।১ বার বাহ্যে বমি হইবার পরই দুর্ব্বল হয়ে পড়ে। আর ক্রমে যত বাহ্যে বমি কম হইয়া আসিতে থাকে, রোগী ততই বেশী নিস্তেজ হইয়া পড়ে।	রোগী তত হঠাৎ নির্জ্জীব হইয়া পড়ে না, হুড় হুড় করিয়া বাহ্যে বমি হয় বটে, কিন্তু রোগী তত শীঘ্র কাবু হয় না। তবে ক্রমে বারে বারে বাহ্যে হইলে রোগী ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। অর্থাৎ আর্সেনিকে যেমন দুই এক বার বাহ্যে হইলে নাড়ী ছাড়িয়া যায়, ভেরেট্রমে তাহা হয় না।

উপর পেটে বেদনা থাকে, আর পেট জ্বলে, রোগী বড় অস্থির, বিছানায় এ পাস ও পাস করে।	ছড় ছড় করিয়া বাহ্যে হয় বটে, কিন্তু পেটে জ্বালা কি বেদনা থাকে না। রোগী তত অস্থির নয়, আর ছট্‌ফট্‌ও করে না।

একোনাইট Aconite বাহ্যে বমি, হাত পা ঠাণ্ডা, বা প্রায় শরীরের সমস্ত স্থানেই ঠাণ্ডা, হাতে পায়ে খাল ধরে, হাত পা নীলবর্ণ, শ্বাস ঘন ঘন পড়ে, পেটে অসহ্য বেদনা, নাড়ী প্রায় নাই বলিলেও হয়, মাথা একটুকু ভার ভার। ইহাতে একোনাইট এক বা মাদার টিংচার আধ ফোঁটা কি এক ফোঁটা মাত্রায় আধ ঘণ্টা কি এক ঘণ্টা অন্তর দেওয়া যায়।

অনেকে বলেন যে, ওলাউঠার কোলাপ্স অবস্থায় যখন বাহ্যের রং হল্‌দে হয়, আর সাদা সাদা আম মিশ্রিত থাকে, তখন একোনাইট বেশ ভাল ঔষধ। ছেলেদের ওলা-উঠার এ অবস্থায় একোনাইট আরও বেশী কাজ করে। আর রিএ্যাকসনের সময় অর্থাৎ রোগী যখন কোলাপ্স অবস্থা হইতে আরাম হইবার লক্ষণ হয়, তখন যদি মাথা ভার থাকে, আর তৃষ্ণা থাকে, নাড়ী রোগীর অবস্থা অপেক্ষা সবল, আর গায়ের উত্তাপ বেশী, এ অবস্থাতেও একোনাইট ভাল ঔষধ।

ডাক্তার Hughes হিউজেস্ বলেন যে, যে অবস্থায় কুপ্রাম্ আর আর্সেনিক দেওয়া যায়, সে অবস্থায় একোনাইট দিলে আরও বেশী কাজ হয়।

কুপ্রাম্ মেটালিকম্ Cuprum Metallicum এই ঔষধ খালধরা বেশী থাকিলে ভেরেট্রমের সঙ্গে উল্টা পাল্টা করিয়া দিতে হয় বলিয়াছি। কিন্তু এই ঔষধটী ওলাউঠা ব্যারামের

একটী প্রধান ঔষধ। সেই জন্যে ইহার লক্ষণ একটু বিশেষ করিয়া লিখিতে হয়। যখন শরীর বরফের মতন ঠাণ্ডা, হাত পায়ে বিশেষতঃ হাতের ও পায়ের আঙ্গুলে বেশী খাল ধরে আর রোগীর কোলাপ্স হইয়া, চেহারা যেন চুপ্সে গিয়াছে, নির্জীব হইয়া পড়িয়া আছে, কেবল খাল ধরিলেই নড়ে চড়ে, জল কি অন্য কোন তরল দ্রব্য খাইলে পেটে গড়্ গড়্ করিয়া শব্দ হয়, গা বমি বমি খুব বেশী থাকে, কিন্তু তত বমি হয় না। জল খাইলে পেটে বেদনা হয়, আর নাড়ী প্রায় নাই, এ অবস্থায় কুপ্রাম্ মেটালিকম্ ৬।১২।৩০ দেওয়া যায়।

কার্ব্বো ভেজিটেবিলিস্ Carbo vegetabilis রোগীর কোলাপ্স হইয়াছে অর্থাৎ হিমাঙ্গ হইয়াছে। সমস্ত শরীর বরফের মত হিম, জীবে হাত দিলে জীবও বরফের মত ঠাণ্ডা, নাড়ী নাই, বাহ্যে ও বমি বন্ধ হইয়া গিয়াছে, পেট ফাঁপিয়া উঠিয়াছে, আর পেটে হাত দিলে বড় বেদনা, চক্ষু খোলে পড়িয়া গিয়াছে, কথা যেন হাঁড়ির ভিতর হইতে বাহির হইতেছে, শ্বাস ঘন ঘন পড়িতেছে, কপালে আর ঘাড়ে বিন্দু বিন্দু ঘাম, রোগী এ পাস ও পাস করিতেছে। যেন মৃত্যু-যন্ত্রণা, এ অবস্থায় কার্ব্বো ভেজিটেবিলিস্ ৬।১২।৩০ দশ মিনিট, কুড়ি মিনিট বা ত্রিশ মিনিট অন্তর দিতে হয়।

ছেলেদের ওলাউঠায় ন্যাতা প্যাতা হইয়া হিমাঙ্গ হইয়া পড়িবার পর সময় সময় সাদা সাদা জলের ন্যায় বাহ্যে গুহ্যদ্বার দিয়া চুয়াইয়া পড়ে, এ বাহ্যেতে বড় দুর্গন্ধ, আর মধ্যে মধ্যে বাতকর্ম্ম হয়, আর সমস্ত লক্ষণ সন্ধ্যাকালে বাড়ে, Carbo vegetabilis কার্ব্বো ভেজিটেবিলিস্ তাহার বেশ ভাল ঔষধ।

কখন কখন Carbo vegetabilis কার্ব্বো ভেজিটেবিলিস্ আর arsenic আর্সেনিক আধ ঘণ্টা অন্তর উল্‌টা পাল্‌টা করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু আমি দেখিয়াছি, তাতে বড় বেশী কাজ হয় না।

ইপিকাকুয়ানা Ipecacuanha বাহ্যে অপেক্ষা গা বমি বমি, আর বমি হওয়া যদি বেশী প্রবল থাকে, আর বাহ্যের রং সাদা বা ঘাসের মত, আর বাহ্যে পাতলা বা ফেণা ফেণা বা মলের সঙ্গে আম বা আমরক্ত মিশান হয়, তাহা হইলে ইপিকাকুয়ানা ৩৬ এক ঘণ্টা কি দুই ঘণ্টা অন্তর দিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

ছেলেদের এ রকম লক্ষণ হইলে ইপিকাকুয়ানায় অন্য ঔষধ অপেক্ষা ঢের বেশী কাজ হয়। ফলতঃ ইপিকাকুয়ানা ছেলেদের বড় বেশী উপকারী ঔষধ।

ওলাউঠার পর খালি ডাহা রক্ত বাহ্যে হইলেও ইপিকাকুয়ানা ইহার একটী ভাল ঔষধ। কিন্তু ঐ বাহ্যের রং যদি ডাহা লাল না হইয়া কাল কাল হয়, তাহা হইলে ইপিকাকুয়ানা হইতে হ্যামামেলিস্ Hamamelis ১৩ বেশী কাজ করে।

ক্যান্থারিস্ Cantharis রোগী আরাম হইবার লক্ষণ হইল, সকল উপসর্গ কমিল, ক্রমে শরীর একটু গরম হইল, নাড়ী আসিল, কিন্তু প্রস্রাব আর হয় না। এ অবস্থায় Cantharis ক্যান্থারিস্ ৬ আধ ঘণ্টা কি এক ঘণ্টা অন্তর দিলে বেশ উপকার পাওয়া যায়।

আমি দেখিয়াছি, রোগী আরাম হইবার পথে আসিয়াছে, অন্য অন্য লক্ষণ কমিয়াছে, গা একটু গরম হইয়াছে। কিন্তু

নাড়ী বেশ সবল হয় নাই। এ অবস্থায় আর ক্যান্থারিস্ দিলে তত উপকার হয় না। আমি ক্যান্থারিসের সঙ্গে ডিজিটেলিস্ Digitalis ৩।৬ এক ফোঁটা করিয়া উল্টা পাল্টা করিয়া দিয়া বেশী ফল পাইয়াছি। কখন কখন ক্যান্থারিস্ মোটে না দিয়া খালি ডিজিটেলিস্ দিলে বেশী উপকার পাওয়া যায়। আর ক্যান্থারিস্ দিয়া উপকার না হইলে দুই তিন মাত্রার পরেই অনেকে Kali bicromicum কেলি বাইক্রোমিকম্ ৩ আধ ঘণ্টা কি এক ঘণ্টা অন্তর দিয়া থাকেন। ইহাতেও কাজ হয়।

Kali bicromicum কেলি বাইক্রোমিকমে যদি কিছু না হয়, তবে এ অবস্থায় Terebinthina টেরিবিন্থিনা ৩।৬ আধ ঘণ্টা কি এক ঘণ্টা অন্তর দিলে উপকার হয়।

এস্থলে ইহা বলা আবশ্যক যে, প্রস্রাব না হওয়ার জন্যে যদি রোগীর চক্ষু লাল হইয়া ভুল বকিতে আরম্ভ করে বা কোনরূপ জ্ঞানের বৈলক্ষণ্য হয় বা খেঁচিতে আরম্ভ করে, ওরূপ অবস্থাতেও এই কয়েকটী ঔষধ দিলে উপকার হয়। ইহার জন্যে আর পৃথক কোন ঔষধ দিবার আবশ্যক নাই।

রোগী আরাম হইতে আরম্ভ হইলে প্রস্রাব না হওয়ার জন্য যে বিকারের লক্ষণ হয়, তাহাকে ইংরাজীতে Uræmia ইউরিমিয়া বলে। ইউরিমিয়ার ভাল বাঙ্গালা নাই। ইউরিমিয়ার কারণ একটু বলিলে ইউরিমিয়া কি, তাহা বুঝা যাইবে। ইউরিমিয়ার কথা ইহার পূর্ব্বে এক রকম বলিয়াছি। আমাদের প্রস্রাবের সঙ্গে রক্তের একটী বিষ নির্গত হইয়া যায়, সে বিষটীকে ইউরিয়া বলে। ওলাউঠা রোগীর যদি প্রস্রাব না

হয়, তবে ঐ ইউরিয়া বিষও নির্গত হইতে পারে না। রক্তের সঙ্গে থাকিয়া যায়, আর রক্তের সঙ্গে থাকিয়া, মাথার মগজকে খারাপ করে, রোগীর চক্ষু চড়িয়া বড়ই লাল হইয়া যায়, ভুল বকে, জ্ঞানেরও বৈলক্ষণ্য হয়। এই অবস্থার কারণই ইউরিয়া নামক বিষ। সেই জন্যই ঐ রোগটীর নাম ইউরিমিয়া। অর্থাৎ ইউরিয়া নামক বিষ রক্তে মিশিয়া যে রোগ উৎপন্ন হয়, তাহারই নাম ইউরিমিয়া।

আর প্রস্রাব না হওয়ার জন্য ইউরিমিয়া হইয়া যদি রোগী এলো মেলো বকে, আক্ষেপ অর্থাৎ খেঁচুনী হয়, আর রোগী যদি কোমায় অজ্ঞান থাকে, আর রোগীর যদি আধ রক্তানি আধ রক্তানির মত বাহ্যে হয়, তবে Cantharis ক্যান্থারিস্ তার চমৎকার ঔষধ।

আর প্রস্রাবের থলির নিস্তেজতার জন্য যখন প্রস্রাব না হয়, রোগী এলোমেলো বকে ও অজ্ঞান থাকে, আর চক্ষু শিব নেত্রের মতন আধ বুজা থাকে, পিপাসা আর মুখ শুষ্ক হয়, তখন Belladonna বেলেডোনা ৩০ আধ ঘণ্টা অন্তর দিলে খুব কাজ হয়।

যখন কেবল বেলেডোনাতে বেশী কাজ না হয়, তখন বেলেডোনা ৩০ আর কার্ব্বোভেজিটেবিলিস ৩০ আধ ঘণ্টা কি এক ঘণ্টা অন্তর এটী একবার আর ওটী একবার দিলে বেশী কাজ হয়।

মার্কুরিয়স্ করোসাইভস্ Mercurius Corrosivus
ওলাউঠায় কখন কখন দুবার কি তিন বার পাতলা বাহ্যে হইবার পরেই আধরক্তানি মতন বাহ্যে হইতে সুরু হয়, আর পেটে খুব বেদনা থাকে, আর পেটের বেদনা নীচের দিকে বেশী, এ অবস্থায়

ভেরেট্রম ইত্যাদি ওলাউঠার বাঁধি ঔষধ না দিয়া, মার্কুরিয়স্ করোসাইভস্ ৩।৬ দিলে আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যায়।

রিসিনস্ কমিউনিস্ Ricinus Communis বাহ্যের এ রকম লক্ষণ থেকে যদি পেটের বেদনা বেশী না থাকে, তাহা হইলে মার্কুরিয়সের বদলে কোন কোন ডাক্তার রিসিনস্ কমিউনিস্ ৬ দিয়া থাকেন।

রিসিনস্ কমিউনিস্‌কে কয়েক জন ডাক্তার বড় বেশী ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কেহ কেহ রিসিনস্ কমিউনিস্ দিয়া ওলাউঠার আগাগোড়া চিকিৎসা করিয়াছেন, নানা মুনির নানা মত, যাহা হউক, রিসিনস্ কমিউনিসের উপর আমাদেব তত ভক্তি নাই।

সিকেলি কর্ণিউটম্ Secale Cornutum কুপ্রাম্ দিয়া যদি খাল ধরা নিবারণ না হয়, আর হাত পা ভিন্ন অন্য স্থানে খাল ধরা থাকে, এমন কি মুখ পর্য্যন্ত খাল ধরিয়া বাঁকিয়া যায়, আর রোগী জীব কামড়াইতে থাকে, তবে সিকেলি কর্ণিউটম্ ৩।৬।১২।৩০ ব্যবহার করা হয়।

খালি হাতে পায়ে খাল ধরায় কুপ্রাম্ মিটালিকম্ ভাল। কিন্তু যদি বুকেব ও মুখের মাংসপেশীতে খাল ধরা থাকে, তবে তাহার ঔষধ সিকেলি কর্ণিউটম্।

সিনা Cina কখন কখন রোগী আরোগ্য হইতে আরম্ভ হইয়া এক রকম জবে স্থবে থাকে, অর্থাৎ ভাল করিয়া আরোগ্য হইতেও আরম্ভ হয় না, আব বেশী খারাপও হয় না, এ অবস্থা অল্প-বয়স্ক বালকদিগেরই বেশী হইয়া থাকে। এই অবস্থায় যদি মুখে জল উঠে, রোগী দাঁত কিড়িমিড়ি করে, আর গুহ্যদ্বারে সূচ ফুটানমত

বেদনা হয়, সর্ব্বদা নাক চুলকায়, চক্ষু একটু রক্তবর্ণ, আধ বোজা, চোখের পুত্তলী একটু বড়, রোগী এক রকম যেন তন্দ্রাবস্থায়, আর ঐ তন্দ্রাবস্থায় ঝোঁকে ঝোঁকে চেঁচাইয়া উঠে, পেটে বেদনা বলে, এ অবস্থায় সিনা cina ৩।৩০ বড় কাজ করে।

সিনা ৩।৩০ না দিয়া কেহ কেহ একেবারে সিনা ২০০ দেন। আর আমি দেখিয়াছি সিনা ২০০ই এক ঘণ্টা অন্তর দিলে বেশী কাজ হয়।

রোগীর যে সকল লক্ষণ বলিলাম, এইগুলি সকলই ক্বমির লক্ষণ। সোজাসুজি রোগীর পেট হইতে ক্বমী বাহির হওয়া চাই। যে উপায়ই কর, ক্বমী না বাহির হইলে রোগীর নিস্তার নাই।

আমার ক্বমি সম্বন্ধে সিনা ঔষধটীর উপর এ অবস্থায় তত বিশ্বাস নাই। তবে যদি কিছু উপকার পাইয়া থাকি, তবে বেশী ক্রমে অর্থাৎ ২০০তে পাইয়াছি। আর সিনায় কিছু না হইলে, আমি একেবারে সোজাসুজি ৫ গ্রেণ Santonine স্যাণ্টোনাইন খাওয়াইয়া থাকি। এটা বেশী নিশ্চিত।

স্যাণ্টোনাইন খাওয়াইবার পর ক্বমিও বাহির হয়, রোগীও ক্রমে ক্রমে চাঙ্গা হয়। কারণ হোমিওপ্যাথি ভিন্ন কিছু করিব না মনে করিয়া ক্রমাগত বই নাড়া চাড়া করিতে করিতে এ ঔষধ ও ঔষধ করিতে করিতে রোগী হয় ত ক্রমে নিকাশ হয়। এ অবস্থায় ক্বমি নির্গত করিতে Arsenic আর্সেনিকও একটী চমৎকার ঔষধ। আমার সলিম দর্জ্জির ১০।১২ বৎসরের ছেলের ১৩২টা ক্বমি আমি আর্সেনিক ৩০ দিয়া বাহির করিয়াছিলাম। ক্বমিও বড় বড় কেঁচোর মত, যাহাকে ইংরাজীতে Round worm বলে।

নক্সভমিকা Nuxvomica ;—খাবার দোষে বা রাত্রি জাগরণে, বা মদ্যপানে, অতিরিক্ত জননেন্দ্রিয়ের চালনায়, অথবা মানসিক পরিশ্রমে যদি এই রোগের উৎপত্তি হয়, আর যদি বাহ্যের রং হল্‌দে জলের ন্যায় আর পেট ফাঁপা থাকে, তবে অন্য অন্য ঔষধ অপেক্ষা নক্সভমিকায় বেশী কাজ করে।

আর রিএ্যাক্‌শনের পর, অর্থাৎ আরোগ্য হইতে আরম্ভ হইলে, যদি বাহ্যে একেবারে বন্ধ হইয়া খালি বমি হয়। আর হয় ত তার পরে হঠাৎ একেবারে পাতলা বাহ্যে হইতে আরম্ভ হয়, আর রোগীর রাত্রে ভাল ঘুম হয় না, অর্থাৎ শেষ রাত্রে একেবারে ঘুম হয় না, যেন শয্যাকণ্টকীর মত হয়, আর হাত পা জ্বলে, পিত্ত বমি হয়, অম্বল ঢেকুর উঠে, বুক জ্বলে, বৈকালে মাথাঘোরে, আর মাথা যেন ঝুঁকে পড়ে, এ অবস্থাতেও নক্‌স্‌ভমিকা ৩০ দিনে তিনবার বড় উপকারী।

পল্‌সেটিলা Pulsatilla ;—কোন ঘৃতপক্ক সামগ্রী, কোন ফল মূল ইত্যাদি জিনিস খাইয়া যদি ওলাউঠা রোগ আরম্ভ হয়, তবে অন্যান্য ঔষধ দিবার পূর্ব্বেই পল্‌সেটিলা ৬।১২।৩০ এক ঘণ্টা কি আধ ঘণ্টা অন্তর ২।৩ মাত্রা দেওয়া অতি আবশ্যক। এ অবস্থায় রোগী যাহা খাইয়াছে, বমির সঙ্গে তাহা আও উঠে, তার সঙ্গে পিত্তি থাকে, পিত্ত বাহ্যে হয়, আর বাহ্যে খুব জলের মত সবুজ। ছেলেদের এ ব্যারাম হইলে যদি জিবেতে সাদা ছাতলা পড়া থাকে, আর তৃষ্ণা বেশী থাকে না, বারে বারে জলের ন্যায় বাহ্যে হয়, আর পেট ডাকে, তবে প্রতিবার বাহ্যের পর এক এক মাত্রা পল্‌সেটিলা ১২ দেওয়া ভাল। পল্‌সেটিলা ২।৪ বার

[১২]

দিবার পর যদি কোন কাজ না হয়, তবে ভেরেট্রম এল্‌বম্‌ বা আর্সেনিক ৩০ লক্ষণ দেখিয়া দিবে।

চায়না China ;—বাহ্যের সঙ্গে যদি আস্ত আস্ত ভাত বা অন্য কোন দ্রব্য হজম না হইয়া পড়ে, আর পেটে বেদনা থাকে, আর বাহ্যের রং পাতলা হল্‌দে জলের মত হয়, আর সাদা সাদা ছানার মত বসা বসা আম থাকে, আর পিচকারীর মত বমি হয়, জীব হল্‌দে, খুব বেশী পিপাসা, কিন্তু রোগী অল্প জল পান করিয়াই তৃপ্ত হয়, পেট ফাঁপা থাকে, আর মধ্যে মধ্যে বাতকর্ম্ম হয়, তবে চায়না ৬।৩০ তাহার ঔষধ। আরাম হইতে আরম্ভ হইয়া যদি ওলাউঠার অন্যান্য লক্ষণ যায়, কিন্তু পাতলা হল্‌দে বাহ্যে হওয়া থাকে, এ অবস্থাতেও চায়না ৩০ দিনে তিনবার দিলে উপকার হয়।

সময় সময় পেটের ব্যারাম তত থাকে না, কিন্তু ওলাউঠা আরাম হইবার পরও রোগীর ক্ষুধা ভাল হয় না, বৈকালে পেট ফাঁপে, রাত্রে ভাল নিদ্রা হয় না, চোঁয়া ঢেঁকুর উঠে, এ অবস্থাতেও চায়না ৩০ সন্ধ্যা সকালে দিলে বেশ উপকার হয়।

এসিড্‌ হাইড্রোসিয়েনিক Acid Hydrocyanic ;—২।৩ বার বাহ্যে হবার পর নাড়ী প্রায় মণিবন্ধে পাওয়া যায় না, রোগীর আর বাহ্যে করিবার শক্তি নাই, বাহ্যে আপনাপনি গুহ্য-দ্বার দিয়া গড়াইয়া পড়িতেছে, সমস্ত গায়ে চট্‌চটে ঘাম হয়, আর চোক মুখ বসিয়া যায়, শরীর এমন বিবর্ণ যেন মৃত শরীরের ন্যায় বোধ হয়, ঘন ঘন নিশ্বাস, আর এক এক বার যেন নিশ্বাস বন্ধ হইয়া গেল বলিয়া জ্ঞান হয়, আর ঐরূপ নিশ্বাস বন্ধ হইয়া যেন রোগীর মৃত্যু হয়। ফল কথা রোগীর এমন অবস্থা যেন এই

মরিল এই মরিল বলিয়া বোধ হয়। এ অবস্থায় হাইড্রোসিয়েনিক এসিড ৩।৬ আধ ঘণ্টা অন্তর দিলে কখন কখন বেশ কাজ হয়। রোগীকে যেন যমের ঘর হইতে ফিরাইয়া লইয়া আসে।

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার এ ঔষধের অনেক সুখ্যাতি করিয়া লিখিয়াছেন যে, এ ঔষধটী যেন মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্রপূত।

এসিড ফস্ফরিক Acid Phosphoric ;—প্রথম হইতেই হুড় হুড় করিয়া বাহ্যে হয়, কিন্তু বাহ্যের কোন কষ্ট নাই, সাদা জলের মত বাহ্যে হয়, তাতে একটু একটু আম থাকে, এরূপ ওলাউঠার বমি বেশী হয় না, জীবে যেন আটার মত কি লাগিয়া আছে, চট্ চট্ করে। রোগী কথা কহিতে চায় না, ভাল পারেও না ; দুই একবার বাহ্যের পরই রোগী কেমন যেন অজ্ঞান হইয়া যায়, অজ্ঞান হইয়া যে এল মেল বকে তা নয়, কিন্তু যেন নিস্তেজ হইয়া পড়িয়া থাকে, আর রোগীর যেন আধমরা অবস্থা, সেইজন্য জ্ঞান চৈতন্য থাকে না। আর জ্ঞান যে একেবারে নাই তাও নয়, হয় ত খুব জোরে কাণের কাছে কথা বলিলে চৈতন্য আছে দেখা যায়, আর সে কথার উত্তরে বুঝা যায় যে, জ্ঞানও একরকম আছে, তবে ঐ রকম নিস্তেজ আধমরা অবস্থা বলিয়া যেন জ্ঞানশূন্য বোধ হয়। এতে দুর্ব্বলতার ভাবই যেন বেশী। ইহাতে ফস্ফরিক এসিড ৩।৬ আধ ঘণ্টা অন্তর দিলে বেশ ভাল কাজ করে।

রোগী ভাল হইবার অবস্থায় পড়িলে অর্থাৎ Reaction রিএ্যাক্‌শন হইতে আরম্ভ হইলে, কৃমির লক্ষণ না থাকিয়াও অনেক সময় রোগীর ভালরূপ আরাম হইতে অনেক দেরি হয়। অনেক বার সাদা সাদা বা হল্‌দে হল্‌দে বাহ্যে হয়। রোগীর নাড়ীর ভালরূপ জোর বাঁধে না, রোগীও ভাল চাঙ্গা হয় না, এক

রকম যেন আধা মাধা অবস্থায় থাকে। এ অবস্থাতেও ফস্ফরিক এসিড দিনে তিন বার দিলে বেশ কাজ হয়।

ফস্ফরাস্ Phosphorus ;—ছেলে পিলের ওলাউঠায় যদি ছেলেটী আগে হইতেই একটু দুর্ব্বল থাকে, আর ওলাউঠার বাহ্যে বমি হইবার পর বেশী নিস্তেজ হইয়া পড়ে, চোক কোটরে বসিয়া যায়, আর চোকের চারিদিগে একটী নীল দাগ হয়, জল পিপাসা খুব বেশী, কিন্তু জল খেলেই বমি হইয়া পড়িয়া যায়, আর গরম গরম বমি হয়, বাহ্যের সঙ্গে ছেঁড়া ছেঁড়া দুধ বা যাহা খাইয়াছে আস্ত আস্ত পেট দিয়া পড়ে, আর সকালবেলাই সকল কষ্ট বাড়ে, আর ওলাউঠার প্রথম থেকেই একটু নিশ্বাসের টান থাকে, আর তার পর হয় ত নিউমোনিয়া হইয়া দাঁড়ায়, এইরূপ লক্ষণে প্রথম অবস্থাতেই হউক আর নিউমোনিয়ার অবস্থাতেই হউক, ফস্ফরাস ৩।৬ আধ ঘণ্টা, এক ঘণ্টা বা দুই ঘণ্টা অন্তর দিলে বেশ ফল পাওয়া যায়।

বেলেডোনা Belladonna ;—রোগীর ওলাউঠার অন্যান্য লক্ষণ হয় ত সব গেল, রোগীর রিএ্যাক্সন্ অর্থাৎ আরাম হইবার অবস্থা হইল, কিন্তু ঐরূপ আরাম হইবার অবস্থা হইয়া জ্বর হইল ; মাথা গরম, হাত পা ঠাণ্ডা, নিদ্রা ভাল হয় না, চক্ষু লাল, পিপাসা, মুখ জীব শুষ্ক, নাড়ী আবার মৃদু হইয়া আসিল, প্রস্রাব তখনও হয় নাই, বা অসাড়ের মত ২।১ ফোঁটা প্রস্রাব পড়িতেছে, এ অবস্থায় বেলেডোনা ৩।৬ আধ ঘণ্টা কি এক ঘণ্টা অন্তর দিতে হয়।

বেলেডোনা ঔষধটী ছেলেদেরও অনেক সময় বেশ কাজ করে। অর্থাৎ ছেলেটীর যখন আরাম হইবার লক্ষণ হইল, নাড়ী

একটু একটু আসিয়াছে, হয় ত পাতলা পাতলা একটু একটু আপনাপনি বাহ্যে হয়, বাহ্যের সঙ্গে সবুজ আম মিশান থাকে, আর এ পাস ও পাস করিয়া যেন মাথা চালে, মাথা তুলিতে পারে না, আর একটু আচ্ছন্নভাবে থাকে, চোক আধবোজা, চোকের পুতুলী বড়, জ্ঞান নাই, কিন্তু হাতে পায়ে ও সর্ব্বাঙ্গে থাল ধরে, চক্ষে আলো সহিতে পারে না, একটু একটু ঘাম হয়, নাড়ী সূক্ষ্ম, কিন্তু শক্ত তাঁতের মত, মধ্যে মধ্যে চম্‌কে চম্‌কে উঠে, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে হাত পা নাড়ে, যেন হাত দিয়া কিছু ধরিবে বোধ হয়, সদাই অস্থির, এ অবস্থায় বেলেডোনা ৩০ দুই তিন ঘণ্টা অন্তর দিতে হয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আরাম হইবার লক্ষণে কয়েকটী উপসর্গে বিঘ্ন ঘটায়, সেই উপসর্গের চিকিৎসার কথা এখন বলি। তার প্রথম উপসর্গ, আরাম হইবার লক্ষণ একবার হইয়া আবার পুনরায় ওলাউঠার লক্ষণ সমস্ত উপস্থিত হয়। আর ওলাউঠার প্রথম হইতে লক্ষণ হিসাবে যে সব ঔষধের কথা বলিয়াছি, ঐ হিসাব অনুযায়ী ঐ ঐ ঔষধ ব্যবহার করিলেই চলিবে। তবে ইহার সঙ্গে যদি কোন কোন বিশেষ লক্ষণের আধিক্য থাকে, অর্থাৎ যদি পাকস্থলীর প্রদাহ থাকে, তবে প্রথমে একোনাইট, তার পর নক্সভমিকা, তার পরে আর্সে-নিক, তার পরে ব্রাইওনিয়া লক্ষণ হিসাবে দিবে। আর মস্তিষ্কে অর্থাৎ মাথার মগজে রক্ত জমিয়া প্রদাহের লক্ষণ থাকিলে বেলেডোনা। আর ফুস্‌ফুসে প্রদাহ হইয়া নিউমোনিয়ার লক্ষণে একোনাইট, ফস্‌ফরাস্‌ ও ব্রাইয়োনিয়া। আর আঁতুড়ীর প্রদাহ হইয়া রক্ত আমাশয়ের উপক্রম বা রক্ত আমাশয় হইলে

মার্কিউরিস্ সলিউবিলিস্, মার্কিউরিস্ করোসাইভস্, ইপিকাকুয়ানা দিতে হয়। ইহা সওয়ায়, পাকস্থলীর প্রদাহে ঠাণ্ডা জলের পটী, মস্তিষ্কের প্রদাহে বরফ বা ঠাণ্ডা জলের পটী, আর রক্ত আমাশয়ে প্রথমতঃ সেঁক দিয়া দিবা রাত্র ফ্ল্যানেল দিয়া পেটে পটী বাঁধিয়া রাখিতে হয়। আর ঐ পটীর উপরে মধ্যে মধ্যে তিসির পুল্‌টীসও দিলে ভাল হয়। তিসির পুল্‌টীস বা রায়ের পলস্তারা কেমন করিয়া দিতে হয়, তাহা উপক্রমণিকায় দেখ।

দ্বিতীয়—টাইফয়েড কণ্ডিসন্ Typhoid condition, অর্থাৎ রোগী আরাম হইবার অবস্থা হইয়া একটু জ্বর বোধ হইয়া চক্ষু লাল বর্ণ হইয়া মাথায় রক্ত চড়ে, প্রস্রাব বন্ধ হইয়া ওলাউঠার পরে যে বিকার প্রাপ্ত হয়, তাহাকেই Typhoid condition বলে।

রস্‌টক্স Rhustox,—রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল, শয্যাকণ্টকীর ন্যায় ছট্‌ফট্ করে, চক্ষু লাল, জীব লাল, শুষ্ক, মধ্যে মধ্যে পাতলা বাহ্যে হয়, রসটক্স ৬ এক কি দু ঘণ্টা অন্তর তাহার ঔষধ।

ব্রাইওনিয়া এল্‌বা Bryonea Alba;—ক্ষুধা মাত্র নাই, রোগী যেন তন্দ্রায় আছে, মধ্যে মধ্যে স্বপ্ন দেখিয়া জাগিয়া উঠে, গা বমি বমি করে আর বমি হয়, মাথা ভার ও মাথায় বেদনা,, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম হয়, জীব হল্‌দে ব্রাইওনিয়া ৬।১২ তার ঔষধ।

আর্সেনিক Arsenic;—অসহ্য পিপাসা, রোগী মিনিটে মিনিটে জল খায়, কিন্তু একেবারে বেশী জল খায় না, আর জল কি কোন তরল পদার্থ পান করিলেই বমি হয়, নাড়ী সূক্ষ্ম, দুর্ব্বল, কিন্তু শক্ত নয়, সূতার মত, তাঁতের বা তারের মত নয়, সমস্ত

শরীরে অসহ্য জ্বালা, রোগী ছট্‌ফট্‌ করে, কপালে আর ঘাড়ে ঘাম গড়াইয়া পড়ে, অর্থাৎ বিন্দু বিন্দু ঘাম হয় না, ঘাম বেশী হয়, রোগীর শরীর দিয়া মৃত দেহের ন্যায় দুর্গন্ধ উঠে, অধিক দিন শয্যাগত থাকাতে নিতম্বের নীচে ঘা হয় অর্থাৎ যাহাকে ইংরাজীতে Bed-sore বলে। পাতলা বাহ্যে হয় আর বাহ্যেতে বড় দুর্গন্ধ, আর্সেনিক ৩০ ইহার একটী বেশ ভাল ঔষধ। এখানে বলা আবশ্যক যে, আর্সেনিক ৬।৩০ যেমন তেমনই নক্সভমিকা ৬।৩০ এই দুটী ঔষধের দুইটী ক্রমে এত তফাৎ অর্থাৎ ৬ আর্সেনিক হইতে ৩০ আর্সেনিক কার্য্যে এত ভিন্ন যে, যেন দুটী পৃথক্ পৃথক্ ঔষধ বলিয়া বোধ হয়। নক্সভমিকা ৬ আর ৩০ থেকেও সেইরূপ তফাত। এখানে একথা বলিবার আবশ্যক এই যে, যেখানে ৩০ বলিয়া ধরিয়া লিখিয়া দিলাম, সেখানে কোনমতে ৬ দিবে না, ৩০এর স্থলে ৬ দিলে কিছুই কাজ হইবে না, কিন্তু ৩০ দিলে রোগী কি রোগীর আত্মীয়েরা তোমাকে মনে করিবেন যে, স্বয়ং শঙ্কর আসিয়া চিকিৎসা করিতে বসিয়াছেন। বাস্তবিক, এক এক স্থানে হোমিওপ্যাথি ঔষধে এত আশ্চর্য্য উপকার হয় যে, আমার অনেক সময় এমন সন্দেহ হইয়াছে যে, রোগীর আত্মীয়েরা আর কোন ঔষধ খাওয়াইল না কি? আর এ রকম সন্দেহ কেন হইয়াছে তাহাও বলি। হয়ত একটী রোগীকে তার অবস্থা দেখিয়া মনে করিলাম যে, এর আর বাঁচিবার আশা নাই। জোর ২ ঘণ্টা কি ৩ ঘণ্টা এ রোগী বাঁচিবে। আর ঐ অবস্থা দেখিয়া একটা ঔষধ দিলাম, যেন আর্সেনিক ৩০ দিলাম, রোগীর আত্মীয়দিগকে বলিয়া গেলাম যে, এই ঔষধটী আধঘণ্টা অন্তর খাওয়াও,

আবার এক ঘণ্টা কি আধ ঘণ্টা পরে আসিয়া দেখিতেছি। আর ঐ ঔষধ ২।৩ বার দিবার পরে গিয়া দেখি যে, রোগী আর সে রোগীই নয়। যাহাকে দেড় ঘণ্টা পূর্ব্বে মরিবে মনে করিয়াছিলাম, তখন গিয়ে দেখি যে, সে রোগীকে সানে আছাড় দিলেও মরিবে না। তবেই এ ঔষধ স্বয়ং শিবের ঔষধ বলিব না ত কি বলিব? তবে কি না ঔষধটী ঠিক হওয়া চাই, আর ডাইলিউসনটী ঠিক হওয়া চাই। কেবল ঔষধ ঠিক হইলেও চলিবে না। ইহাতে হয়ত আমাকে পাগল মনে করিবেন, কিন্তু কি করি, পাগল যে করিয়া ফেলে, পাগল যে হইতে হয়, যাহারা পাগল মনে করেন, তাহারাও যদি নিজে হাতে কখন এ রকম চিকিৎসা করেন ত তাহাদিগকেও পাগল হইতে হইবে। আমি ত ক্ষুদ্র লোক, অনেক বড় বড় এলোপ্যাথিক্ ডাক্তার হোমিওপ্যাথি ডাক্তারদের ভাল পাকা রকম করিয়া উপহাস করিতে পারিবেন বলিয়া ২।৪টা হোমিওপ্যাথি ঔষধ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন। তার পরে তার ফল দেখিয়া আর ঘরে ফিরিতে পারেন না, অর্থাৎ আর এলোপ্যাথি চিকিৎসাতে ভক্তি থাকে না। যাহা হউক এ কথা আর বেশী বলিবার আবশ্যক নাই, আমার কথা এই যে, হোমিওপ্যাথি ঔষধের ডাইলিউসন্ ঠিক করার বড় দরকার আছে।

তৃতীয় উপসর্গ—চোক ঘোলা পড়িয়া যাওয়া, আর চোকে ঘা হওয়া China চায়না ৩০ বেশ ভাল ঔষধ।

আমি দেখিয়াছি ১ গ্রেণ কি ২ গ্রেণ করিয়া সোজাসুজি কুইনাইন খাওয়াইলে বেশ কাজ হয়। পল্‌সেটিলা ৬ও ব্যবহার হয়। আর এর সঙ্গে অন্যান্য লক্ষণ বিবেচনায় নক্সভমিকা ৩০,

মার্কিউরিস সলুবিলিস ৬, লাইকোপোডিয়ম্ ১২।৩০, কার্ব্বো ভিজিটেবিলিস্ ৩০, ব্যবহার হয়।

৪র্থ উপসর্গ ইউরিমিয়া Uræmia ইউরিমিয়ার যে কারণ বলিয়াছি, তাতেই সোজাসুজি বুঝা যায় যে, রোগীর প্রস্রাব হইলেই ঐ ইউরিয়া বিষ নির্গত হইয়া যায়, আর রোগীও আরোগ্য হয়। অতএব প্রথমে একোনাইট, তার পরে আর্সেনিক লক্ষণ বিবেচনায় দিবে। একোনাইট ও আর্সেনিকে প্রস্রাব না হইলে ক্যান্থারিস্ ৩।৬ দেওয়া যায়। ইহার বিশেষ লক্ষণ, কোমরের উপরে দুপাসে যেন চাপিয়া ধরিয়া থাকে, আর বারে বারে প্রস্রাবের চেষ্টা হয়। Cantharis ক্যান্থারিসে কাজ না হইলে ডিজিটেলিস ৩ ক্যান্থারিসের সঙ্গে আধঘণ্টা অন্তর উল্টা পাল্টা দিলে অনেক সময় কেবল ক্যান্থারিস্ দেওয়া অপেক্ষা বেশী উপকার হয়।

৫ম উপসর্গ—গা ত্যাকার ত্যাকার করা ও বমি হওয়া। এ উপসর্গ দুটাই প্রায় এক, ঔষধও প্রায় এক। এর ভাল ঔষধ ইপিকাকুয়ানা ৩।৬ Ipecacuanha আধ ঘণ্টা কি এক ঘণ্টা অন্তর।

দুই রকম উপসর্গতেই সাধারণতঃ ইপিকাকুয়ানাতে কাজ হয়, তবে যে স্থানে বমি বেশী না হইয়া খালি গা বমি বমি করে, সে স্থানে ইপিকাকুয়ানা দেওয়া ভাল। কিন্তু যেস্থানে গা বমি বমি করে আর বমি হয়, সে রোগীকে নক্সভমিকা ৩০ আধ ঘণ্টা অন্তর দিলে বেশী কাজ হয়।

নক্সভমিকায় বেশী উপকার না হইলে পডোফাইলম্‌ও আধ ঘণ্টা কি এক ঘণ্টা অন্তর দেওয়া ভাল। আর কিছু তরল দ্রব্য খেলেই যদি বমি হয়, তবে আর্সেনিক ৩০ তার একমাত্র ঔষধ।

এ অবস্থায় Eupatorium Perfoliatum ইউপেটোরিয়ম্ পার্ফোলিয়েটম্ ৩।৬ও ব্যবহার হয়। কিন্তু ইউপেটোরিয়ম থেকে আর্সেনিকেই প্রত্যক্ষ ফল দেখা যায়।

৬ষ্ঠ হিক্কা—হিক্কা লক্ষণটী সামান্য বটে, কিন্তু ইহা যেমন কষ্টদায়ক, সাংঘাতিকও তেমন। হিক্কাতে শরীরের ভিতরকার অনেক রকম সাংঘাতিক বিকৃতি বুঝায়। অনেক রোগের শেষ অবস্থা হিক্কা;—জ্বরবিকারে হিক্কা হইলে, রোগীর প্রাণ পাওয়া একপ্রকার অসম্ভব। হিক্কাকে অনেক কবিরাজেরা যমের ভগিনী বলেন। ডাক্তার স্থাল্জার বলেন, হিক্কা সমস্ত বিরামের আরম্ভ। "It is the beginning of the end." যাহা হউক লক্ষণ বিবেচনায় ইহাতে বেলেডোনা Belladonna, হাইওসিয়েমস্ Hyosciamus, কার্ব্বো ভেজিটেবিলিস্ Carbo vegitabilis, ফস্ফরস্ Phosphorus, ইগ্নেশিয়া Ignatia, সল্ফর Sulphur, একোনাইট Aconite, আর্সেনিক Arsenic, ব্রাইওনিয়া Bryonia ল্যাকেসিস্ Lachesis, নক্সভমিকা Nox vomica, ভিরেট্রম্ Veratrum, জিন্কম্ Zincum, কুপ্রাম্ Cuprum, ইত্যাদি দেওয়া হয়। আমি দেখিয়াছি, সর্ব্বাপেক্ষা একোনাইট ও বেলেডোনাতেই বেশী কাজ হয়।

৭ম উপসর্গ—নাসিকা, উপস্থ ইত্যাদি পচা ধরিলে আর্সেনিক আর লিকেসিস্, চায়না, কার্ব্বো ভেজিটেবিলিস্ ব্যবহার হয়। ইহার মধ্যে আর্সেনিক ও কার্ব্বোভেজিটেবিলিস ভাল ঔষধ।

৮ম উপসর্গ—কর্ণমূল ও ফোড়া বসাইবার জন্য Mercurius solubilis মার্কিউরিয়স্ সলুবিলিস্ Belladonna বেলে-

ডোনা ৩।৬ উল্টা পাল্টা করিয়া দিলে আর পাক ধরিলে Hepar Sulph হিপার সল্‌ফ এক কি দুই ঘণ্টা অন্তর দিবে। আর বেশী পাকিয়া যদি বেশী পাকার দরুণ খারাপ না হইয়া যায়, তবে Silica সিলিকা ৬।৩০ ঘণ্টায় ঘণ্টায় দিবে। তবে পুঁজ বেশী গাঢ় হইলে Hepar Sulph হিপার সল্‌ফ দেওয়া উচিত। আর পুঁজ পাতলা হইলে Silica সিলিকা।

৯ম ফুস্‌ফুসের প্রদাহ—অর্থাৎ নিউমোনিয়া হইলে লক্ষণ বিবেচনায় ব্রাইওনিয়া কি ফস্ফরাস্ দিবে। আর জ্বর বেশী থাকিলে একোনাইট্ দেওয়া ভাল।

ওলাউঠার চিকিৎসা সম্বন্ধে যে সকল ঔষধের কথা পুর্ব্বে লেখা হইল, এই সকল ঔষধ সম্বন্ধে মোটের উপর কয়েকটী কথা বলা আবশ্যক। ওলাউঠা রোগে প্রথম বাহ্যে হইতে আরম্ভ হইলে নীচের কয়েকটী ঔষধ প্রয়োগ করিবার বিশেষ বিশেষ লক্ষণ লেখা আবশ্যক।

একোনাইট ;—নাড়ীর দ্রুত গতি, নাড়ী নরম, রোগীর ক্ষণে শীত ক্ষণে গরম বোধ হয়, আর উত্তাপের জন্য বা হঠাৎ গরমের পর শরীর শীতল করায় যে ঘর্ম্ম বন্ধ হইয়া যায়, অথবা ভয়ে বা শোকে যদি পীড়ার উৎপত্তি হয়, গায়ের চর্ম্ম শুষ্ক, রোগীর পিপাসা অধিক থাকে, পিত্তের রঙ্গের মত পাতলা বা একেবারে সাদা বাহ্যে, প্রস্রাবের পরিমাণ অল্প, কিন্তু রং হলুদের গাটের মত বা লাল, রোগের আরম্ভ হইতেই যেন অঙ্গ অবশ হইয়া আসে, এস্থলে একোনাইট দিতে হয়।

ক্যাম্ফর ;—হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া রোগীর পাতলা বাহ্যে হইতে আরম্ভ হয়, আর যত বাহ্যে হয়, তত রোগীর শীত বোধ হয়।

একোনাইটের লক্ষণের মত একবার শীত একবার গরম বোধ হয় না, সর্ব্বদাই শীত বোধ হয়, শরীরে শীতল ঘর্ম্ম হয়, রোগীর শীত বোধ হয়, কিন্তু গায়ে কাপড় রাখিতে চাহে না, নাড়ী তাঁতের মত সূক্ষ্ম এবং শক্ত, নাড়ীর বীট স্বাভাবিক, পিপাসা মোটে থাকে না। বাহেতে মল থাকে, বাহের রং পাট্‌কিলে, হাতে পায়ে খুব বেশী খাল ধবে।

ক্রোটন টিগ্‌লিয়াম্‌;—হঠাৎ খুব পাতলা হুড় হুড় করিয়া জলের মত বাহে হয়, বাহের রং সবুজ, আর যেন পিচ-কারীর মত বাহে হয়, জলপানের পরক্ষণেই বাহে হয়।

হাইড্রোসিয়ানিক এসিড;—নাড়ী সূতার ন্যায় সূক্ষ্ম, চঞ্চল, নাড়ীর অবস্থা ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তন হয়, নিশ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট হয়, পাকস্থলীর উপরে একটু সামান্য বেদনা, রোগী দুর্ব্বল, হাত পা নাড়িতে পারে না, অল্প সময়েই রোগীর অবস্থা অতিশয় মন্দ হইয়া পড়ে, পরে বাহের কথা আর বলিতে পারে না, বাহে আপনা আপনিই হয়।

ইপিকাকুয়ানা Ipecacuanha ;—যে সমস্ত ঔষধের কথা পূর্ব্বে বলা হইল, ঐ সমস্ত ঔষধের লক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে একটু গা বমি বমি করা বা এক একবার বমন হওয়া সর্ব্বদাই থাকে, তবে অধিক বমি হইলে ২।৪ বার ইপিকাকুয়ানা দেওয়া আবশ্যক।

ফস্ফরিক এসিড Phosphoric Acid ;—বাহের রং ছাইয়ের মত ধূসর বর্ণ, অধিক পরিমাণে পাতলা জলের ন্যায় বাহে হয়, বাহে কোন কষ্ট নাই, জীহ্বায় একটু রস থাকে, প্রতিবার বাহে হইবার পরক্ষণেই যে রোগী দুর্ব্বল হইয়া পড়ে তাহা নহে, তবে বাহে হউক আর না হউক রোগী ক্রমেই দুর্ব্বল হয়।

সল্‌ফর Sulpher ;—শেষ রাত্রে হঠাৎ পাতলা বাহ্যে আরম্ভ হইলে প্রথমে সল্‌ফর দেওয়া আবশ্যক, তবে বরাবর পর্য্যন্ত একটী প্রবাদ আছে যে, শেষ রাত্রে ওলাউঠার সূত্রপাত হইলে সে ওলাউঠা প্রায়ই সাঙ্ঘাতিক হইয়া উঠে। এইটী কেবল প্রবাদ নয়, সত্য সত্যই শেষ রাত্রের ওলাউঠা অতিশয় ভয়াবহ।

ভেরেট্রম্ এলবাম্ Veratrum Album ;—জলের মত বাহ্যে হয়, বাহ্যের সঙ্গে পাতলা পাতলা চামড়ার টুক্‌রা, আর বাহ্যের রং সবুজ, বমি, মুখ আর হাত ঠাণ্ডা ও নীলবর্ণ, প্রতি বার বাহ্যের পূর্ব্বে পেটে বেদনা, একেবারে বেশী পরিমাণে জল পান করিবার পিপাসা, অম্ল দ্রব্যে স্পৃহা, প্রতিবার বাহ্যের পর রোগী দুর্ব্বল হয় আর কপালে বিন্দু বিন্দু শীতল ঘর্ম্ম হয়, আর সর্ব্ব অঙ্গ যেন অবশ হইয়া আইসে।

টার্টার এমেটিক্ Tartar Emetic ;—রোগীর কষ্ট বিশেষ কিছুই নাই অর্থাৎ নিশ্বাসের কষ্ট, গাত্রদাহ ইত্যাদি সাঙ্ঘাতিক লক্ষণ কিছুই নাই, কিন্তু অধিক বাহ্যে আর বমি হইলে, টার্টার্ এমেটিক্ দেওয়া যায়।

নক্সভমিকা Nux vomica ;—মদ্য পান করিয়া, রাত্রি জাগরণে বা অম্লপিত্ত পীড়া জন্য ওলাউঠার সূত্রপাত হইলে নক্সভমিকা দেওয়া আবশ্যক।

ক্যামোমিলা Chamomilla ;—ছেলেদের পেটের দোষে ক্যামোমিলা একটী প্রধান ঔষধ; ইহা ভিন্ন উপবাস, রাগ, দুঃখ, বা অন্য কোন মনের কষ্ট জনিত ওলাউঠা রোগের উৎপত্তি হইলে প্রথমেই ক্যামোমিলা দেওয়া আবশ্যক।

পল্‌সেটিলা Pulsatilla ;—ঘৃতপক্ক বা অন্য কোন তৈলাক্ত দ্রব্য খাইয়া এই রোগের উৎপত্তি হইলে সাধারণতঃ প্রথমেই পল্‌সেটিলা দেওয়া হয়। এরূপ পেটের দোষ রাত্রে বেশী বৃদ্ধি হয়, বাহ্যের রং সবুজ, বাহ্যের সঙ্গে আম থাকে, জীব সাদা, শীত বোধ হয়, কিন্তু গায়ে হাওয়া লাগিলে ভাল বোধ করে, ঘরের ভিতরে থাকিতে কষ্ট বোধ হয়।

এইরূপ লক্ষণ লিখিতেছিলাম, এমন সময় আমার একটী বন্ধু বলিলেন যে, ওলাউঠায় সাধারণতঃ যে সকল ঔষধ প্রয়োগ করা যায়, সেই সকল ঔষধের বিশেষ বিবরণ, অর্থাৎ কোন্ কোন্ স্থলে কোন্ কোন্ লক্ষণে কি কি ঔষধ দেওয়া যায়, ইহা পূর্ব্বের মত অত সংক্ষেপে না লিখিয়া একটু বিশেষ করিয়া লিখিলে পুস্তকখানি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয়। আমি দেখিলাম কথাটী মন্দ নয়। সংক্ষেপে লক্ষণ মোটামুটী এক রকম ছোট বড় সকল পুস্তকেই আছে, তবে ওলাউঠার যে কয়েকটী ভাল ভাল ঔষধ আছে, সেই সকল সম্বন্ধে একটু বিস্তারিত বিবরণ লিখিলে একটু কাজের জিনিষ হয় বটে। অতএব আমি নিজে যতদূর দেখিয়াছি ও পুস্তকে যেরূপ পড়িয়াছি, সেই সকল একটু ভাল করিয়া লিখি।

পূর্ব্বে এক রকম বলিয়াছি, কিন্তু এ স্থলে ওলাউঠার নানা রকম ঔষধের বিশেষ বর্ণনা করিতে হইলে ওলাউঠা রোগটী লক্ষণের রকম অনুযায়ী তিনটী বিশেষ শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে হয়।

SPASMODIC CHOLERA.

অর্থাৎ আক্ষেপিক (খাল ধরা) ওলাউঠা।

Spasmodic স্পাজমোডিক [illegible] আক্ষেপিক, এইরূপ ওলাউঠায় হস্ত পদের আক্ষেপ [illegible] খিল ধরা, আঁকড়ী ইত্যাদি বেশী থাকে। খাইল [illegible] মাংসপেশীর সঙ্কোচ জন্য হয়। মাংসপেশীর সঙ্কোচ ও বিস্তার দ্বারা অঙ্গ প্রত্যঙ্গেরই কার্য্য হইয়া থাকে। যেমন কোন দ্রব্য হস্তে ধরিতে হইলে হস্ত বা অঙ্গুলীর মাংসপেশী প্রথমে বিস্তার করিতে হয়, তাহার পর ঐ সকল মাংসপেশী সঙ্কোচ করিয়া ধরিতে হয়। পক্ষাঘাত ইত্যাদি রোগ হইলে মাংসপেশী ইচ্ছার অধীন থাকে না। অতএব ইচ্ছা হইলেও ঐ অবশ অঙ্গে কোন কার্য্য হয় না, কারণ মাংসপেশী ইচ্ছামত বিস্তারিত ও সঙ্কোচিত হয় না। আর সেই জন্যই সেই অঙ্গের কার্য্য হইতে পারে না। তবে মানুষের অনিচ্ছায়ও মাংসপেশীর কার্য্য হয়। আক্ষেপ, ছেলেদের তড়কা ইত্যাদি মাংসপেশীর অনিচ্ছার কার্য্য। অর্থাৎ ইচ্ছা না করিলেও হাত পায়ে আক্ষেপ অর্থাৎ খাইল ধরিতে থাকে। হস্ত পদের মাংসপেশী যেরূপ অনিচ্ছায় সঙ্কোচিত হয়, অন্যান্য স্থানের মাংসপেশীও সেইরূপ অনিচ্ছায় সঙ্কোচ হওয়া সম্ভব। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ধমনীর ভিতরেও মাংসপেশী আছে। অতএব হাত পায়ের মাংসপেশী যেরূপ আঁকড়াইয়া যায়, ধমনীর মাংসপেশী আঁকড়াইয়াও ধমনীর ভিতরের ছিদ্র সঙ্কোচ করে অর্থাৎ কমায়। আর ধমনীর ভিতরের ছিদ্র কমিলেই ধমনী শক্ত হইয়া উঠে ও তাহার সঙ্কোচিত ছিদ্রের মধ্যে রক্তের চলাচল স্বাভাবিকমত হইতে

পারে না। হৃদ্‌পিণ্ডও সমস্ত হস্তপদের মাংসপেশীর ন্যায় একটী মাংসপেশী মাত্র, অতএব হস্তপদের মাংসপেশী ও ধমনী ইত্যাদির ন্যায় হৃদ্‌পিণ্ডের সঙ্কোচ হয়। আর ঐ সঙ্কোচে হৃদ্‌পিণ্ডের আয়তন কমিয়া যায়, অর্থাৎ যতটুকু রক্ত হৃদ্‌পিণ্ডে স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে, হৃদ্‌পিণ্ড সঙ্কোচ হইয়া উহার আয়তন কমিলে হৃদ্‌পিণ্ডে ততখানি রক্ত আর স্থান পায় না। অতএব হৃদ্‌পিণ্ডের এরূপ অবস্থায় ফুস্‌ফুস হইতে যে রক্ত পরিষ্কার হইয়া হৃদ্‌পিণ্ডের বাঁকুঠরীতে যায় বলিয়াছি, ঐ পরিষ্কার রক্ত আর ততখানি হৃদ্‌পিণ্ডে যাইতে স্থান পায় না। ইহা ভিন্ন হৃদ্‌পিণ্ড সদাই সঙ্কোচিত বলিয়া পিচকারীর ন্যায় শরীরে রক্ত চালাইতে পারে না; কারণ পিচকারীর ন্যায় রক্ত চালাইতে হইলে একবার বিস্তার তাহার পরে সঙ্কোচ হওয়া আবশ্যক, কিন্তু হৃদ্‌পিণ্ড কেবল সদাই সঙ্কোচভাবে থাকাতে হৃদ্‌পিণ্ডের ওরূপ উভয়কার্য্য হইতে পারে না, অতএব হৃদ্‌পিণ্ড যেন একেবারে কেহ চাপিয়া ধরিয়া রহিয়াছে এরূপ দাঁড়ায়। আর হৃদ্‌পিণ্ড ধমনীর ভিতর সমুচিত রূপ রক্ত সঞ্চালন করিতে না পারিলেই ধমনী এক প্রকার রক্তশূন্য হইয়া পড়িল। আর হৃদ্‌পিণ্ড স্বাভাবিক অবস্থায় থাকিয়া রক্ত সঞ্চালন করিতে পারিলেও ধমনী সকল নিজে সঙ্কোচিত বলিয়া আয়তন কম, অতএব রক্ত সমুচিত ধারে সঞ্চালিত হইয়া হৃদ্‌পিণ্ড হইতে আসিলেও ধমনীর ঐরূপ সঙ্কোচিত, অপ্রশস্ত ছিদ্র দিয়া আসিতে পারিত না।

আর অপরিষ্কার রক্ত শরীর হইতে প্রথমতঃ হৃদ্‌পিণ্ডের ডান দিকে আসিয়া পল্‌মোনারী আর্টারী দিয়া পরিষ্কার হইবার জন্য

ফুস্‌ফুসে আইসে। পল্‌মোনারী আর্টারীতেও মাংসপেশী আছে, অতএব পল্‌মোনারী আর্টারীর অর্থাৎ ফুস্‌ফুসের ধমনীর স-ঙ্কাচ জন্য হৃদ্‌পিণ্ড হইতে ফুস্‌ফুসে পরিষ্কারের জন্য প্রচুর পরিমাণে রক্ত যাইয়া পৌঁছে না, আর সেই জন্য ফুস্‌ফুসের কোলাপ্স হয় অর্থাৎ ফুস্‌ফুস্‌ নেতা পেতা হইয়া পড়ে। আর নেতা পেতা হইয়া পড়িলে প্রচুর পরিমাণে হাওয়া ফুস্‌ফুসের ভিতর যাইতে পারে না, কারণ ফুস্‌ফুস্‌ নেতা পেতা হইয়া পড়াতে ফুস্‌ফুস আয়তনে কম হইয়াছে। অতএব রোগী ইচ্ছামত প্রচুর পরিমাণে নিশ্বাস টানিয়া লইতে পারে না। কাজে কাজেই রোগী হাঁপায়।

শরীরের ভিতরের অবস্থা এইরূপ হইলে একবার ভাবিয়া দেখা উচিত যে, এ অবস্থায় রোগীর বাহ্যিক অবস্থা কি কি আর কিরূপ হইবে?

হাতে পায়ে খাল ধরা, রোগীর নিশ্বাস লইতে কষ্ট, ধমনী সঙ্কোচ হওয়াতে রক্তের জলীয় অংশ বাহির হইয়া আসে, অতএব এ দিকে যেরূপ জলের ন্যায় বাহ্যে ও বমি, তেমনই গাত্র দিয়া রক্তের জলীয় অংশ ঘামের আকারে নির্গত হইতে থাকে। রক্তের চলাচল প্রচুর পরিমাণে হইতেছে না, নিশ্বাস প্রশ্বাসের কার্য্যও ভালরূপ চলিতেছে না, সেই জন্যে রোগী সদাই অস্থির। নাড়ী মৃদু ও শক্ত, অতএব স্প্যাস্‌মডিক্‌ কলেরা অর্থাৎ আক্ষেপিক ওলা উঠায় কম বেশ এই সমস্ত লক্ষণই হইয়া থাকে।

একটী কথা বলা আবশ্যক। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, মাংসপেশীর সঙ্কোচ জন্য হাতে পায়ে খাল ধরা ইত্যাদি ঘটিয়া থাকে। হাত পায়ের মাংসপেশীর সঙ্গে সঙ্গে সমভাবে ধমনীর মাংসপেশীর সঙ্কোচ হইলে রোগীর হাত পায়ে খাল ধরাও যেরূপ থাকিবে, ধমনীর

মাংস পেশীর সঙ্কোচ জন্য নাড়ী মৃদু, শক্ত অধিক পরিমাণে শীতল, ঘর্ম্ম, নিশ্বাস প্রশ্বাস আটকাইয়া আসা প্রভৃতি লক্ষণ, হাত পায়ে খাল ধরার ন্যায় সমভাবে থাকিবে। কিন্তু সকল রোগীর সকল সময় সকল মাংসপেশী সমভাবে সঙ্কোচিত হয় না, হয়ত হাত পায়ের মাংসপেশীর সঙ্কোচ বেশী, আর রোগীরও তজ্জন্য নাড়ী শক্ত ও নিশ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট অপেক্ষা হাতে পায়ে খাল ধরা বেশী। তেমনই ধমনী সমস্তের মাংসপেশীর বেশী সঙ্কোচ হইলে সে রোগীর হাতে পায়ে খাল ধরা তত বেশী থাকে না, কিন্তু রোগী হাঁপায় বেশী, অস্থির বেশী, নাড়ীরও অবস্থা বেশী খারাপ। অতএব হাতে পায়ে খাল ধরা ইত্যাদি বাহ্যিক আক্ষেপ বেশী পরিমাণে না থাকিলেও রোগীর হাঁপানি ও নাড়ীর অবস্থা দেখিয়া আক্ষেপিক ওলাউঠার নিরূপণ করা যায়।

আরও বলা আবশ্যক, যে, কোন কোন সময়ে এই প্রকার ওলাউঠায় অধিক বাহ্যে হয় না, কিন্তু রোগীর দুই একবার বাহ্যের পরই হৃদ্‌পিণ্ড ইত্যাদির সঙ্কোচ জন্য রোগী হাঁপাইতে থাকে, আর তাহার পরই হয়ত ঐ হাঁপানিতেই শ্বাস উপস্থিত হয়। আর না হয়ত খোলাপ্স হয়।

NON-SPASMODIC CHOLERA.

অর্থাৎ অনাক্ষেপিক (কলেরা) ওলাউঠা।

এ প্রকার ওলাউঠায় বাহ্যে বমি হইয়াও রোগীর কষ্ট বেশী থাকে না, রোগীর হাতে পায়ে খাল ধরা থাকিলেও হৃদ্‌পিণ্ড এবং ধমনী ইত্যাদির সঙ্কোচ জন্য নাড়ী বসিয়া যায় না, শীতল

ধর্ম্ম হওয়া, রোগীর নিশ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট কিছুই থাকে না। হাতে পায়ে খাল ধরা থাকিলেও হৃদ্‌পিণ্ড ও ধমনী ইত্যাদির সঙ্কোচ হয় না, নাড়ীও সূক্ষ্ম ও শক্ত হয় না। অনাক্ষেপিক ওলাউঠার নাড়ী নরম ও চাপিলে যেন একেবারে আর নাড়ী পাওয়া যায় না। এই ওলাউঠায় রোগী হঠাৎ নীলবর্ণ হইয়া যায় না, অনাক্ষেপিক ওলাউঠায় রোগীর খাল ধরা থাকে বটে, তবে এ খাল ধরা অধিক বার বাহ্যে বমি হওয়ার পর দুর্ব্বলতা জন্য হইয়া থাকে; কিন্তু আক্ষেপিক ওলাউঠায় বাহ্যে বমির সঙ্গে সঙ্গেই কোন স্থলে বাহ্যে বমির পূর্ব্বেই হাতে পায়ে অসহ্য খাল ধরিতে আরম্ভ হয়, আর ঐরূপ খাল ধরার সঙ্গে সঙ্গেই রোগী নিশ্বাস প্রশ্বাস লইবার কষ্ট অনুভব করে, অনাক্ষেপিক ওলাউঠায় নিশ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট প্রথমে মোটেই থাকে না, তবে অধিকবার বাহ্যে বমি হওয়াতে দুর্ব্বল হইয়া ঐ দুর্ব্বলতার জন্য যে নিশ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট হয় সে স্বতন্ত্র কথা। মানুষ অধিক দিন পুরাতন রোগে পীড়িত হইয়া যে নিশ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট হয়, অনাক্ষেপিক ওলাউঠার নিশ্বাস প্রশ্বাসের কষ্টও সেইরূপ। আর পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অনাক্ষেপিক ওলাউঠায় হাতে পায়ে খাল ধরা বা আঁকড়ি হওয়া মাংসপেশীর দুর্ব্বলতা জন্য হইয়া থাকে। আক্ষেপিক ওলাউঠার ন্যায় এ খাল ধরা মাংসপেশীর সঙ্কোচ জন্য নহে। আর সেই জন্যই অনাক্ষেপিক ওলাউঠায় খাল ধরার সঙ্গে সঙ্গে নিশ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট থাকে না, কারণ নিশ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট হৃদ্‌পিণ্ড ও ধমনীর সঙ্কোচ জন্য হইয়া থাকে, অতএব অনাক্ষেপিক ওলাউঠায় কোন মাংসপেশীর সঙ্কোচ হয় না বলিয়া হৃদ্‌পিণ্ড ধমনী ইত্যাদির সঙ্কোচ

জন্য রোগীর যে নিশ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট, অস্থিরতা ইত্যাদি লক্ষণ হয়, তাহা অনাক্ষেপিক ওলাউঠায় থাকে না। সকল প্রকার ওলাউঠার মধ্যে এই প্রকার ওলাউঠাই সর্ব্বাপেক্ষা কম সাংঘাতিক। আর ইহাতে হঠাৎ কোন মারাত্মক লক্ষণ হইয়া রোগী অল্প সময়ে মারা যায় না। এরূপ ওলাউঠায় রোগী প্রায়ই বাঁচে। আর মারা পড়িলেও এই ব্যায়ারামে একটু বেশী ভুগিয়া পরে অন্যান্য উপসর্গে রোগীর প্রাণনাশ হইয়া থাকে।

PARALYTIC CHOLERA.

প্যারালিটিক কলেরা।

এ শ্রেণীর ওলাউঠায় দুই একবার বাহের পরই অথবা দুই একবার বাহের সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত শরীর একেবারে যেন অবশ হইয়া আইসে। এরূপ ওলাউঠায় শরীরের মাংসপেশীর বিকৃতি অধিক না হইয়া স্নায়ুর বিকৃতি কিছু বেশী হয়। আক্ষেপিক ওলাউঠায় যে সকল লক্ষণ উপস্থিত থাকে, প্যারালিটিক ওলাউঠাতেও অনেকটা সে রকম লক্ষণই হয়। তাহার বিশেষ কারণ এই যে, আক্ষেপিক ওলাউঠায় হৃদ্‌পিণ্ড ও ধমনীর সঙ্কোচ জন্য শরীরে রক্তের সঞ্চালন স্বাভাবিক মত হয় না, প্যারালিটিক ওলাউঠায় হৃদ্‌পিণ্ড ও ধমনী ইত্যাদির অবশতা জন্য রক্তের চলাচল ভালরূপ হইতে পারে না। অতএব রক্তের চলাচল না হওয়া জন্য যে সকল উপসর্গ হইয়া থাকে, তাহা এই দুই প্রকার ওলাউঠাতেই সমান। আক্ষেপিক ওলাউঠায় হৃদ্‌পিণ্ড ও ধমনীর সঙ্কোচ জন্য রক্তের চলাচল

ভালরূপ হয় না, প্যারালিটিক ওলাউঠায় পূর্ব্বেই বলিলাম যে, হৃদ্‌পিণ্ড ধমনী ইত্যাদি শরীরের সমস্ত মাংসপেশীর অবশতা জন্মে, আর হাত পা ইত্যাদির মাংসপেশী অবশ হইলে যেরূপ স্বাভাবিক মত হাত পা ইত্যাদির কার্য্য হয় না, সেইরূপ হৃদ্‌পিণ্ড ও ধমনী ইত্যাদি অবশ হইলে তাহাদের স্বাভাবিকমত কার্য্য হয় না ও হইতেও পারে না। হৃদ্‌পিণ্ড ও ধমনীর স্বাভাবিক কার্য্য রক্ত সঞ্চালন করা, অতএব সেই রক্ত সঞ্চালনের বিঘ্ন জন্মে; তবে দুইপ্রকার ওলাউঠাই ফলে বা কার্য্যে সমান, কারণ ভিন্ন। আক্ষেপিক ওলাউঠায় হৃদ্‌পিণ্ড ও ধমনীর সঙ্কোচ জন্য রক্ত সঞ্চালন ভালরূপ হয় না, প্যারালিটিক্ ওলাউঠায় হৃদ্‌পিণ্ড ও ধমনী অবশ হইয়া ভালরূপ রক্ত সঞ্চালন করিতে পারে না, অতএব রক্ত সঞ্চালন না হওয়া জন্য যে কয়েকটী লক্ষণ অবশ্যম্ভাবী, সে সমস্ত এই দুই প্রকার ওলাউঠাতেই সমভাবে হইয়া থাকে। অতএব বাহ্যিক লক্ষণ দেখিয়া কি কারণে এই সকল উপসর্গ উপস্থিত হইল স্থির করিতে না পারিলেও হৃদ্‌পিণ্ড ভালরূপ পরীক্ষা করিয়া দেখিলে হৃদ্‌পিণ্ডের অবশ জন্য বা হৃদ্‌পিণ্ডের সঙ্কোচ জন্য এরূপ লক্ষণের উৎপত্তি, তাহা অনেকটা ঠিক করিতে পারা যায়। ইহা ভিন্ন এ ওলাউঠায় কয়েকটী বিশেষ বাহ্যিক লক্ষণ আছে। আর ঐ সকল বাহ্যিক লক্ষণ দ্বারা পীড়ার নিগূঢ় কারণ অনেকটা স্থির করা যায়। এই সকল লক্ষণ নীচে বলিতেছি।

শোকে, ভয়ে আহত হইয়া রোগী যেন হঠাৎ অল্প সময়েই বেশী পীড়িত হইয়া পড়ে, মাথা ঘোরে, মাথা তুলিতে পারে না, চক্ষে ভাল দেখিতে পায় না, কাণে ভাল শুনিতে পায় না, হাত পা যেন একেবারে ভারি, অবশ, নিশ্বাস প্রশ্বাস অনেক কষ্টে

যেন টানিয়া লইতে হয়। নাড়ী দ্রুত ও সূক্ষ্ম, সদাই গা বমি বমি করে, অল্প অল্প ওক তোলে, আর না হয়ত বেশী পরিমাণে বমি হয়, গড় গড় করিয়া পেট ডাকে, সময়ে সময়ে পেটে বেদনা হয়, জলের মত বেশী বাহে হয়, প্রথম বাহে হইতেই হয় ত প্রস্রাব হয় না, আর রোগীর [illegible] বোধ হয়, হাত পা সমস্ত শরীর যেন নীলবর্ণ হইয়া যায় অ[illegible] নাম মাত্র থাকে না। সোজা-সুজী আক্ষেপ একেবারে না থাকিলে রোগীর যদি শীতবোধ হয়, আর হাত পা ইত্যাদি প্রায় সমস্ত শরীর নীলবর্ণ হইয়া যায়, এই অবস্থাতেই এক প্রকার বুঝা যায় যে, রোগীর যখন আক্ষেপ নাই, তখন প্যারালিটিক্ ওলাউঠা ভিন্ন এ সব লক্ষণ আর কোন মতেই উপস্থিত হইতে পারে না।

এই তিন প্রকার ওলাউঠার লক্ষণের কথা মোটামুটি এক রকম বলিবার পর এইরূপ তিন প্রকার ওলাউঠায় যে যে ঔষধ যে যে অবস্থায় প্রয়োগ করিতে হয় সেই সকল কথা বলিবার সময় এই তিন প্রকার ওলাউঠার লক্ষণের বিষয় আরও বিশেষ করিয়া বলিতেছি।

আক্ষেপিক কলেরার ঔষধ ও চিকিৎসা।

সুস্থশরীরে ক্যাম্ফর খাইয়া যে সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়, তদনুযায়ী কর্পূর ওলাউঠায় প্রয়োগ করিতে হইলে আক্ষেপিক কলেরা ভিন্ন অন্য কোন প্রকার ওলাউঠায় প্রয়োগ করা যাইতে পারে না। কর্পূর সুস্থশরীরে খাওয়াইলে তাহার প্রধান লক্ষণ হইতেছে এই যে, রোগীর শীত বোধ হওয়া, নিস্তেজ হওয়া ও অল্প

একটু নিশ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট হওয়া। এই সমস্ত লক্ষণ আক্ষেপিক ওলাউঠা ভিন্ন অন্য কোন প্রকার ওলাউঠায় হয় না। অতএব কোন ব্যক্তির হঠাৎ নিশ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট, হাত পা শীতল বোধ হইলে হাতে পায়ে ও শরীরের অন্যান্য স্থানে নীলা রক্ত জমা জমা, দুই এক বার বাহ্যের পরই যাহার পর নাই নিস্তেজ হইয়া পড়িলে একেবারে কর্পূরের আরক দেওয়া আবশ্যক। কারণ পূর্ব্বোক্ত লক্ষণে বুঝা গেল যে, ইহা একটী আক্ষেপিক কলেরার পূর্ব্ব লক্ষণ। পূর্ব্বেই এক রকম বলিয়াছি যে, কম বেশ সকল প্রকার ওলাউঠাতেই খালধরা থাকে, কিন্তু এ ওলাউঠায় রোগের সূত্রপাত হইতেই আক্ষেপ থাকে।

ডাক্তার হিউজেস্ বলিয়াছেন যে, আদৌ বাহ্যে বমি না হইয়া যদি আক্ষেপ, নিস্তেজতা, নিশ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট থাকে, এ অবস্থাতেও কর্পূরের আরকে বিশেষ উপকার হয়। কর্পূরের আরক আজ কাল বড় বেশী ব্যবহার হইতেছে, অতএব কর্পূরের আরক যে যে অবস্থায় দেওয়া হইয়া থাকে, তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটী রোগীর কথা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

গিরিবালা দাসী ; বয়স ২১ বৎসর ; হঠাৎ রাত্র এগারটা সাড়ে এগারটার সময় হাতে পায়ে অধিক খাল ধরিতে আরম্ভ হইল, তাহার পর রাত্র প্রায় ১২টার সময় ক্রমে পেট ফুলিয়া উঠিল, হাতে পায়ে খালধরা ক্রমেই বৃদ্ধি, রোগীর সকল অঙ্গ শীতল, আর রোগীও শীতে কাঁপিতে লাগিল। রোগী এক প্রকার অজ্ঞান, ভুল বকিতেছে ও শয্যাকণ্টকির ন্যায় বিছানায় ছটফট করিতেছে, শীত যেন আর কোন মতেই ভাঙ্গে না, পরে একটু একটু কম হইতে আরম্ভ হইল, নাড়ী নরম ও সূক্ষ্ম,

এই সময় একটী ডাক্তার আসিয়া, এমন কি রাত্র দুইটার সময় কর্পূরের আরক দুই তিন ফোঁটা করিয়া এক কোয়াটার অন্তর খাওয়াইতে দিলেন। দুই চারিবার খাওয়াইবার পরই রোগী অনেকটা সুস্থ হইল; তাহার পরদিন কর্পূরের মাত্রা অধিক না করিয়া সময় বাড়াইয়া দেওয়া গেল। অর্থাৎ এখন ঐ ঔষধ দুই-ঘণ্টা অন্তর দেওয়া হইতে লাগিল।

নবাব বাড়ীর একটী মিয়াসাহেব; বয়স তখন প্রায় ৫০বৎসর, হঠাৎ এক দিন বৈকালে বেড়াইতে গিয়াছিলেন, পথেই বড় শীত-বোধ হইতে আরম্ভ হইল, মনে করিলেন জ্বর আসিতেছে, বাটী ফিরিয়া আসিলেন ও তাহার পর আমাকে আনাইয়া তাহার সমস্ত অবস্থা কহিলেন। আমিও মনে করিলাম হয়ত জ্বর আসিতেছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আমার কোনরূপ চিকিৎসার সহিত শক্রতা নাই, মনে করিলাম যে, পূর্ব্ব হইতেই রোগীর যখন এত শীত, তখন জ্বরও একটু গুরুতর রকম হইবে। অতএব সোজাসুজী ১০ গ্রেণ কুইনাইন দিয়া রাখা ভাল। ১০ গ্রেণ কুইনাইন দিলাম, তাহার পর দেখি, একঘণ্টা গেল দুই ঘণ্টা গেল এমন কি ৫।৬ ঘণ্টা গেল, রোগীর জ্বরও আসে না, গাও স্বাভাবিকমত গরম হয় না। ক্রমে রোগীর আরও বেশী শীতবোধ হইতে লাগিল, ক্রমেই যেন নাড়ী বসিয়া যায়, দেখিতে দেখিতে রোগীর অবস্থাটী গুরুতর হইয়া দাঁড়াইল। প্রাণে বড় আশঙ্কা হইল। মনে ভাবিলাম, কুই-নাইন দিয়া কি সর্ব্বনাশ করিলাম, ইহা অপেক্ষা জ্বর আসা যে ভাল ছিল, এখন যে রোগী প্রাণে মরে, এমন সময় হঠাৎ মনে হইল যে, হোমিওপ্যাথিক মতে টিংচার ক্যাম্ফর বা

স্যাচুরেটেড্ স্পিরিট ক্যাম্ফর দিলে, এরূপ অবস্থায় উপকার হইয়া থাকে। তখন আধঘণ্টা অন্তর তিন ফোঁটা করিয়া স্পিরিট দিতে আরম্ভ করিলাম। এইরূপে স্পিরিট ক্যাম্ফর পাঁচ সাত বার দিবার পরই রোগীর অবস্থা উত্তরোত্তরই ভাল হইয়া আসিতে লাগিল, পরে নাড়ীরও অবস্থা স্বাভাবিক মত হইল, আর শরীরের উত্তাপও সুস্থ শরীরের ন্যায় হইয়া দুই এক দিনের মধ্যেই মিয়া সাহেব বেশ ভালরূপ আরোগ্য হইলেন।

নবীনকালি দেবী ;—বয়স ২৩ বৎসর, বিধবা, পূর্ব্ব হইতেই অম্বলের পীড়া আছে। একদিন প্রাতঃকাল হইতেই মাথা ঘুরিতে লাগিল, কাণে ভোঁ ভোঁ শব্দ, গা বমি বমি আর পেটে অসহ্য বেদনা। পরে সাতটার সময় দুই তিনবার বমি করাতে কেবল পিত্তিগোলা জলের মত পড়িতে লাগিল, তাহার পর আমি যাইয়া দেখি যে, সর্ব্ব শরীর একেবারে বরফের ন্যায় শীতল, নাড়ীর এলো মেলো গতি, অনেক কষ্টে নাড়ী গুণিয়া দেখিলাম, নাড়ীর বীট এক মিনিটে ১২০, তখন আর বমি হইতেছে না, কিন্তু সদাই ওক তুলিতেছে। স্যাচুরেটেড্ স্পিরিট ক্যাম্ফর এক কোয়াটার অন্তর দিতে আরম্ভ করিলাম; এইরূপে স্পিরিট ক্যাম্ফর দুইঘণ্টা দিবার পর নাড়ীর অবস্থা একটু যেন ভাল বোধ হইতে লাগিল, ক্রমে ঔষধ আধঘণ্টা অন্তর দিতে বলিলাম, পরে একটার সময় যাইয়া দেখি, বমি আর হয় নাই, গা বমি বমি কি ওক তুলাও নাই, পেটের বেদনাও কমিয়াছে, তবে মধ্যে মধ্যে বেদনা ধরিতেছে। শিরঃপীড়াও অনেক কম, পিপাসা অধিক। স্পিরিট ক্যাম্ফর এক কি দুই ঘণ্টা অন্তর দিতে বলিলাম। তাহার পরদিন যাইয়া দেখি, অন্যান্য লক্ষণে রোগীটী অনেকটা

ভালই আছে, তবে পেটে সামান্য বেদনা আছে, তবে পেটে ভার বড় বেশী। মধ্যে মধ্যে একটু একটু গা বমি বমি করে। এখন স্পিরিট ক্যাম্ফর চারিঘণ্টা অন্তর দিতে বলিলাম। তাহার পরদিন অর্থাৎ তৃতীয় দিনের দিন বৈকালে যাইয়া দেখি রোগীটী বিলক্ষণ সুস্থ আছে, বসিয়া কথা বার্ত্তা কহিতেছে।

ব্রহ্মময়ী দাসী, একটী নর্স (Nurse). একটী ওলাউঠা রোগীর শুশ্রূষা করিবার জন্য ক্রমাগত দুইদিন দুইরাত্র জাগিয়া ঐ রোগীটীকে পথ্য ঔষধ দেওয়া ইত্যাদি শুশ্রূষায় ব্যস্ত থাকায় নিজের আহারাদি সম্বন্ধে ভালরূপ মনোযোগ করেন নাই। তৃতীয় দিনের দিন রাত্রে রোগীর নিকট ঐরূপ বসিয়া আছেন, এমন সময় ব্রহ্মময়ী ভ্রমি গিয়া হঠাৎ পড়িয়া গেলেন। আর তাহার পরই ব্রহ্মময়ী একেবারে অজ্ঞান; শীতে ঠক্ ঠক্ করিয়া গা কাঁপিতে লাগিল ও দাঁতের উপর দাঁত পড়িতে লাগিল। দশটার সময় এরূপ ঘটনা হয়, রাত্র এগারটার সময় ব্রহ্মময়ী বমি করিতে লাগিলেন, হাতে পায়ে খাল ধরিতে লাগিল, পেটে এবং প্রায় সর্ব্ব শরীরেই বেদনা, পেটে কি গায়ে হাত দিলে অজ্ঞান অবস্থাতেই খুব চীৎকার করিয়া উঠে। প্রায় রাত্র দুইটা কি আড়াইটার সময় যাইয়া দেখি রোগী বিছানায় গড়াগড়ি দিতেছে। বমি আর থামে না, তখন একটু একটু কথা কয়, বলিল "পেটে এত শীত যে পেটের ভিতরে যেন কে বরফ রাখিয়া দিয়াছে।" স্পর্শ করিয়া দেখিলাম বাস্তবিকই তাহার মুখ, হস্ত, পদ, সর্ব্ব অঙ্গই বরফের ন্যায় শীতল, আর রক্তবিহীন হইয়া যেন এক রকম ফ্যাকাসে সিটা সিটা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু জিব একটু গরম, নাড়ী এক মিনিটে ১০৪, কিন্তু নাড়ীর গতি ভাল নয়,

এলো মেলো, অস্থির, এক কোয়াটার অন্তর স্যাচুরেটেড স্পিরিট ক্যাম্ফর দেওয়া হইতে লাগিল। দুইবার ঔষধ দিবার পরই রোগী ঘুমাইয়া পড়িল, আর রাত্র চারিটা হইতে বেলা আটটা পর্য্যন্ত নিদ্রিত অবস্থায় থাকে। নিদ্রা হইতে উঠিবার পর বমি আর হয় না, কিন্তু বাহে হইতে আরম্ভ হইল। আর বাহেও পাতলা জলের ন্যায়, পেটে আবার সেই বেদনা, আর বাহের সহিত প্রস্রাব হয় না। তখন মনে ভাবিলাম দুই চারি মাত্রা ভেরেট্রম এল্‌বাম্ দেওয়া আবশ্যক, অতএব আধঘণ্টা অন্তর প্রায় দুই তিন ঘণ্টা পর্য্যন্ত ভেরেট্রম দিয়া কোনই কাজ হইল না দেখিয়া মনে করিলাম যে, এ অবস্থায় ক্যাম্ফর দিলেই বিশেষ উপকার হওয়া উচিত। তখন পুনরায় ক্যাম্ফর দিতে আরম্ভ করিলাম। আর তাহার পরদিন ক্যাম্ফর প্রয়োগেই রোগী বিলক্ষণ সুস্থ হইল।

কুলপ্রদীপ বোস;—বয়স ২৬ বৎসর, হঠাৎ রাত্র চারিটার সময় পাতলা জলের ন্যায় বাহে হইতে লাগিল, ঐরূপ জলের মত বমি, আর একবার বাহের পর হইতেই পেটে বেদনা ধরিল; আর তাহার পরই কম্প উপস্থিত হইল, আর যেমন বাহে তেমনই বমি তেমনই পিপাসা, নিশ্বাসের হাওয়া পর্য্যন্ত শীতল, সর্ব্ব শরীর শীতল, মণিবন্ধে নাড়ী সূতার ন্যায় সূক্ষ্ম, বাহের সঙ্গে প্রস্রাব আর হইতেছে না। ফলতঃ সমস্ত লক্ষণে রোগটী গুরুতর হইয়া উঠিল। আমি সকালে যাইয়া দেখি রোগীর আত্মীয়েরা আমার যাইবার পূর্ব্ব হইতেই স্পিরিট ক্যাম্ফর খাওয়াইতে আরম্ভ করিয়াছেন। আমিও যাইয়া দেখিলাম স্পিরিট ক্যাম্ফরই তাহার ঔষধ। অতএব তাহাকে এক কোয়াটার অন্তর

স্পিরিট ক্যাম্ফরই দিতে বলিলাম। বেলা তিনটা পর্য্যন্ত ঐ স্পিরিট ক্যাম্ফরই দেওয়া হইতে লাগিল, আর তিনটার সময় যাইয়া দেখি যে, বেলা দশটা হইতে তিনটা পর্য্যন্ত কেবল দুইবার বমি হইয়াছে আর বমিতে তত কষ্ট নাই। নাড়ীও একটু ভাল বোধ হইল। তাহার পর দুই একমাত্রা ইপিকাকুয়ানা দেওয়াতেই বমি নিবারণ হয়, তাহার পর ঐ রোগীকে নক্সভমিকা দিতে হয়।

এইরূপ অনেকানেক রোগী সুধু ক্যাম্ফর দিয়াই আরোগ্য হইয়াছে। যাহা হউক, এ বিষয়ের আর বেশী দৃষ্টান্ত না দিয়া অন্যান্য ঔষধের কথা বলি।

HYDROCYANIC ACID AND ARSENIC.

হাইড্রোসিয়ানিক্ এসিড্ ও আর্সেনিক।

এইরূপ আক্ষেপিক ওলাউঠায় স্পিরিট ক্যাম্ফর ভিন্ন হাইড্রোসিয়ানিক্ এসিড আর আর্সেনিক ব্যবহার হয়। হাইড্রোসিয়ানিক এসিড ও আর্সেনিক খাইয়া বিষাক্ত হইয়া যে যে লক্ষণে লোক মরে সেই সকল লক্ষণ বিশেষ করিয়া দেখিলে এ দুইটী ঔষধ আক্ষেপিক ওলাউঠার লক্ষণের সঙ্গে মিলে। ডাক্তার রসেল Russell হাইড্রোসিয়ানিক এসিড প্রথম ওলাউঠায় ব্যবহার করিয়া দেখেন যে, আক্ষেপিক ওলাউঠায় হাইড্রোসিয়ানিক এসিড একটী মহৌষধ।

হাইড্রোসিয়ানিক এসিড একটী ভয়ানক বিষ। হাইড্রোসিয়ানিক এসিড খাইয়া যে যে লক্ষণ হয় এস্থলে একটু বলা আবশ্যক। একটী ২২ বৎসর বয়সের স্ত্রীলোক অন্য ঔষধ ভ্রমে

প্রায় ১ গ্রেণ হাইড্রোসিয়ানিক এসিড খাইয়া ফেলে। ঔষধ খাইবার সময় তিনি একখানি কেদারায় বসিয়াছিলেন, এই ঔষধটী গলাধঃ হইবার পরই তিনি লম্ফ দিয়া কেদারা হইতে উঠিলেন আর কতক্ষণের জন্য দৌড়াইয়া বেড়াইতে লাগিলেন। আর দৌড়াইতে দৌড়াইতে নিশ্বাস প্রশ্বাসের ভয়ানক কষ্ট উপস্থিত হইল, হঠাৎ অজ্ঞান অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া গেলেন, তৎপরেই হাত পা ইত্যাদির আক্ষেপ হইয়া খেঁচিতে আরম্ভ করিল। সর্ব্বাঙ্গেই আক্ষেপ, এমন কি মুখ পর্য্যন্ত বাঁকিয়া গেল, আর মাথাটি বাঁকিয়া ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িল। তখন কয়েকজন লোক তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিল; ডাক্তারের জন্য পূর্ব্বেই লোক গিয়াছিল, আর ঐ সময় ডাক্তার আসিয়াও পৌছিলেন। ডাক্তার আসিয়া দেখিলেন সমস্ত শরীর আক্ষেপে শক্ত মক্ত হইয়া গিয়াছে। সমস্ত মুখখানি ফুলিয়া উঠিয়াছে, আর সমস্ত মুখ যেন রক্ত ভরা ভরা, দাঁতে দাঁত লাগা, মুখে ফেণা উঠিতেছে, অর্দ্ধ মুদ্রিত চক্ষু, চক্ষের পুতলী বড়, আর একপ্রকার সংজ্ঞাশূন্য, চক্ষের নিকট আলো লইয়া যাইলে চক্ষের যেন কোনরূপ সংজ্ঞা নাই বোধ হয়, আর রোগী এক রকম গোঁ গোঁ করিতেছে, মণিবন্ধে নাড়ী পাওয়া যায় না, হৃদ্‌পিণ্ডে কাণ লাগাইয়া দেখিলে হৃদ্‌পিণ্ড অতি মৃদু ভাবে চলিতেছে দেখা গেল, রোগী ক্রমেই আরও বেশী হাঁপাইতে লাগিল, হস্ত পদ সংজ্ঞাশূন্য, একেবারে কাষ্ঠের ন্যায় নিস্পন্দ; আর প্রথম ঐ বিষ পান করিবার ১৫।২০ মিনিটের মধ্যে রোগীর মৃত্যু হইল। মৃত্যুর পর লাসটী কাটীয়া দেখা গেল মস্তিষ্কের ভিতর বাহিরে কাল রক্তে ভরা, ফুস্‌ফুসে বিস্তর রক্ত জমিয়া

রহিয়াছে। হৃদপিণ্ডের ভিতরেও কাল রক্ত, কিন্তু হৃদ্‌পিণ্ডের ভিতরে তখন রক্ত তরল অবস্থাতেই রহিয়াছে, তখন জমে নাই। হাইড্রোসিয়ানিক এসিড খাইয়া বিষাক্ত হইলে যে যে লক্ষণ হয় তাহা বিস্তারিত বর্ণনা করা গেল। আর ইহাতেই উপলব্ধি হইবে যে আক্ষেপিক ওলাউঠায় প্রথম অবস্থা হইতেই অনেকটা এইরূপ লক্ষণ হয়। আক্ষেপিক ওলাউঠায় কেন? হৃদ্‌পিণ্ডের এইরূপ রোগেও হাইড্রোসিয়ানিক এসিড একটী ভাল ঔষধ। অসহ্য পেটের বেদনাতেও হাইড্রোসিয়ানিক এসিড দিলে বেশ কাজ হয়। ডাক্তার Pareira পেরিয়ারা সাহেব বলিয়াছেন যে, একটী স্ত্রীলোকের আহারের পর বেলা দুইটার সময় পেটে শূল বেদনা হইত, আর ঐ শূল বেদনা প্রায় রাত্র ৮।৯টা পর্য্যন্ত সমভাবেই থাকিত। পরে বেশী রাত্রে বেদনা কমিয়া যাইত। এই স্ত্রীলোকটীকে ডাক্তার পেরিয়ারা সাহেব ডাইলিউট হাইড্রোসিয়ানিক এসিড পাঁচ ফোঁটা বেদনার সময় খাওয়াইয়া দেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, এক মাত্রা ঔষধ খাওয়াইবার আধ ঘণ্টা পরেই জল দিয়া আগুণ নিভাইবার মতন বেদনা একেবারে কমিয়া গেল। আর আজও কমিল কালও কমিল। বাস্তবিক অম্লশূলে হাইড্রোসিয়ানিক এসিড একটী বেশ ভাল ঔষধ।

ডাক্তার রসেল লিখিয়াছেন যে, একটী লোকের হঠাৎ নিশ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট উপস্থিত হয়, আর ক্রমে ঐ কষ্ট এরূপ বাড়িল যে, হৃদ্‌পিণ্ডের কার্য্য যেন ক্রমেই কম হইয়া আসিল, রোগীটী মরণাপন্ন। ডাক্তার রসেল যাইয়া দেখিলেন যে রোগীটীর প্রায় ঊর্দ্ধশ্বাস উপস্থিত, এখন মরে তখন মরে। ডাক্তার সাহেব মনে করিলেন যে, রোগীটীর রক্ষা পাইবার আর কোন সম্ভাবনা নাই।

তথাপি হাইড্রোসিয়ানিক এসিড দুই এক মাত্রা দিয়া দেখা আবশ্যক। অতএব হাইড্রোসিয়ানিক এসিড ৩ এক ফোঁটা মাত্রায় দশ মিনিট অন্তর দিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপ পাঁচ সাত বার ঔষধ দিবার পর রোগীটী প্রায় সুস্থ হইল, সেরূপ নিশ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট আর নাই।

এই যে দুইটী দৃষ্টান্তের কথা বলিলাম, ইহাতে জানা যাইতেছে যে, পাকস্থলী ও হৃদ্‌পিণ্ড উভয়ের কষ্টেই হাইড্রোসিয়ানিক এসিড প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার হয়।

আক্ষেপিক ওলাউঠায় পাকস্থলীর ও হৃদ্‌পিণ্ডের বিকৃতি গুরুতর লক্ষণ। অতএব হাইড্রোসিয়ানিক এসিড আক্ষেপিক ওলাউঠায় একটী বিশেস ঔষধ হওয়া উচিত।

ডাক্তার পেরিয়ারা সাহেব লিখিয়াছেন যে, ক্লোরোডাইন নামক যে ওলাউঠার একটী পেটেণ্ট ঔষধ আছে, তাহাতেও সময়ে সময়ে ওলাউঠার বিশেষ উপকার হয়। পেরিয়ারা সাহেব বলেন যে, ক্লোরোডাইনের প্রধান ঔষধ হাইড্রোসিয়ানিক এসিড আর অহিফেন, আর সেইজন্যই ক্লোরোডাইনে ওলাউঠার এত বেশী উপকার হয়। অহিফেন একটী প্রধান ধারক ঔষধ। অহিফেনে পাতলা বাহ্যে ও বমি কমে, আর হাইড্রোসিয়ানিক এসিডে পাকস্থলীর উদ্দীপনা বা বিকৃতি নিবারণ করে ও হৃদ্‌পিণ্ডে শক্তি সঞ্চালন করিয়া নিশ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট দূর করে। পরে অহিফেনের কথা বিশেষ করিয়া বলিব।

ডাক্তার Salzar স্যালজার সাহেব লিখিয়াছেন যে, তাঁহার বিশ্বাস যে রীতি রক্ষার মতন সমস্ত ওলাউঠায় Saturated Spirit Camphor না দিয়া হাইড্রোসিয়ানিক এসিড দিলে

অধিক ফল পাওয়া যায়। এমন কি, মহাত্মা Hahnemann হানিমান্ হাইড্রোসিয়ানিক এসিডের বিষয় তখন ভালরূপ জানিলে ওলাউঠারোগে ক্যাম্ফর ব্যবস্থা না করিয়া বোধ হয় হাইড্রোসিয়ানিক এসিডই ব্যবহার করিতেন। তবে হাইড্রোসিয়ানিক এসিড সম্বন্ধে আর একটী কথা আছে। হাইড্রোসিয়ানিক এসিডের উপকার অধিকক্ষণ স্থায়ী নয়। হাইড্রোসিয়ানিক এসিড প্রয়োগ করিবার পর হয়ত ২।৩ মিনিটের মধ্যেই রোগীর লক্ষণ ও নাড়ী অনেকটা ভাল বোধ হয় বটে। কিন্তু ও অবস্থা অনেকক্ষণ থাকে না। অতএব হাইড্রোসিয়ানিক এসিড দিয়া একবার উপকার প্রাপ্ত হইলে হয় ত পাঁচ সাত দশ মিনিট অন্তর ঐ ঔষধটী ক্রমাগত দিতে হয়।

ডাক্তার স্থালজার সাহেব বলেন যে, হাইড্রোসিয়ানিক এসিডটী অতি চমৎকার বটে, কিন্তু উহার উপকার অধিকক্ষণ স্থায়ী নয় বলিয়া তিনি হাইড্রোসিয়ানিক এসিডের স্থলে Cyanide of Potassium সাইওনাইড অব পোটাসিয়ম ব্যবহার করিয়া থাকেন।

স্থালজার সাহেব তাঁহার ওলাউঠার পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, যে সাইওনাইড অব পোটাসিয়ম না দিলে তিনি হয় ত অনেক রোগীকে বাঁচাইতে পারিতেন না। তিনি লিখিয়াছেন যে, অনেক খারাপ রকম ওলাউঠায় হাইড্রোসিয়ানিক এসিড দিবার পরই দুই তিন মিনিটের মধ্যেই নাড়ী একটু জোর বাঁধে, রোগীর অবস্থা একটু ভাল হয়, আর ঐ দুই তিন মিনিটের পরই আবার রোগী খারাপ হইয়া পড়ে। এইরূপ যত বার হাইড্রোসিয়ানিক এসিড দেন, ততবারই রোগী একটু ভাল হয়, আবার কিছুক্ষণ পরেই খারাপ হইয়া পড়ে। এ অবস্থায় সাইওনাইড অব পোটাসিয়ম ৩

এক গ্রেণ বা দুই গ্রেণ ১৫।৩০ মিনিট অন্তর দিলে ঐরূপ উপকার হইয়া সে উপকার স্থায়ী হয়। অতএব মনে রাখা আবশ্যক :যে হাইড্রোসিয়ানিক এসিড দিয়া যদি উপকার স্থায়ী না হয়, তাহা হইলে বারে বারে হাইড্রোসিয়ানিক এসিড আর না দিয়া সাইও-নাইড্ অব পোটাসিয়ম ট্রাইটিউরেশন ৩ এক গ্রেণ কি দুই গ্রেণ মাত্রায় ১৫। ৩০ মিনিট অন্তর দেওয়া আবশ্যক।

আর্সেনিক।—আর্সেনিক খাইয়া যে যে লক্ষণ হয়, তাহার সঙ্গে ওলাউঠার লক্ষণে অনেকটা মিলে। তবে আর্সেনিক খাইয়া ওলাউঠার ন্যায় সাদা চেলুনী জলের ন্যায় বাহে হয় না। আর্সেনিক খাইয়া বাহে হয় বটে, কিন্তু সে বাহে হয় ত কাল নয় ত সবুজ রং, আর বাহেতে মল থাকে। অতএব কয়েকটী লক্ষণে আর্সেনিক আর ওলাউঠার লক্ষণে সৌসাদৃশ্য নাই, তবে আর্সেনিকের বিষে সকল শরীরে সকল সময়ে সমান লক্ষণ উৎপাদন করে না, অতএব আর্সেনিক খাইয়া পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তির যেরূপ লক্ষণ হয়, তাহার দুই তিনটী ব্যক্তির বিষয় নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

একটী দশ বৎসরের মেয়ে প্রায় দুই আউন্স আর্সেনিক খায়, রাত্রে ঐ বিষ খাইবার পর সমস্ত রাত্রই মেয়েটী ছট্‌ফট্ করে, পেটে অল্প অল্প :বেদনা বোধ করে, তাহার পর দিন প্রাতে বমি করিতে আরম্ভ করিল ও অসহ্য পিপাসা, আর তখন পেটের বেদনাও অনেক বাড়িল। তাহার পর সমস্ত দিনের মধ্যে বাহে ও বমি ক্রমাগত হইতে লাগিল, হাত পা ঠাণ্ডা আর সমস্ত শরীরের চামড়া যেন চুপ্সাইয়া গিয়াছে। তাহার পর ঐ দিন রাত্রে সমস্ত লক্ষণ কমিয়া মেয়েটী অনেকটা ভাল রহিল, রাত্রে

বেশ নিদ্রা হইল, তবে মধ্যে মধ্যে ঘুম ভাঙ্গিয়া তৃষ্ণায় কাতর হইয়া জল পান করিয়াছিল। তাহার পর দিন প্রাতে অবস্থা পুনরায় মন্দ হইয়া আসিল, সর্ব্বাঙ্গ বরফের ন্যায় শীতল, আর রোগী যেন তন্দ্রায় আচ্ছন্ন, ক্রমেই শ্বাস উপস্থিত, বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম সর্ব্বশরীরে হইতে লাগিল, নাড়ী আর পাওয়া যায় না, ক্রমে জ্ঞানশূন্য হইয়া কোমা হইল। পরে সেই কোমাতেই মৃত্যু হয়।

আর একটী স্ত্রীলোক স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করিয়া খানিকটা বাজারের সেঁকোবিষ সন্ধ্যায় সময় খায়, রাত্রে ভেদ বমি ইত্যাদি ওলাউঠার সমস্ত লক্ষণ উপস্থিত। সমস্ত রাত্রি এইরূপই রহিল, পরদিন প্রাতে ঐরূপ ওলাউঠার সমস্ত লক্ষণ উপস্থিত, কেবল বমির রং ওলাউঠার বমির ন্যায় সাদা জলের মতন না হইয়া কফিগোলা জলের মতন আধরক্তানী আধরক্তানী, রোগী যেন এক রকম স্তম্ভিত, কথা কহে না, ডাকিলে উত্তর দেয় না। এমন কি পিপাসা খুব অধিক, কিন্তু জল চাহিয়া পান করিতে হইবে বলিয়া, অসহ্য পিপাসা সহ্য করিয়া থাকে। শরীরে আক্ষেপ বা খাল ধবা কিছুমাত্র নাই। নাড়ী ক্রমেই সূতার ন্যায় সূক্ষ্ম, জিব সাদা, পেটের উপর হাত দিলে শিহরিয়া উঠে, ক্রমেই সমস্ত লক্ষণের বৃদ্ধি। তাহার পরদিন সমস্ত শরীরটী বিবর্ণ হইয়া চুপ্সাইয়া গিয়াছে, অঙ্গে যেন কালি ঢালিয়া দিয়াছে, এখন পেটে আর কিছু তলায় না, যা খায় তাই বমি করে, আর, না হয় ত বাহ্যে হয়। বাহ্যে করিবাব সময় কোঁথ পাড়ে, বোধ হয় পেটে অসহ্য বেদনা। তৃতীয় দিনের প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত এ রকম লক্ষণ রহিল, তাহার পর হঠাৎ হাত পা ইত্যাদি সর্ব্বাঙ্গ খেঁচিতে লাগিল, আর ঐ খেঁচুনীতেই মৃত্যু।

একটী তেইশ বছরের পুরুষ হঠাৎ প্রায় দুই আউন্স লাইকার আর্সেনিকেলিস্ খাইয়া ফেলে, আধ ঘণ্টার মধ্যেই বমন আরম্ভ হইল, আর তাহার পরই পাতলা জলের ন্যায় বাহ্যে হয়, ঐ বিষ প্রাতে খাওয়া হইয়াছিল, আর সমস্ত দিন বাহ্যে বমি সমভাবে রহিল। বাহ্যে বমির রং পিত্তের মত সবুজ. সন্ধ্যার সময় হঠাৎ এক বিছানা হইতে অন্য বিছানায় যাইতে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেল, আর তাহার পরেই হাত পায়ে ও সমস্ত শরীরে আক্ষেপ, অর্থাৎ খেঁচিতে লাগিল। হাত পা বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা, আর হাত পায়ে কুল কুল করিয়া ঘাম গড়াইতে লাগিল, সমস্ত শরীরে যেন নীলবড়ি বাটিয়া দিয়াছে, মণিবন্ধে নাড়ী নাই, কেবল বগলে একটু নাড়ী পাওয়া যায়, চোক খোলে পড়িয়া গিয়াছে, স্বর যেন হাঁড়ির ভিতর হইতে বাহির হইতেছে, অসহ্য পিপাসা, পেটে বেদনা, সর্ব্বদাই বমি হইতেছে, কিন্তু এখন জ্ঞানের বৈলক্ষণ্য কিছুই নাই, ক্রমে হাত পায়ের আক্ষেপ বাড়িতে লাগিল, রোগী আর মানুষ চিনিতে পারে না ও মুখের ভিতর পর্য্যন্ত শুষ্ক হইল, এখন আর জ্ঞান নাই, ভুল বকিতেছে, হিক্কা আর হিক্কার অল্প-ক্ষণ পরেই মৃত্যু।

নবাব বাড়ীর একটী ছেলে হঠাৎ ভ্রমে বাজারের সেঁকো বিষ খায়। তাহার প্রায় সমস্ত লক্ষণ আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছিলাম। ছেলেটীর খুড়া ইন্দুর মারিবার জন্য বাজারের সেঁকোবিষ আনিয়া গুঁড়া করিয়া ময়দা আর গুড়ের সহিত কাইয়ের মতন করিয়া একখানি সরায় রাখে, আর খুড়াটীও এমনই অসাবধান লোক যে, ঐ দ্রব্যটী ভাল করিয়া উঠাইয়া না রাখিয়া একখানি চৌকির উপর ফেলিয়া রাখেন। আর ঐরূপ রাখিয়া তাহার খুড়া বৈকালে

গঙ্গার ধারে বেড়াইতে যান। ছেলেটী খুড়ার বেশী প্রিয়, ঐ ঘরে খুড়ার অনুসন্ধানে আসিয়া দেখে যে, সরায় গুড়ের মত কি রহিয়াছে। একটু লইয়া মুখে দেওয়ায় দেখিল বেশ মিষ্ট। সেঁকো বিষের ত কোন স্বাদই নাই, আর সেঁকোবিষ ভিন্ন উহাতে ময়দা আর গুড় ছিল। ছেলেটীও উহাকে একটী খাদ্যদ্রব্য মনে করিয়া প্রায় অর্দ্ধেকটী খায়। এইরূপ ঘটনার প্রায় এক ঘণ্টা পরে পেটে অসহ্য বেদনায় ও নিশ্বাস প্রশ্বাসের কষ্টে ছেলেটী ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল, আর বমি করিতে লাগিল। ছেলেটীর ওরূপ অবস্থা দেখিয়া তাহার বাপ অতিশয় ব্যাকুল হইল বটে, কিন্তু কি কারণে ছেলেটীর এরূপ অবস্থা হইয়াছে তাহার বাপ তখন পর্য্যন্ত কিছুই জানে না। তাহার ২।৩ ঘণ্টা পর সকলেই জানিল যে, সেঁকোবিষ অর্থাৎ আর্সেনিক খাইয়া ছেলেটীর ঐ অবস্থা ঘটিয়াছে। তৎক্ষণাৎ আমার নিকট আসিয়া আমাকে লইয়া গেল, আমি যাইয়া দেখি ছেলেটী শুইয়া আছে, অজ্ঞান, ক্রমাগত চম্‌কাইয়া উঠিতেছে আর বমি করিতেছে। আমি যাইবার পর, ঢাকার সিভিল সার্জ্জন Doctor Medows ডাক্তার মেডোস্‌ও গেলেন, কিন্তু তখন ছেলেটীকে বাঁচাইবার জন্য বিশেষ কোন চেষ্টা করা অনাবশ্যক বিবেচনায় আর কিছু করা হইল না। ছেলেটীরও আর কোন লক্ষণ হইল না, ক্রমেই চম্‌কান বৃদ্ধি হইতে লাগিল, আর চম্‌কায় আর হাঁপায়, আর এইরূপ করিতে করিতে ক্রমে নিস্তেজ হইয়া জীবন শেষ হইল। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি বমি, চম্‌কান আর হাঁপাইয়া উঠা ভিন্ন আর কোন লক্ষণই হয় নাই। বাহ্যের ত নাম মাত্র নাই।

আর্সেনিক অর্থাৎ সেঁকোবিষ খাইয়া যে যে লক্ষণ হয়, তাহার

৪টী দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা গেল। তবে চারিটীতেই পরস্পর বিভিন্নতা আছে বটে, কিন্তু সমস্ত লক্ষণের সমষ্টি ধরিতে হইলে ওলাউঠার লক্ষণের সঙ্গে অনেক মিলে। ইহাও বলা আবশ্যক যে আর্সেনিক খাইয়া যে রবম রঙের বাহে হয়, ওলাউঠায় তাহা হয় না; আর আর্সেনিক খাইলে সময়ে সময়ে একটু জ্বর বোধ হয়, কিন্তু ওলাউঠার প্রথম অবস্থায় কোন সময়েই জ্বর বোধ হইতে দেখা যায় না। ইহা ভিন্ন অন্যান্য সমস্ত লক্ষণে আর্সেনিক অনেকটা আক্ষেপিক ওলাউঠার ঔষধ হওয়া উচিত। তবে একথা সত্য বটে, যে কর্পূর অর্থাৎ ক্যাম্ফর আর হাইড্রোসিয়্যানিক য়্যাসিড যেরূপ সমস্ত লক্ষণে লক্ষণে ওলাউঠার লক্ষণের সহিত মিলে আর্সেনিকের সহিত ওলাউঠার লক্ষণের তত সৌসাদৃশ্য নাই। তবে আর্সেনিক খাইয়া পেটের আঁতুড়ীর বিশেষ উদ্দিপনা (Irritation) হয়, এমন কি পাকস্থলী ও আঁতুড়ীর ভিতরে ক্ষত হইয়া যায়, নিশ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট হয় ও শরীরের ভিতরে রক্ত চলাচল ভালরূপ হয় না। এই তিনটী বিশেষ লক্ষণ বিবেচনা করিয়া এক প্রকার স্থির করা হয় যে, মোটের উপর আর্সেনিক ঔষধটীতে ওলাউঠার কতটা উপকার অবশ্য হওয়া উচিত। কারণ ওলাউঠায় বিশেষতঃ আক্ষেপিক ওলাউঠায় এই তিনটী লক্ষণই প্রবল দেখা যায়। হোমিওপ্যাথি যদি সত্য হয়, আর কোন ঔষধ যদি রোগের লক্ষণে লক্ষণে বিশেষ মিলে তাহা হইলে আর কি ভাবনা থাকে। ওলাউঠার যদি এই রূপ ঔষধ কিছু আবিষ্কৃত হইত তাহা হইলে কি হোমিওপ্যাথি ঔষধে লোক আর মরিত! রোগের সমস্ত লক্ষণের সহিত ঔষধের সহিত মিলিলে রোগ আরোগ্য হইবেই হইবে। যে

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকের একপ বিশ্বাস নাই তাহার হোমিও-প্যাথি চিকিৎসা করাই বিড়ম্বনা। যাহা হউক বলিতেছিলাম যে এ কথটা বলা আবশ্যক যে আর্সেনিকের সমস্ত লক্ষণে ওলা উঠার সঙ্গে মিলুক আর না মিলুক, কোন কোন সময় আসোনক দিয়া একপ উপকার দর্শে যে, চিকিৎসকের মনে হয় যে আর্সেনিকের মত ওলাউঠার ঔষধ বুঝি পৃথীবিতে আর দ্বিতীয় নাই। একবার একটা অল্প বয়স্ক স্ত্রীলোকের চিকিৎসা এক প্রকার রোগীর নিকটে বসিয়াই করিতে ছিলাম। পূর্ব্ব দিন শেষ রাত্র হইতে পীড়ার সূত্রপাত হয়, তাহার পর দিন ৯ কি ১০ টার সময় গৃহস্থেরা দেখিলেন যে সমস্ত লক্ষণ গুলা অতি ভয়ঙ্কর হইয়া উঠল, মেয়েটার ওলাউঠা হইল, মেয়েটীর বয়স তখন ১৩। ৪, জাতিতে মুছলমান, তখন ও বিবাহ হয় নাই। যাহা হউক বেলা ৯।১০ টা হইতে তাহার রীতিমত চিকিৎসা আরম্ভ হইল। নানা রকম ঔষধ দেওয়া হইতে লাগিল কিন্তু কিছুতেই রোগের বাগ মানে না। কখন একটু বা ভাল থাকে আবার খারাপ হইয়া উঠে। এ রূপে সমস্ত দিন গেল, রাত্র উপস্থিত, রোগের এক হিসাবে উত্তরোত্তরই বৃদ্ধি। তাহার পর রাত্র ২টার সময় রোগীকে আর কোন মতে বাঁচান যায় না। শয্যা কণ্টকীর ন্যায় ছট্ ফট্ করিতে লাগিল, ক্রমেই এমন নিস্তেজ ও দুর্ব্বল হইল, যে সর্ব্বাঙ্গে শীতল ঘর্ম্ম, নাড়ীর ত নাম মাত্র ও নাই, সমস্ত শরীর বিবর্ণ, এক প্রকার আচ্ছন্ন ভাবে পড়িয়া আছে, আর মূহুর্মূহুঃ জল খাইবার জন্য হাঁ করিতেছে মৃতের ন্যায় মুখ, নাসিকা চোপ্সান, চোক খোলে পড়িয়াছে, রগ দুটীর সিয়া গিয়াছে, কান শীতল এবং যেন ভিতরে

ঢুকিয়া গিয়াছে; পরে এত জোরে নিঃশ্বাস পড়িতে লাগিল যে রোগীর যেন শ্বাস উপস্থিত। আমিও মনে করিলাম যে আর আধঘণ্টার মধ্যেই মেয়েটী মানব লীলা সম্বরণ করিবে। এমন সময় তাহার একটী আত্মীয় আমাকে বলিলেন, "বাবু, এ রোগে না আপনারা সংক্ষীয়া (আর্সেনিক) দিয়া থাকেন। বাস্তবিক এ রোগীটীকে নানা প্রকার ঔষধ দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু আর্সেনিক দেওয়া হয় নাই। আর ঐ আত্মীয়টী যখন আর্সেনিকের কথা বলিয়া উঠিলেন বাস্তবিক আমিও তখন আর্সেনিক দিব বলিয়াই ভাবিতে ছিলাম। যাহা হউক আর্সেনিক ৬, ছয় আউন্স আন্দাজ জলে তিন ফোঁটা ফেলিয়া উহারই আধ আউন্স ১৫ মিনিট অন্তর দেওয়া হইতে লাগিল। বলিতে কি? এখন মনে হয় যেন ভোজবাজি, তিন বার কি চারি বার এই ঔষধটী দিবার পর রোগী যেন মৃত্যু শয্যা হইতে ঝেড়ে উঠিল। বাস্তবিক রোগী উঠিয়া বসিল না, কিন্তু ও সব লক্ষণের আর কিছুই নাই, রাত্র ৩।৪টার সময় এক প্রকার সমস্ত গৃহস্থ ও আমি নিজে ও আশ্বস্ত হইলাম যে মেয়েটী বাঁচিয়া উঠিল। তাহার পর লক্ষণ বিবেচনায় ৫।৭ দিন চিকিৎসার পর রোগীটী বিলক্ষণ আরোগ্য হইয়া উঠিল।

কালু নামে নবাব বাড়ীর একটী প্রিয় ভৃত্য ছিল। একদিন আমি নিয়মিত সময় প্রাতে নবাব বাড়ী যাইয়া শুনি কালু আর বাঁচে না, কাল রাত্র হইতে কালুর ওলাউঠা হইয়াছে, কাহাকেও কিছু বলে নাই, ক্রমাগত বাহ্যে গিয়াছে, বমি করিয়াছে, আর যত পারিয়াছে আপনি জল খাইয়াছে। রাত্রে কালুর পীড়ার কথা নবাব বাড়ীতে তত খবর হয় নাই, তাহা হইলে

নবাব বাড়ীর যে রকম গতিক হয়ত আমি রাত্রে সচ্ছন্দে ঘুমাইতে পারিতাম না। কালুকে লইয়া সমস্ত রাত্র আমাকে বসিয়া থাকিতে হইত। প্রাতে ও আমাকে ডাকাডাকির তত ধুম ধাম নাই, কারণ নবাব বাড়ীর সকলেই তখন এক প্রকার হতাশ হইয়াছেন যে কালু আর বাঁচিবে না। যাহা হউক, কালু নিজে লোকটী বড় ভাল মানুষ ছিল, আমি মনে করিলাম কালুকে গিয়া একবার দেখি, কালুর ঘরে যাইয়া দেখি, কালুর জ্ঞান বিলক্ষণ আছে, আমি ঘরে প্রবেশ করিবা মাত্রই কালুর একটু হাত ও ঘাড় নড়িল, কালুর ইচ্ছা আমাকে সেলাম করে, কালু পারিল না। কালুর সর্ব্বাঙ্গে ঘর্ম্ম, ঘর্ম্মে যেন কালু স্নান করিয়া উঠিতেছে, কালুর বগলে ও ভাল নাড়ী পাওয়া যায় না, ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতেছে, সমস্ত শরীর যেন চোপ্সাইয়া গিয়াছে, আর যেন কেমন সিটে সিটে, হটাৎ কালুকে দেখিলে আর চিনা যায় না। কালুর বাহ্যে ক্রমাগত হইতেছে, কিন্তু তখন বমি আর তত হয় না, জীব মুখ শুষ্ক, আর আস্তে আস্তে কেবল জল জল করিতেছে। আমি নিজেই কালুকে একটু জল দিলাম, এক চামচ জল খাইয়াই কালু মুখটী বুজিল, বুঝিলাম এক চামচ জলেই কালুর তৃপ্ত হইল, অধিক জলের পিপাসা থাকিলে এক চামচ জল খাইবার পর ও কালু মুখটী খুলিয়া রাখিত। কিরূপে পীড়ার উৎপত্তি, রোগের প্রথম অবস্থায় কি কি লক্ষণ ছিল? এ কথা আর কে বলে। কালু সমস্ত রাত্র একেলা, তাহার কাছে কেহই ছিল না। যাহা হউক, আমি প্রথম মনে করিতেছিলাম কালুকে ভেরেট্রম্ দি, কিন্তু যখন দেখিলাম কালুর পিপাসা অধিক বটে, কিন্তু একেবারে

বেশী পরিমাণে জল খাইতে চাহে না, তখন মনে করিলাম এক-বার আর্সেনিক দিয়া দেখি কিরূপ হয়। ঔষধে কালুর যত উপ-কার হইবে তা ঈশ্বর জানেন। হয়ত কালু বেলা ১১টার সময়ই চক্ষু বুজিবে। যাহাহউক কালুকে বেলা ৯ টার সময় হইতে ১৫ মিনিট অন্তর আর্সেনিক দেওয়া হইতে লাগিল। একটী বড় বোতলে ১২ আউন্স আন্দাজ জল দিয়া আর্সেনিক ছয় ৬ ফোটা দিলাম। আব এ ঔষধেব আধ আউন্স আন্দাজ ১৫ মিনিট অন্তর খাওয়াইতে লাগিল। নবাব বাড়ীর রাবণের পরিবার, অতএব সে স্থানের সমস্ত রোগী দেখিতে আমার প্রায় বেলা ১১টা হইল। মনে করিলাম এখন যাইয়া দেখিব কালু মরিয়া পড়িয়া আছে। কিন্তু কালুর ঘরে যাইয়া আশ্চর্য্য হইলাম। কালু একটু উচ্চৈঃস্বরে আমাকে বলিল সেলাম বাবু, ক্ষুধায় পেট জ্বলিতেছে, কি খাইব। আমি মনে করিলাম আর্সে-নিকে বেশ কাজ হইয়াছে, কিন্তু বোধ হয় আর্সেনিকের একটু য়্যাগ্র্যাভেসন্ (Aggravation) হইয়াছে। হোমিওপ্যাথি ঔষধ বেশী খাইলে ঔষধটী যদি ঠিক হয় তবে প্রথমতঃ পীড়ার অনেক উপসম হয়, তাহার পর পীড়ার অনেকটা লক্ষণের বৃদ্ধি দেখা যায়, আর ঐ রকম বৃদ্ধিকেই য়্যাগ্র্যাভেসন Aggravation বলে। বাস্ত-বিক কালু ঐ ১১ টার মধ্যে প্রায় সমস্ত ঔষধ খাইয়াছে। গরীব লোকের বেয়ারাম হইলে শুশ্রূষার লোক পাওয়া যায় না। তাহা সওয়ায় কালু আর বাঁচিবে না, সকলে এক প্রকার স্থির করিয়াছিল। অতএব কালুকে ঔষধ খাওয়াইবার জন্য যাহাকে নিযুক্ত করিয়া গিয়াছিলাম, সে লোকটী অল্পক্ষণ পরেই কালুকে একেলা রাখিয়া চলিয়া গিয়াছে। আর কালুর

যত পিপাসা হইয়াছে, তত ঐ বোতলের জল একটু একটু করিয়া খাইয়াছে। তখন মনে করিলাম কালু তুমি বাঁচই আর মরই বেলা ২টা পর্য্যন্ত তোমাকে আর কোন ঔষধই দিব না। কালুর জন্য জল সাগু তৈয়ার করিরা ছাঁকিয়া ঐ সাগুর জল ২।৪ চামচে দিবার বন্দবস্ত করিয়া বাড়ী চলিয়া গেলাম। ইচ্ছা ছিল অপরাহ্ন ২টার সময় কালুকে দেখিতে যাইব, আর ঔষধের ব্যবস্থা করিব। কার্য্যবশতঃ তাহা হইল না, অপরাহ্ন চারিটার সময় কালুকে যাইয়া দেখি কালু একটা বাগিস ঠেস্ দিয়া বসিয়া আছে, একটু একটু করিয়া কালু তখন প্রায় দেড় সের সাগুর জল খাইয়াছে। সংক্ষেপে বলি, তাহার পর কালুকে আর কোন ঔষধই দিতে হইল না বিনা ঔষধেই কালু দিন দিন সবল ও সুস্থ হইতে লাগিল। আমি দেখিলাম এ গরীবের উপর ঔষধের বাহাদুরির আর আবশ্যক নাই। ঐ কালু এখন বাঁচিয়া আছে, বিবাহ করিয়াছে, ৩।৪টী ছেলেও হইয়াছে।

ডাক্তার স্যাল্জার (Salzar) সাহেব তাঁহার ওলাউঠার পুস্তকে লিখিয়াছেন যে নীচের কয়েকটী লক্ষণে আর্সেনিক প্রয়োগে বিশেষ উপকার হয়। সে লক্ষণ গুলী এই ;—

অল্প অল্প বাহ্যে, বাহ্যের রং কাল বা সবুজ, বড় দুর্গন্ধ, নীচের পেটে অধিক বেদনা, গুহ্যদ্বারে জ্বালা, প্রতিবার বাহ্যের পর রোগী নিস্তেজ হইয়া পড়া। রাত্রে সমস্ত লক্ষণের বৃদ্ধি হয়, অতিশয় পিপাসা, আর পিপাসা রাত্রে আরও অধিক হয়, পিপাসায় রোগী অল্প জল পান করিয়াই সন্তুষ্ট হয়, রাত্রে রোগী ছট্ ফট্ করে। ইহা সওয়ায় ম্যালেরিয়া প্রবল স্থানে ওলাউঠা হইলে ওলাউঠার সমস্ত লক্ষণের সঙ্গে মিলুক আর না মিলুক, সর্ব্বাগ্রে

আর্সেনিক দেওয়া ভাল। তবে এরূপ অনেক জ্বর আছে যাহার লক্ষণের প্রথম ২।৩দিন পর্য্যন্ত কেবল ভেদ বমি হয়। বাহ্যের রং পাতলা হলুদের মত, রোগের প্রথম হইতে ২।৩দিন একেবারে জ্বরের লেশ মাত্র থাকে না পরে একটু একটু জ্বর আরম্ভ হইয়া ক্রমেই একটু গুরুতর হইয়া উঠে। এরূপ অবস্থায় হ্যালজার সাহেবের মতে আর্সেনিকেই বিশেষ উপকার হওয়া উচিত, কিন্তু আমি এই রূপ পীড়ায় আর্সেনিকে কিছুই ফল পাই নাই, এরূপ অবস্থায় আমি নক্স্ ভমিকা ৩০, ২।৩ঘণ্টা অন্তর প্রয়োগ করিয়া প্রত্যক্ষ ফল পাইয়াছি। এরূপ ফল পাইয়া বাস্তবিক আর্সেনিক অপেক্ষা নক্স্ ভমিকার উপর আমার বিশ্বাস বেশী। আর ম্যালেরিয়ায় ও নক্স্ ভমিকা একটী খুব ভাল ঔষধ। আর যেরূপ জ্বরের কথা কহিলাম ইহা ম্যালেরিয়া প্রদেশেই প্রায় হইয়া থাকে। অতএব আমার বিশ্বাস যে একবার নক্স্ ভমিকা ৩০দিলে এত উপকার পাওয়া যাইবে যে অন্য ঔষধের কথা মনে করিতে আর ইচ্ছা হইবে না। এ স্থলে আর্সেনিক সম্বন্ধে আর একটী কথা বলা আবশ্যক।

Arsenic is not a remedy usually called for in the beginning of diseases. The tendency of the Symptoms is deathward. If you give the drug too soon, in a disease which in itself leads deathward, you may precipitate the result which you are anxious to avoid. I have myself several times made the mistake despite great caution.

Farrington সাহেবের clinical Materia Medicaর এ কথাটী অতি সুন্দর।

বহুদর্শী চিকিৎসকের বোধ হয় যে এ কথাটী যেন একেবারে দৈববাণীর ন্যায় আদেশ। এ কথাটী অক্ষরে অক্ষরে সত্য। আর বাস্তবিক আর্সেনিক একেবারে মূমূর্ষু অবস্থায় প্রয়োগ করিয়াই আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যায়। আমি আর্সেনিক প্রয়োগ করিবার যে কয়েকটী দৃষ্টান্তের কথা উপরে উদ্ধৃত করিয়াছি তাহাতেই বেশ বুঝা যায় যে, ঐ কয়েকটী রোগী যমের ঘর কেন যমের গ্রাস হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে। অধিক দৃষ্টান্ত লিখিলে পুস্তকের আয়তন বাড়িয়া যায়, আর পৃথিবীর লোক নানা রকম, হয়ত পাঠকের মধ্যে অনেকে এরূপ মনে করিতে পারেন যে মিছা কতকগুলা চিকিৎসার দৃষ্টান্ত লিখিয়া পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছেন। এই আশঙ্কায় আর্সেনিক সম্বন্ধে আর দৃষ্টান্ত লিখিলাম না। কিন্তু সেগুলী ও এমনই চমৎকার যে এখনও আমার মনে হয় যে এরূপ রোগী কিরূপে বাঁচিল। যাহাহউক সংক্ষেপে বলি, আর্সেনিকে যদি ঐ রূপে আশ্চর্য্য ফল পাইতে চাহ তবে রোগের ঐ রূপ মূমূর্ষু অবস্থায় আর্সেনিক না দিলে, আর্সেনিকে যে কত উপকার হইতে পারে তাহা প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে না, আর হোমিওপ্যাথি ও যে কি জিনিষ, এত সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম ঔষধে যে মনুষ্য শরীরে কি মহৎ উপকার হইতে পারে তাহা ও জানিলে না। তবে সবিরাম জ্বরে আর্সেনিক ৩০দিয়া জ্বর নিবারণ করা স্বতন্ত্র কথা। তত সংলগ্ন না হইলেও বলিতে কিছু আপত্তি নাই যে সবিরাম জ্বরের আর্সেনিক ৩০ একটা অবর্থ্য মহৌষধি। গাদা গাদা কুইনাইন দিয়া যে ফল না পাওয়া যায় আর্সেনিক ৩০ দিয়া সে ফল হাতে হাতে পাইবে। জ্বরের বিরাম অবস্থায় আর্সেনিক ৩০

দেও সেই দিনেই আর জ্বর আসিবে না। কেমন চমৎকার ব্যাপার! কেমন চমৎকার ঔষধ! না তিক্ত, না কষায়, না দুর্গন্ধ, না খাইতে কোন রূপ কষ্ট, জলের মত একটু ঔষধ, খাও আর জ্বর হইতে পরিত্রাণ পাও। বলিতেছিলাম যে সবিরাম জ্বরে আর্সেনিক ব্যাবহার করিতে হইলে রোগের মূমূর্ষু অবস্থায় আর্সেনিক প্রয়োগ করিব বলিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবেনা। তবে আমার বিশ্বাস এই যে, যে অস্তুত ওলাউঠা রোগে একেবারে মূমূর্ষু অবস্থায় আর্সেনিক না দিলে কোন উপকারই হয় না। ইহা একটী মন গড়া কথা নয়, চক্ষে দেখিয়াছি তাহাই লিখিলাম।

আর্সেনিক সম্বন্ধে আর একটী রোগীর কথা না বলিয়া নিরস্ত থাকিতে পারিলাম না। আমি যখন প্রথম নবাব বাড়ীর ডাক্তারী কার্য্যে নিযুক্ত হই তখন নবাব বাড়ীর আর একটী লোক আমার ঢাকায় যাইবার পূর্ব্ব হইতেই হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা কতক কতক করিতেন। আর তিনি হোমিওপ্যাথির একজন ভাল চিকিৎসক বলিয়া একটু অহঙ্কার ছিল। ঐ সময় ঢাকার আর একটী সম্ভ্রান্ত মুসলমান জমিদারের কন্যার ওলাউঠা হয়। নবাব বাড়ীর প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের সহিত তাঁহার বেশ বন্ধুতা ছিল, সুতরাং কন্যাটীর চিকিৎসার জন্য ঐ জমিদারটী নবাব বাড়ীর চিকিৎসক মহাশয়কেই লইয়া গেলেন। কন্যাটীর পীড়া উত্তরোত্তরই বাড়িতেছে, তাঁহার চিকিৎসায় কিছু উপকার দর্শিতেছে না শুনিয়া নবাব আবদুল গণির জামাতা ৺মুউদ্দিন মিয়া সেই দিন বৈকালে তাঁহার নিজের গাড়ী করিয়া আমাকে সঙ্গে লইয়া গেলেন। আমি যাইয়া দেখিলাম

কন্যাটীর পীড়া একটু শক্ত বটে, তবে তখনও পর্য্যন্ত খুব মন্দ অবস্থা হয় নাই। আমি যাইবার কিছুক্ষণ পরই সন্ধ্যা হইল। আর তখন রাত্রে রোগীর চিকিৎসার জন্য কে থাকিবে এই কথা লইয়াই আন্দোলন হইতে লাগিল। নবাব বাড়ীর হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক একটী বড়লোক, তাঁহাকে সমস্ত রাত্রি রাখিয়া রোগীর চিকিৎসা করাণ তত সহজ নয়। তাহা সত্ত্বায় মুউদ্দিন মিয়া সাহেবের আমার উপর একটু ভক্তি ছিল। তিনি নিজেই বন্দবস্ত করিয়া দিলেন যে ডাক্তার বাবু (আমি) সমস্ত রাত্রি থাকিয়া রোগীর চিকিৎসা করিবেন। এইরূপ বন্দবস্তের পর আমিই চিকিৎসা করিতে আরম্ভ করিলাম। নবাব বাড়ীর চিকিৎসক পাছে আমার একটু যশ হয়, সেই জন্যে তাঁহার আলাপি সকল লোকেদের নিকটে ইহার পূর্ব্ব হইতে বলিয়া বেড়াইতেন যে আমি তত হোমিওপ্যাথি জানি না তখনও তাঁহার নিকট হোমিওপ্যাথি শিক্ষা করি। অতএব সন্ধ্যার সময় যাইবার কালিন তিনি ঐ কন্যাটীর পিতাকে আমার অসাক্ষাতে বলিয়া যান যে রাত্রে যে যে প্রকার লক্ষণে যে যে ঔষধ রোগীকে দিতে হইবে সমস্ত কথা আমাকে বলিয়া গেলেন। যাহা হউক আমি রাত্রে থাকিয়া চিকিৎসা করিতেছি এমন সময় প্রায় রাত্র ৪টার সময় রোগীর অবস্থা ক্রমেই খুব মন্দ হইয়া আসিল। কন্যাটী একেবারে এখন যায় তখন যায়। আমি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া উহাকে আর্সেনিক ৬ একটী ৬ আউন্স শিশিতে ৩ ফোঁটা দিয়া ইহারই আধ আউন্স করিয়া ১৫ মিনিট অন্তর দিতে আরম্ভ করিলাম। আমার বেশ স্মরণ আছে ঠিক চারিবার ঔষধ দিবার পর কন্যাটীর অবস্থা একেবারে পরিবর্ত্তন

হইয়া গেল, অনেক ভাল। তখন আধ ঘণ্টা অন্তর ঐ ঔষধ দিতে লাগিলাম। পরে ৬টার সময় রোগীর অবস্থা উত্তরোত্তরই ভাল। সকলেই খুব আনন্দিত, তখন আমি বলিলাম, সমস্ত রাত্র একেবারে বসিয়া জাগিয়াছি, আমার বড় কষ্ট বোধ হইতেছে, অতএব অল্প ক্ষণের জন্য আমি বাসায় গিয়া স্নান করিয়া কিছু জল খাইয়া আসি। আমি যতক্ষণ পর্য্যন্ত ফিরিয়া না আসি এক ঘণ্টা অন্তর এই ঔষধ দেওয়া হউক, আসিয়া যদি কিছু পরিবর্ত্তন করিতে হয় করিব। কন্যাটির পিতা কহিলেন আপনি আসিবার সময় মিয়াসাহেবকে একবার লইয়া আসিবেন। মিয়াসাহেব যেরূপ বলিয়া গিয়াছেন কন্যার পিতার বিশ্বাস যে আমি যে সমস্ত ঔষধ দিলাম সকলই উক্ত মিয়াসাহেবের উপদেশ মতে, সুতরাং ঔষধ যদি কিছু পরিবর্ত্তন করিতে হয়, তবে তাঁহারও উপস্থিত থাকা আবশ্যক। সুধু ছাত্র দ্বারা কার্য্য সুচারু রূপ হইবার ত সম্ভবনা নাই, অতএব গুরুর উপস্থিত থাকা চাই। অবশ্যম্ভাবী ঘটনা কেহই লঙ্ঘণ করিতে পারে না। সমস্ত রাত্রি জাগরণের পর স্নান করিয়া মিশ্রির সরবত ইত্যাদি জলযোগ করায় আমার শরীর অনেকটা সুস্থ বোধ হইল, আর এই যাই এই যাই মনে করিয়া যেমন তাকিয়া ঠেশ দিয়া বসিয়াছি অমনই চক্ষু বুজিয়া আসিয়াছে। আর চক্ষু মুদিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ঘোর নিদ্রা। এদিকে আমার গুরু প্রাতে বেড়াইতে বেড়াইতে রোগীর নিকট জাইয়া উপস্থিত হইয়াছেন, সেখানে উপস্থিত হওয়াতে রোগীর রাত্রের বিবরণ বলিতে বলিতে কন্যাটির পিতা কহিলেন "রাত্র ৪টার সময় কন্যাটী একেবারে যায় যায় হইয়া পড়িল। ডাক্তার বাবু

অনেক পুস্তক দেখিয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া একটী ঔষধ দেন, তাহতেই আমার কন্যাটী অনেক ভাল আছে।” আমার গুরুজী একটু ঈষদ্ হাস্য করিয়া কহিলেন, এ ঔষধের কথা আমি তাহাকে সমস্ত কহিয়া গিয়াছিলাম। অতএব সে যে ঔষধ দিয়াছে, সকলই আমার উপদেশ মতে, পুস্তক ইত্যাদি দেখিয়া ভাবা চিন্তা কেবল ভাণ মাত্র। যাহা হউক সে ঔষধটী এ অবস্থায় এখন আর দিবার আবশ্যক নাই। আমি অন্য একটী ঔষধ দিতেছি। বলিয়া ঐ আর্সেনিকের শিশিটীর ঔষধ সমস্ত নিজ হস্তে ফেলিয়া দিলেন, আর একটী লোক সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া নিজে একটী ঔষধ দিলেন। এ দিগে প্রায় ১১টার সময় আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইল, আমি আস্তে ব্যস্তে ঐ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক মিয়াসাহেবের নিকট গিয়া শুনিলাম যে আমার ঔষধটী লোকের পা লাগিয়া সমস্ত পড়িয়া গিয়াছিল, অতএব তিনি তাহাকে কার্ব্বোভেজিটেবিলিস্ দিয়াছেন। আর তাহার পরেই আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন “আপনি কি ঔষধ দিয়াছেন” আমি উত্তর করিলাম যে “আমি কার্ব্বো ভেজিটেবিলিসের একেবারে শ্রাদ্ধ করিয়াছি তাহাতে রোগীর কিছুই উপকার হইল না। পরে আর্সেনিক দিয়া বিশেষ উপকার হইয়াছিল, আর সেই অবস্থাই আপনি রোগীকে গিয়া দেখেন।” প্রথমতঃ আর্সেনিকে যে এত উপকার হইয়াছিল বা হইতে পারে আমার গুরুজী তাহা বিশ্বাস করিলেন না, তাহাও বিচিত্র নয়। বাস্তবিক ঐ রকম অবস্থায় নিজে হাতে যে আর্সেনিক প্রয়োগ না করিয়াছে সে আর্সেনিকের মৃত্যু সঞ্জিবনী শক্তির কিছুই পরিচয় পায় নাই। এইরূপ কথা বার্ত্তা হইতেছে এমন সময় রোগীর পিতা আসিয়া উপস্থিত।

আসিয়া আমার গুরুজী মিয়া সাহেবকে কহিলেন আপনি যে ঔষধ পাঠাইয়াছিলেন তাহাতে রোগীর কিছুই উপকার হইল না। উপকার হওয়া দূরে থাক আপনার ঔষধ খাওয়াইবার পর হইতেই রোগের বৃদ্ধি, কন্যাটী আবার এখন যায় যায় হইয়াছে। গুরুজী এই সমস্ত শুনিয়া একটু অপ্রতিভ হইলেন, আর কন্যাটীর পিতার নানারূপ অনুনয় বিনয়েও তাহার চিকিৎসায় আর অগ্রসর হইলেন না। অগত্যা আমাকেই একেলা যাইতে হইল; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে নানারূপ চেষ্টা করিয়াও ঐ কন্যাটীকে আর বাঁচান গেল না। এই দৃষ্টান্তটী এত বিস্তারিত করিয়া লিখিবার বিশেষ প্রয়োজন এই যে নিজে রোগীর নিকটে বসিয়া ঐ রূপ অবস্থায় আর্সেনিক প্রয়োগ না করিলে আর্সেনিকের উপকারীতা সম্বন্ধে কিছুই জ্ঞান জন্মে না।

CUPRUM কিউপ্রম্।

কিউপ্রম্ খাইলে পেটে বেদনা হয়, পেটে একটু উদ্দিপনা হয়, আর স্নায়ুমণ্ডলীও উদ্দীপ্ত হয়, এই কয়েকটী লক্ষণে আর্সেনিকের সহিত কিউপ্রমের সৌসাদৃশ্য আছে। আর্সেনিক খাইলে পেটের আঁতুড়ির উদ্দিপনা হয়, আর কিউপ্রমেও পেটের আঁতুড়ির উদ্দিপনা ইত্যাদি হয়। তবে আর্সেনিক খাইয়া পেটের বিকৃতি যতদূর পর্য্যন্ত গুরুতর হইয়া উঠে. কিউপ্রমে ততদূর হয় না। আর্সেনিক খাইয়া আঁতুড়ির ভিতরে ক্ষত পর্য্যন্ত হইয়া যায়, কিন্তু কিউপ্রমে উর্দ্ধ সংখ্যায় আঁতুড়ির প্রদাহ হইয়া থাকে। আর ঐ হিসাবে ওলাউঠার লক্ষণের

সহিত আর্সেনিক অপেক্ষা কিউপ্রমের সৌসাদৃশ্য বেশী, কারণ ওলাউঠায় আঁতুড়ির প্রদাহ হয়, ক্ষত হয় না। ইহা সও-য়ায় কিউপ্রমে আক্ষেপিক লক্ষণ একটু বেশী। আর কিউ-প্রমের অন্যান্য লক্ষণ যেরূপ হউক ইহার আক্ষেপিক লক্ষণ একটু বেশী বলিয়া হোমিওপ্যাথির সৃষ্টিকর্ত্তা হানিমানসাহেব ওলাউঠা রোগে প্রথম কিউপ্রম ব্যবহার করিয়াছিলেন। তবে আর্সে-নিকে মস্তিষ্কের বিকৃতি ও স্নায়ুর নিস্তেজতা কিউপ্রম অপেক্ষা একটু বেশী আর রকমেও ভিন্নরূপ। কিউপ্রমে ও মস্তিষ্কের বিকৃতি হয় বটে, কিন্তু তাহার রকম অন্যরূপ। স্নায়ুর এই দুই রকম বিকৃতি ভালরূপ বুঝাইয়া বলিতে হইলে স্নায়ু সম্বন্ধে গুটী কত কথা বলা আবশ্যক। তাহা না জানিলে স্নায়ুর কার্য্য বা বিকৃতি সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান জন্মান একেবারে অসম্ভব। পূর্ব্বে একরকম বলিয়াছি যে আমাদের মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডের মজ্জা সমস্ত স্নায়ুর উৎপত্তির স্থান। বাস্তবিক সমস্ত স্নায়ুই হয় মস্তিষ্ক না হয়ত মেরুদণ্ডের মজ্জা, যাহাকে ইংরাজিতে Spinal chord বলে— এই দুই স্থান হইতে উঠিয়া শরীরের সর্ব্ব স্থানে ছড়াইয়া পড়ি-য়াছে। সব জীব জন্তুর স্নায়ুর মধ্যে দুই রকম স্নায়ু আছে। এক রকম স্নায়ু দ্বারা মাংসপেশীর কার্য্য হয়, ঐরূপ স্নায়ুকে ইংরাজিতে Motor nerves মোটর নর্ভস্ বলে, এইপ্রকার স্নায়ুর দ্বারা শরীরের সকল ইন্দ্রিয়েরই সঞ্চালন কার্য্য সম্পাদন হইয়া থাকে। ইহা ভিন্ন সকল জীব জন্তুর শরীরে আর এক রকম স্নায়ু আছে তাহাকে ইংরাজিতে Sensory nerves বলে। সেন্সরি নর্ভে আমাদের চেতনা হইয়া থাকে। যেমন কোন দ্রব্য ধরিতে ইচ্ছা হইলে প্রথমত ঐ ইচ্ছাটী মস্তিষ্কে উৎপন্ন হয়; আর-

Motor nerve অর্থাৎ সঞ্চালন সম্বন্ধীয় স্নায়ুর দ্বারা ঐ ইচ্ছা হস্তের মাংসপেশী ইত্যাদিতে আসিয়া পৌছে। পরে ঐ ইচ্ছা অনুযায়ী হস্তের পেশীগুলী এইরূপ ভাবে সঞ্চালিত হইতে থাকে যে ইচ্ছানুরূপ অভিলষিত দ্রব্যটী উত্তমরূপে ধরা যায়। এইপ্রকার কার্য্য মোটর নর্ভে হইয়া থাকে Motor nerve সওয়ায় চৈতন্য সম্বন্ধীয় আমাদের আর কতকগুলি স্নায়ু আছে। কোন দ্রব্য গায়ে আসিয়া পড়িলে, বা কেহ আমাদিগের গাত্র স্পর্শ করিলে, ঐরূপ স্পর্শের অনুভূতি যে স্নায়ু দ্বারা মস্তিষ্কে যাইয়া পৌছে, সেই সকল স্নায়ুকেই Sensory nerve অর্থাৎ চৈতন্য সম্বন্ধীয় স্নায়ু বলা যায়। শরীরের কোন স্থানে ফোড়া, ক্ষত বা সূচ ফুটান বা কাটিয়া যাওয়া ইত্যাদি কষ্ট যাহার দ্বারা অনুভূত হয় তাহাকেই ঐ চৈতন্য সম্বন্ধীয় স্নায়ু বলে। তবে আসল অনুভূতির গোড়া কিন্তু মস্তিষ্ক। কারণ কোন স্নায়ু মস্তিষ্ক হইতে সংশ্রব বিবর্জ্জিত হইলে তাহাতে আর চেতনা থাকে না। সহজ কথায় আমাদিগের একটী অঙ্গুলী বা একটী হাত একেবারে কাটিয়া শরীর হইতে পৃথক করিলে পৃথক করা অঙ্গুলী বা হস্তে কোন চৈতন্য থাকে না। কোন অঙ্গ একেবারে শরীর হইতে পৃথক না করিয়াও কেবল ঐ অঙ্গের স্নায়ু মস্তিষ্ক হইতে পৃথক করিলেও সে অঙ্গের দ্বারা আর কোন কার্য্য হইতে পারে না ও তাহাতে আর চৈতন্য থাকে না। একটু বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত যে ঐ অঙ্গটী কার্য্য বা চৈতন্য শূন্য হইবার কারণ কি? যে সকল স্নায়ু ঐ অঙ্গে পূর্ব্বে বিস্তৃত ছিল, এখন ও সেইরূপই রহিয়াছে, তবে চৈতন্য নাই কেন? তাহার দ্বারা কোন কার্য্য হয় না কেন? তাহার কারণ এই যে,

এখন ঐ সমস্ত স্নায়ু বিস্তীর্ণ রহিয়াছে বটে, কিন্তু সমস্ত চেতনা বা কার্য্যের গোড়া যে মস্তিষ্ক তাহা হইতে এই সমস্ত স্নায়ু এখন স্বতন্ত্র হইয়াছে। তবেই স্নায়ু মনের ইচ্ছা বা বাহিরের অনুভূতির পন্থা মাত্র। মনের ভিতরে ইচ্ছা হইলে ঐ ইচ্ছা স্নায়ু দ্বারা অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বা নানারূপ ইন্দ্রিয়ে আসিয়া পৌছে। অতএব প্রথমতঃ মনের ইচ্ছা মনে বা মস্তিষ্কে উৎপন্ন হয়, পরে ঐ ইচ্ছা স্নায়ু দিয়া আসিয়া অঙ্গ প্রত্যঙ্গে উপস্থিত হইয়া কার্য্য হয়। কিন্তু চৈতন্য সম্বন্ধীয় স্নায়ুর কার্য্য ঠিক ইহার বিপরীত। গায়ের চামড়ায় ঐ সকল চৈতন্য সম্বন্ধীয় স্নায়ু সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতম শাখায় বিস্তারিত আছে; অতএব গাত্র স্পর্শ করিলে বা গাত্রের কোন স্থানে কাটিলে বা রক্ত জমিয়া ফোড়া ইত্যাদি যে কোন কষ্ট হউক ঐ সমস্তের অনুভূতি ঐ অনুভূতির স্থানেই প্রথমতঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহার পর ঐ অনুভূতি চৈতন্য সম্বন্ধীয় স্নায়ুর দ্বারা মস্তিষ্কে যাইয়া পৌছে। আর মস্তিষ্কে যাইয়া পৌছিলেই বাহিরের কষ্ট কি সুখের অনুভূতি হয়। কারণ পূর্ব্বেই বলিলাম যে, কোন চৈতন্য সম্বন্ধীয় স্নায়ুর মস্তিষ্কের সঙ্গে সম্বন্ধ বা সংশ্রব না থাকিলে বাহিরের সুখ দুঃখ কিছুই অনুভব করা যায় না। ঐ সকল অনুভূতির একমাত্র আধার মস্তিষ্ক, কষ্ট বা সুখ অনুভব করিবার স্নায়ুর নিজের কোন শক্তিই নাই। সংক্ষেপে কোন প্রকার স্নায়ুর নিজের কোন অনুভূতির শক্তি নাই। Motor nerve অর্থাৎ কার্য্য সম্বন্ধীয় স্নায়ুও এইরূপ, মস্তিষ্ক হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে ঐ সকল স্নায়ুর দ্বারা শরীরের কোন কার্য্যই হয় না। অতএব চৈতন্য সম্বন্ধীয় স্নায়ুই হউক আর কার্য্য সম্বন্ধীয় স্নায়ুই হউক, মস্তিষ্ক ও

মেরুদণ্ডের মজ্জা ঐ সকলের উৎপত্তির স্থান, আর কেবল উৎপত্তির স্থান নয় সমস্ত স্নায়ুর শক্তির আধার। অতএব স্নায়ু ঐ মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডের মজ্জা হইতে স্বতন্ত্র হইলে আর কার্য্যক্ষম থাকে না।

যে সমস্ত কথা বলা হইল ইহার মূল কথা এই যে স্নায়ু সম্বন্ধীয় দুই প্রকার কার্য্যই আমাদিগের শরীরে হয়। এক প্রকার কার্য্য মস্তিষ্কে উৎপন্ন হইয়া বাহিরে আসিয়া কার্য্য করে। অর্থাৎ কার্য্যের কারণ ভিতরে উৎপন্ন হইয়া বাহিরে প্রকাশ হয়। আর এক প্রকার, কারণ বাহিরে উৎপন্ন হইয়া ভিতরে তাহার কার্য্য হয়। যেমন কোন দ্রব্য ধরিতে ইচ্ছা হইলে ইচ্ছার উৎপত্তি মস্তিষ্কের ভিতরে হয়, দ্রব্যটী ধরিলে ঐ ইচ্ছার প্রকাশ বাহিরে দেখা গেল আর যে দ্রব্যটী ধরিলাম সেই দ্রব্যটী স্পর্শের যে অনুভূতি তাহা ও বাহির হইতে ভিতরে মস্তিষ্কে যাইয়া পৌছিল। অতএব দ্রব্যটী যতক্ষণ ধরিয়া আছি ততক্ষণ ঐ দুই প্রকার স্নায়ু কার্য্য করিতেছে। যতক্ষণ ইচ্ছা রহিয়াছে ততক্ষণ ঐ দ্রব্যটীকে ধরিয়া আছি। আর যতক্ষণ ধরিয়া আছি, ঐ দ্রব্যটী যে আমার শরীরে লাগান রহিয়াছে তাহার স্পর্শের অনুভূতি নিয়ত যাইয়া মস্তিষ্কে পৌছিতেছে। ঐরূপ অনুভূতি না থাকিলে ধরিতে পারিতাম বটে, কিন্তু সেই দ্রব্যটী কতক্ষণ ধরা আছে, আর কখনই বা আর ধরা নাই, তাহা কিছুই বুঝিতে পারিতাম না। অতএব এরূপ কার্য্যে সর্ব্বদাই দুইপ্রকার স্নায়ুর কার্য্য হইয়া থাকে।

এস্থলে বলা আবশ্যক যে অনেক সময় বাহিরের উদ্দিপনায় ইচ্ছায় হউক বা অনিচ্ছায় হউক মাংসপেশীর কার্য্য হইয়া থাকে। যেমন হঠাৎ একটী হাত আগুণে পড়িলে উষ্ণতার কষ্ট বোধ

হইলেই হাতটী মানুষ ও স্থান হইতে সরাইয়া লয়। এই প্রকার কার্য্য মস্তিষ্কের বিবেচনার সাপেক্ষ নহে। এ সকল কার্য্যগুলি স্বভাব সিদ্ধ। আপনাআপনিই হয় হাতটী পুড়িয়া যাইলে পরে কষ্ট পাইতেহইবে বা পীড়া উপস্থিত হইবে বিবেচনা করিয়া হাতটী অগ্নি হইতে সরাইয়া লওয়া হয় না, বিবেচনা করিতে সময় লাগে, আর ঐ সময়ে হয়ত হাতটী পুড়িয়া উঠে, অতএব মনুষ্যের স্বভাব সিদ্ধ কার্য্যই এই যে কষ্ট অনুভবের সঙ্গে সঙ্গেই কষ্ট দায়ক দ্রব্য হইতে তৎক্ষণাৎ সংশ্রব ত্যাগ করে। কিন্তু অনেক সময়ে ইচ্ছা না থাকিলে, অর্থাৎ পীড়া জন্য বাহিরের উদ্দিপণায় মাংসপেশীর কার্য্য হয়। যেমন হাত পা ইত্যাদির কোন স্থানে ক্ষত হইলে ধনুষ্টঙ্কার উৎপত্তি হয়। পীড়াজন্য মনের অনিচ্ছায় যে মাংসপেশীর কার্য্য হইয়া থাকে তাহাকেই ভাল কথায় আক্ষেপ বলে। হস্ত পদের ক্ষত জন্য যেরূপ আক্ষেপ হইয়া থাকে, আঁতুড়ির প্রদাহ জন্য শরীরের ও সেই আক্ষেপ হয়।

আর্সেনিক আর কিউপ্রমের বিভিন্নতা বলিতে বলিতে স্নায়ুসম্বন্ধে এত কথা বলিলাম। কিউপ্রমে আঁতুড়ির প্রদাহ জন্য আক্ষেপের উৎপত্তি, মস্তিষ্কের বিশেষ কোন বিকৃতি হয় না। কিন্তু আর্সেনিকে যে আক্ষেপ হয় তাহা দুই কারণে হইয়া থাকে। কারণ আর্সেনিক প্রবেশ করিয়া আঁতুড়ির প্রদাহ জন্মায় ও মস্তিষ্কের মেডিউলা অব্ লেঙ্গেটা Medulla Oblongata তেও এ প্রদাহ জন্য উদ্দীপনা হয়। অতএব আর্সেনিকের আক্ষেপ উভয় আঁতুড়ির প্রদাহ ও মস্তিষ্কের বিকৃতি জন্য হইয়া থাকে, অতএব এস্থানে আক্ষেপ দুই কারণেই হইয়া থাকে। কিউপ্রম্ আর আর্সেনিকের বিভিন্নতা এই।

ধনুষ্টঙ্কারের কথা যে বলিতেছিলাম ঐ ধনুষ্টঙ্কার দুই কারণে হয়। বাহিরের ক্ষত বা প্রদাহ জন্য ধনুষ্টঙ্কার হইলে তাহাকে Traumatic tetanus বলে। আর জ্বর ইত্যাদি জন্য মস্তিষ্কে বা মেরুদণ্ডের মজ্জায় রক্ত জমিয়া বা অন্য কোন বিকৃতি জন্য যে ধনুষ্টঙ্কার হয় তাহাকে ইংরাজিতে Idiopathic Tetanus ইডিওপ্যাথিক টিটেনস্ বলে। কিউপ্রমের আক্ষেপ যেন Traumatic ট্রম্যাটিক, আঁতুড়ির প্রদাহ জন্য হইয়া থাকে। অর্থাৎ আঁতুড়ির উদ্দিপণা মস্তিষ্কের ভিতরে যাইয়া মস্তিষ্ক উদ্দিপ্ত করিয়া মাংসপেশীর আক্ষেপ জন্মায়। আর্সেনিকের আক্ষেপে যেন Traumatic ট্রম্যাটিক্ কারণও আছে Idiopathic ইডিওপ্যাথিক কারণও আছে। আঁতুড়ির প্রদাহে ও হয়, আর মস্তিষ্কের নিজের বিকৃতিতেও হয়। অতএব আর্সেনিকে এই দুই কারণেই আক্ষেপ হইয়া থাকে।

স্নায়ুসম্বন্ধে আর একটী কথা বলা হয় নাই। যে প্রকার স্নায়ুর কথা বলিলাম ইহা ভিন্ন আরও এক প্রকার স্নায়ু আমাদের শরীরে আছে। ঐ প্রকার স্নায়ুকে Ganglionic বা Sympathetic স্নায়ু বলে। ঐ স্নায়ুগুলীর সহিত মস্তিষ্কের কোন সম্বন্ধ নাই। ইচ্ছার অধীনে ঐ সকল স্নায়ুর কার্য্য হয় না। শরীর রক্ষণ সম্বন্ধে যে সকল কার্য্য আছে তাহাই এই স্নায়ুর দ্বারা হইয়া থাকে। যেমন পাকস্থলীতে খাদ্য দ্রব্য যাইয়া পড়িলেই পাকস্থলীর কার্য্য হইতে থাকে, সে কার্য্য ইচ্ছার অধীন নয়। মল মূত্র ত্যাগ করার কার্য্য ও ইচ্ছার অধীন নয়। এইরূপ শরীরের আরও অনেকপ্রকার কার্য্য আছে, সে সমস্ত কার্য্য Ganglionic স্নায়ুর দ্বারা হইয়া থাকে ইচ্ছার অধীন নহে।

যাহা হউক বলিতে ছিলাম যে আর্সেনিকের আক্ষেপ ও কিউপ্রমের আক্ষেপ হইতে বিশেষ প্রভেদ এই যে আর্সেনিকের আক্ষেপ Medulla oblongata যে মস্তিষ্কের একটী অংশ ঐ মেডুলা অব্লঙ্গেটার বিকৃতি ও আঁতুড়ির প্রদাহ জন্য হইয়া থাকে। কিন্তু কিউপ্রমে যে আক্ষেপ হয় তাহা মস্তিষ্ক বা মস্তিষ্কের কোন অংশের বিকৃতি জন্য নহে। কিউপ্রমে আঁতুড়ির উদ্দিপনা জন্মে, আর সেই আঁতুড়ির উদ্দিপণা জন্য মস্তিষ্ক সাময়িক উদ্দিপ্ত হয়, আর ঐরূপ উদ্দিপ্ত হইয়া আক্ষেপ উৎপাদন করে। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে কোন স্থানে ক্ষত হইলে কখন কখন সেই ক্ষত স্থানের উদ্দিপণা মস্তিষ্কে যাইয়া মস্তিষ্ক ও সমস্ত স্নায়ু সমূহ উদ্দিপ্ত করিয়া আক্ষেপ উৎপাদন করে। আর সেই আক্ষেপের নাম ধনুষ্টঙ্কার। আরও বলা হইয়াছে যে ধনুষ্টঙ্কার দুই কারণে হইতে পারে। প্রথম মস্তিষ্কের নিজের বিকৃতি ও তজ্জন্য উদ্দিপনা, দ্বিতীয় বাহিরের উদ্দিপণা জন্য মস্তিষ্কে কোন রূপ উদ্দিপণা না থাকিলে ও অন্য স্থানের উদ্দিপনা জন্য উদ্দিপ্ত হইয়া আক্ষেপ জন্মে। সেইরূপ দ্বিতীয় আক্ষেপ যেন কিউপ্রমের আক্ষেপ, অর্থাৎ মস্তিষ্কে কোন বিকৃতি বা উদ্দিপণা না থাকিয়া অন্য স্থানের বিকৃতি জন্য যে উদ্দিপণা ও আক্ষেপ হয় কিউপ্রমের আক্ষেপ ও সেইরূপ। কিউপ্রমে মস্তিষ্কের কোন রূপ বিকৃতি জন্মে না। আর্সেনিকে মস্তিষ্কের বিকৃতি আঁতুড়ির প্রদাহ জন্মে আর সেই জন্য আক্ষেপ হয়। ইহা সওয়ায় পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে কঠিন রকম আক্ষেপিক ওলাউঠায় ধমনী সকল আক্ষেপ জন্য পরিসরে অল্প হইয়া শক্ত হয়। কিন্তু কিউপ্রম খাইয়া বিষাক্ত ব্যক্তিদিগের ধমনীর এরূপ সঙ্কীর্ণ ও শক্তভাব দেখা যায় না। তবে কিউপ্রমের বিশেষ গুণ

এই যে অনেক সময় আঁতুড়ির উদ্দিপণা জন্য আক্ষেপ হইলে কিউ-প্রম দিলে আশু উপকার হয়। কিন্তু ওলাউঠার সমস্ত লক্ষণ বিবে-চনা করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইলে ক্যাম্ফর, হাইড্রোসি-য়্যানিক্ য়্যাসিড ও আর্সেনিকের কথা মনে করা উচিত; আর ওলাউঠার প্রথম অবস্থা ভিন্ন কিউপ্রমের কোন উপকারিতা দেখা যায় না; তবে কোলাপ্সের অবস্থায় আপেক্ষ থাকিলে বা আক্ষেপ জন্য রোগীর অস্থির অবস্থায় কিউপ্রমে অধিক ফল হয়। রোগীর অস্থির অবস্থায় আর্সেনিক ও একটী বেশ ভাল ঔষধ, কিন্তু কিউপ্রমের অস্থির অবস্থা ও আর্সেনিকের অস্থির অব-স্থার মধ্যে একটী বিশেষ বিভিন্নতা আছে। রোগী আন্তরিক যন্ত্রণায় যে অস্থির থাকে, অর্থাৎ এ পাশ ও পাশ করে এ অবস্থায় আর্সেনিক একটী উত্তম ঔষধ। কিন্তু রোগী আক্ষেপ জন্য সদাই অস্থির, অর্থাৎ রোগী সুস্থির থাকিতে পারে না বলিয়া অস্থির। আন্তরিক কষ্ট তত বেশী নাই, কিন্তু আক্ষেপ জন্য সদাই হস্ত পদ নড়ে, আর সেই জন্য রোগীকে অস্থির দেখায়, রোগী আপন ইচ্ছায় বিছানায় এ পাশ ও পাশ করে না, কিন্তু অনেকটা যেন আক্ষেপের বশবর্ত্তী হইয়া অস্থির হইতে হয় বলিয়া অস্থির। আর অন্যান্য লক্ষণ যাহা হউক, কোলাপ্স অবস্থায় ও রোগীর বমন থাকিলে এ অবস্থায় আর্সেনিকে তত উপকার হয় না, কিন্তু কিউপ্রম তাহার একমাত্র ঔষধ। এই অবস্থাটী বিশেষ নিরীক্ষণ করিয়া কিউপ্রম প্রয়োগ করিতে পারিলে ২।১ মাত্রার পরই প্রত্যক্ষ ফল দেখা যায়।

উভয় আর্সেণিক আর কিউপ্রমের লক্ষণে রোগীর দীর্ঘ নিশ্বাস ও হাঁপাইয়া উঠা দেখা যায়, কিন্তু এই দুই ঔষধের দীর্ঘনিশ্বাস

ও হাঁপানিতেও একটী বিশেষ বিভিন্নতা আছে। রোগী হাঁপায় আর মধ্যে মধ্যে ওরূপ হাঁপানি থাকে না, অর্থাৎ হাঁপানী যেন আক্ষেপ বা ফিটের মত ২।৪ মিনিট হয়, আবার রোগী যেন স্বাভাবিক মত নিশ্বাস লইতে থাকে হাঁপানি তখন আর নাই। এইরূপ অবস্থায় কিউপ্রম ঔষধটী উপকারী। কিন্তু যখন একবার হাঁপানি আরম্ভ হইয়া রোগী ক্রমাগতই হাঁপাইতে থাকে ও ঐ হাঁপানি উত্তরোত্তরই বৃদ্ধি হয়, অর্থাৎ হাঁপানি একবার আরম্ভ হইলে এক মুহূর্ত্তের জন্যও কমেনা এরূপ অবস্থায় আর্সেনিক প্রয়োগ করিতে হয়, আর্সেনিকই তাহার মহৌষধি।

চিকিৎসক ও অন্যান্য বহুদর্শী লোক মাত্রেই দেখিয়াছেন যে অনেকস্থলে ওলাউঠা রোগীর কোলাপ্স অবস্থায় বাহ্যে প্রস্রাব বন্ধ হইয়া পেট অতিশয় ফুলিয়া উঠে, এবং পরে সেই পেট ফুলার জন্যে রোগীর নিশ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট উপস্থিত হইয়া হয়ত ঐ শ্বাসেই রোগীর প্রাণ বিয়োগ হয়। এস্থলে বলা আবশ্যক যে ওলাউঠা রোগীর কোলাপ্স অবস্থায় ওরূপ মারাত্মক পেট ফুলা কি কারণে হয় তাহা জানা আবশ্যক। খারাপ রকম ওলাউঠায় পেটের ভিতরের আঁতুড়ি সংজ্ঞা শূন্য হইয়া এক প্রকার অসাড় হয়। আর আঁতুড়ির ঐ অসাড় অবস্থায় জলের মত বাহ্যেই হউক, বা অন্য কোন রকমের বাহ্যে হউক, কোন দ্রব্যই ঐ আঁতুড়ির ভিতর হইতে বাহ্যের দ্বার দিয়া বাহিরে আসিতে পারে না। কারণ আঁতুড়ি যে অবশ। আঁতুড়ির ভিতর হইতে যে বাহ্যে নির্গত হইয়া আইসে ইহাও একটী আঁতুড়ির সচল অবস্থা। অর্থাৎ পাকস্থলীর কার্য্য যেরূপ আহারের দ্রব্য পরিপাক করা, আঁতুড়ির ও কার্য্য এই যে আঁতু-

ড়িতে মল বা জল বা অন্য কোন দ্রব্য আসিয়া উপস্থিত হইলে সেইদ্রব্য আঁতুড়ি হইতে বাহির করিয়া দেওয়া। অতএব সেই আঁতুড়ি জড় পদার্থের ন্যায় চৈতন্য বিহীন হইলে, বাহ্যে বা অন্য কোন দ্রব্য বাহির করিয়া দিবার আর শক্তি থাকেনা। একটী রবারের নলীর ভিতর জল পুরিলে রবারের নলীটী আপনা হইতে তাহার ভিতরের জল বাহিরে ফেলিয়া দিতে পারে না, তবে উক্ত নলীর মুখ খোলা থাকিলে জল আপনা আপনি পড়িতে থাকে বটে, কিন্তু ইহার মধ্যে একটী কথা আছে। পেটের ভিতর যেরূপ অবস্থায় আঁতুড়ি থাকে তাহা রবারের নলীর ন্যায় লম্বা ভাবে নহে। জড়াইয়া জড়াইয়া অল্প স্থানে অনেকখানি আঁতুড়ি থাকে। অতএব এইরূপ জড়ান জড়ান আঁতুড়ির ভিতর হইতে আপনা আপনি গুহ্য দ্বার হইতে সমস্ত আঁতুড়ির জল বাহিরে পড়া অসম্ভব। অতএব অতিশয় খারাপ রকম ওলাউঠায় আঁতুড়ি অবশ হইলে পাতলা জলের ন্যায় অনেকটা বাহ্যে আঁতুড়ির ভিতরেই থাকিয়া যায়, কারণ আঁতুড়ি নিজে অবশ। ভিতরের জল ছটকাইয়া ফেলিতে পারে না। পাকস্থলী বা আঁতুড়ি হইতে চোয়াইয়া যে জলের ন্যায় বাহ্যে আঁতুড়িতে আসিয়া জমে তাহা আঁতুড়ির ভিতরে থাকিয়াই পচিতে আরম্ভ হয়। আর পচিতে আরম্ভ হইলে পচিবার সঙ্গে সঙ্গে কোন দ্রব্য পচিলে যে কয়েকটী গ্যাস উদ্ভাবিত হয়, এ অবস্থায় ও ঐরূপ গ্যাস উদ্ভাবন হইয়াই পেট ফুলিয়া উঠে। এ অবস্থায় হয় ত রোগীর অল্প অল্প দুর্গন্ধ যুক্ত বাহ্যে গুহ্য দ্বার দিয়া চোয়াইয়া পড়ে আর না হয় ত বাহ্যে একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। ওলাউঠা রোগীর হঠাৎ বাহ্যে বন্ধ হওয়া যে

ভয়ের কথা তাহা আজ কাইল সামান্য লোকেও জানে। আর ওলাউঠা রোগীর বাহ্যে বন্দ হওয়া যে ভয়ের কথা তাহা পূর্ব্বেই একপ্রকার বলিয়াছি। কেননা আঁতুড়ির অবশতাই ওলাউঠা রোগীর কোলাপ্স অবস্থায় বাহ্যে বন্দ হইবার কারণ আঁতুড়ি একপ্রকার জড় পদার্থের ন্যায় কার্য্য বিহীন হইয়া চৈতন্য হীন অবস্থায় থাকে। আঁতুড়ীর অচৈতন্যঅবস্থা একরকম আঁতুড়ীর মৃত্যু। সেই কারণেই মৃত দেহের ন্যায় পেট ফুলে। ডাক্তার হ্যাল্জার সাহেব বলেন যে এ অবস্থায় অনেক হোমিওপ্যাথি ডাক্তারেরা Carbo vegetabilis (কার্ব্বোভেজিটেবিলিস্), Lycopodium (লাইকোপোডিয়ম্), Terebinthina (টেরিবিন্থীনা), Asafœtida (য়্যাসাফিটিডা), Nux vomica (নক্সভমিকা) দিয়া থাকেন। এই সকল ঔষধের মধ্যে একটী ঔষধেও উপকার হয় না, আর হওয়া উচিত নয়। এ অবস্থায় Plumbum (প্লম্বাম্), Alumina (য়্যালুমিনা) ও Opium (ওপিয়ম্) অহিফেন দেওয়া আবশ্যক। আর এই তিনটী ঔষধের মধ্যে Opium সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এ অবস্থায় ওপিয়মের ফল প্রত্যক্ষ। ওপিয়ম্ তিন ডেসিমেল ডাইলিউশন এক এক ফোঁটা মাত্রায় এক কাঁচ্চা কি আধ ছটাক জলে ১৫।২০ মিনিট অন্তর ৫।৭ বার দিবার পরই রোগী অনেকটা সুস্থ বোধ করে। তবে ওপিয়ম দেওয়া সম্বন্ধে আর একটী কথা আছে। অনেক ওলাউঠারোগী প্রথম অবস্থায় য়্যালপ্যাথি ডাক্তারেরা অহিফেন ঘটিত ঔষধ দিয়া থাকেন। অতএব পূর্ব্বে অহিফেন ঘটিত ঔষধ দেওয়া হইলে এ অবস্থায় উক্ত অহিফেন ঔষধে আর তত ফল দর্শে না। তবে রোগের

আরম্ভ হইতেই আগাগোড়া হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা হইলে অহিফেনএ অবস্থায় একটী অদ্বিতীয় ঔষধ। পূর্ব্বে অহিফেন কোন না কোন প্রকারে দেওয়া হইয়াছে সন্দেহ হইলেও কয়েক মাত্রা অহিফেন প্রয়োগ করিয়া দেখা উচিত যে রোগীর কিছু উপকায় হয় কি না। আর অহিফেনে কিছু উপকার না দর্শিলে Cuprum metallicum (কিউপ্রম্ মেটালিকম্ বা Cuprum Aceticum (কিউপ্রম্ য়্যাসিটিকম্) ৬, ১২ বা ৩০ ডাইলিউশন দিলে যথেষ্ঠ উপকার হয়। ডাক্তার স্যাল্জার সাহেব এ অবস্থায় কিউপ্রম য়্যাসেটিকম্ ৩ ডেসিমেল ডাইলিউশন এক ফোঁটা মাত্রায় ১৫।২০ মিনিট অন্তর দিয়া অনেক রোগীকে মৃত্যু-গ্রাস হইতে জীবন দান করিয়াছেন। তিনি বলেন এই ঔষধ ২।৪ বার প্রয়োগ করিলে কিছু উপকার না দর্শিলেও ঐ ঔষধটী ক্রমাগত দেওয়া আবশ্যক। কারণ এ অবস্থায় কিউপ্রম য়্যাসিটিকম্ ভিন্ন আর কোন উৎকৃষ্ট ঔষধই নাই। শীঘ্রই হউক বিলম্বেই হউক এ অবস্থায় যদি কোন ঔষধে উপকার দর্শে তবে সে ঔষধটী সেই কিউপ্রম য়্যাসিটিকম্। অতএব অন্য কারণে হউক আর না হউক অনন্যগতি বিবেচনায় ঐ ঔষধই ক্রমাগত দেওয়া বিধেয়।

অনেক সময় ওলাউঠা রোগী অন্যান্য লক্ষণে একপ্রকার একটু সুস্থ হইয়া হিকাতে বড় কষ্ট পায়। কিউপ্রম্ হিক্কার বেশ একটী ভাল ঔষধ।

কপার অর্থাৎ তামা সম্বন্ধে আর একটী কথা বলা আবশ্যক। অনেকানেক ডাক্তার বলেন যে একটু তাম্র খণ্ড শরীরের সঙ্গে সংলগ্ন করিয়া রাখিলে ওলাউঠা রোগের সংক্রামকতা নিবারণ

হয়। এ সম্বন্ধে অনেক প্রকার মত ভেদ আছে। যাহা হউক উপায়টী সহজ, করিলে কোন ক্ষতি নাই॥ নিম্নে ওলাউঠার যে যে লক্ষণে কিউপ্রম দেওয়া বিধেয় তাহার কয়েকটী প্রধান প্রধান লক্ষণ বলি। পেটের বেদনা সকল সময় থাকে না, সময়ে সময়ে হয়, বুকের বাঁ দিগে অসহ্য বেদনা, হাতে পায়ে আক্ষেপ বেশী, আর ঐ আক্ষেপ হাতে পায়ের অঙ্গুলী হইতে প্রথম আরম্ভ হয়, গা বমি বমি করে ও বমি হয়, কিন্তু রোগীকে শীতল জল পান করাইলে বমন কমে। পূর্ব্বেই আর্সেনিকের লক্ষণে বলিয়াছি যে শীতল জল পান করিবার পরই বমি হয়। কিন্তু কিউপ্রমের লক্ষণ এই যে শীতল জল পান করিলে বমি কমে। আর জল পান করিতে করিতে পেটের ভিতরে যেন একটা গড় গড় শব্দ হয়। এই কয়েকটী বিশেষ লক্ষণ থাকিলে আর্সেনিক না দিয়া কিউপ্রম দেওয়া আবশ্যক। এস্থলে বলা আবশ্যক যে অনেকানেক হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার অনেক সময় রোগীর সমস্ত লক্ষণের বিভিন্নতা উপলব্ধি করিতে না পারিয়া পর্য্যায় ক্রমে অর্থাৎ উল্‌টীপাল্‌টী করিবা একবার আর্সেনিক ও তাহার পর কিউপ্রম ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু একবার আর্সেনিক অন্যবার কিউপ্রম পর্য্যায় ক্রমে না দিয়া দুইয়ের পরিবর্ত্তে Arsenite of copper আর্সেনাইট্‌ অব কপার্‌ প্রয়োগ করিলে উপকার হয়। অতএব Cuprio Arsenite (কিউপ্রিক্‌ আর্সেনাইট্‌) ৬ ডেসিমেল Trituration ট্রাইটিউরেশন্‌ (চূর্ণ) একটী ভাল ঔষধ।

SECALE CORNUTUM.

সিকেলি কর্ণিউটম্।

সিকেলি কর্ণিউটম্ এলপ্যাথি ডাক্তারদিগের অনেক কালের একটী পরিচিত ঔষধ। এলপ্যাথি ডাক্তারেরা ইহাকে Ergot of rye এর্গট অব রাই কহেন। আইঙ্গ কাইল এর্গট্ অব্ রাইয়ের এলপ্যাথি চিকিৎসায় ও বিস্তর আদর হইয়াছে। কোন স্থান হইতে রক্ত শ্রাব হইলে লিকুইড্‌এক্‌ষ্ট্র্যাক্ট এর্গট্ বা টিংচার এর্গট্ প্রয়োগ করিলে আশু উপকার হয়। এর্গট্ অব্ রাইয়ের সার অংশ এর্গটিন ২—৫ গ্রেণ মাত্রায় হাইপোডার্মিক্ ইঞ্জেক্‌শন্ Hypodermic injection..করিয়া ব্যবহার করা হয়। যাহা হউক, এর্গট্ সম্বন্ধে অন্য অন্য চিকিৎসার কথা বর্ণনা করা এ পুস্তকের উদ্দেশ্য নয়। ওলাউঠায় কি প্রকারে কি অভিপ্রায়ে এর্গট্ অর্থাৎ সিকেলি কর্নিউটম্ ব্যবহার হয় তাহার কথাই সংক্ষেপে কিছু বলি।

এর্গট্ খাইয়া সহজ শরীরে কি কি লক্ষণ হয় সে বিষয়ে একটু লক্ষ্য করা আবশ্যক। এর্গট খাইয়া সহজ শরীরের লক্ষণ, অর্থাৎ Pathogenesis. প্যাথজিনিসিস্‌সের প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। হোমিওপ্যাথি ঔষধের প্যাথজিনিসিস্ না জানিলে কোন ঔষধ ঠিক করিয়া ব্যবহার করা যায় না। অধিক পরিমাণে এর্গট্ খাইলে নিম্ন লিখিত লক্ষণ সমস্ত উপস্থিত হইয়া থাকে।—

প্রথমে গা মাটি মাটি করে, হাত পায়ের অঙ্গুলীর অগ্রভাগে যেন পিপীলিকা চলিয়া যাইতেছে বোধ হয়, হাত পায়ের

অঙ্গুলীর অগ্রভাগ কখন কখন Blue cholera ব্লু কলেরার মত নীলবর্ণ হইয়া যায়। গা বমি বমি করে, কখন কখন পেটে বেদনা ধরিয়া অধিক বমন হয়, পেট শক্ত হইয়া ফুলিয়া উঠে, মাথা দম্‌দম্‌ করে ও ঝুঁকে পড়ে, হস্ত, পদ, স্কন্ধদেশ, মুখ, ওষ্ঠ, জিব ইত্যাদির আক্ষেপ হয়। আর এইরূপ আক্ষেপ অঙ্গের একদিগে ধরিতে ধরিতে হটাৎ অন্যদিগে উপস্থিত হয়। আক্ষেপের সহিত কখন দাহ, কখন শীত বোধ হয়। এর্গটের আক্ষেপ অন্যান্য আক্ষেপ হইতে একটু বিশেষ বিভিন্ন। অন্যান্য আক্ষেপে হাত পা ঘুরায়, অর্থাৎ লাঠী, মুদ্গর ইত্যাদি ঘুরাইবার জন্য যেরূপ মানুষ হাত ঘুরায়, পীড়া জন্য আক্ষেপ হইলে সেই প্রকারে হাত পা ঘোরে, কিন্তু এর্গটের আক্ষেপ লক্ষ্য করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, সেরূপ নহে। এর্গটের আক্ষেপে হাত পা একবার কোঁকড়াইয়া আইসে ও আবার প্রশস্থ হয়, অর্থাৎ এক খণ্ড রজ্জু যেরূপ কোঁকড়াইয়া লম্বাদিকে সঙ্কীর্ণ হয়, আবার বিস্তীর্ণ হইলে রীতিমত লম্বা হয়, এর্গটের আক্ষেপ ঠিক সেইরূপ। হাত পা ঘুরে না, কিন্তু একবার সঙ্কীর্ণ হয় আর বার প্রশস্থ হইয়া শীকের মত হয়। অতএব আক্ষেপিক ওলাউঠায় সিকেলী কর্ণিউটম্ দিতে হইলে আক্ষেপের রকম সম্বন্ধে বিশেষ লক্ষ্য রাখা অতিসয় আবশ্যক। সকল প্রকার আক্ষেপে সিকেলি কর্নিউটমে কোন কাজ হয় না। এইরূপ আক্ষেপ প্রায় মৃগী রোগে হইয়া থাকে। অতএব মৃগীরোগের আক্ষেপের সহিত সিকেলি কর্নিউটমের আক্ষেপ অনেক মিলে। আক্ষেপ যখন থাকে না তখন রোগী এক রকম জ্ঞান শূন্য হইয়া ভুম্ভু কুম্ভু হইয়া থাকে। আক্ষেপের পর অনেক-রোগীর অতিশয় ক্ষুধা বোধ হয়, কিছু খাইতে চাহে, আক্ষেপের

পর রোগী অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, কাণ ভোঁ ভোঁ করে, কাণে ভাল শুনিতে পায় না, আক্ষেপের পর ও হস্ত পদ যেন নিষ্পন্দ শক্ত হইয়া থাকে। কখন কখন রোগীর পেট ভাঙ্গিয়া দেয়, পাতলা বাহ্যে হইতে আরম্ভ হয়। জিব ফুল ফুল হয়, মুখের লাল বেশী পড়ে, চক্ষের উপরে যেন একটী পর্দ্দার মত পড়ে, রোগী ভাল দেখিতে পায় না, কখন কখন একটী দ্রব্য দুইটী দেখায়, বিষণ্ণ মৌন ভাবে থাকে, পাগলের মত ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহে, গাত্রের চর্ম্ম বিবর্ণ হইয়া চোপ্‌সাইয়া যায়, আক্ষেপের পর কখন কখন হস্ত পদে ক্ষত হয়, আর সেই ক্ষত স্থানে ধসা পশ্চিমের ন্যায় হয়, অর্থাৎ ক্ষত স্থান অনেক দূর পর্য্যন্ত পচিয়া উঠে, রোগী বিষণ্ণ, জীবনের আশা কিছু মাত্র করে না, সমস্ত শরীরে প্রচুর ঘর্ম্ম হয়, রোগী দুর্ব্বল ছট্ ফট্ করে, পরে কোলাপ্‌স্ হয়, কোলাপ্‌স্ অবস্থায় আর্সেনিকের কোলাপ্‌সের ন্যায় হয় বটে, তবে কোলাপ্সের অবস্থায় পূর্ব্বের সমস্ত লক্ষণ বিবেচনা করিয়া রোগীকে আর্সেনিক দিলে উপকার হইবে কি এর্গট্ দিলে উপকার হইবে বিবেচনা করিতে হয়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে ওলাউঠা রোগে ধমনী ইত্যাদির সঙ্কোচ জন্মিয়া থাকে, আর ধমনী ঐরূপ সঙ্কোচ হওয়া জন্য ধমনীর ভিতরের পরিসর সঙ্কীর্ণ হয়, আর ঐরূপ সঙ্কীর্ণ হওয়া জন্য ধমনীর ভিতর দিয়া রক্তের চলাচল সমুচিত রূপে হইতে পারে না বলিয়াই রোগী ওলাউঠায় রক্ত বিহীন হইয়া সিটা সিটা হইয়া যায়। ভাল ভাল ডাক্তারেরা ধমনী ইত্যাদির সঙ্কোচ স্নায়ুর দুর্ব্বলতা জন্য হইয়া থাকে বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, অর্থাৎ ওলাউঠার বিষ শরীরে প্রবেশ কবিবা মাত্র সমস্ত স্নায়ু সমষ্টিকে নিস্তেজ করিয়া ফেলে

আর স্নায়ুর ঐ নিস্তেজতা জন্যই ধমনীর সঙ্কোচ জন্মিয়া থাকে। ওলাউঠার অন্যান্য ঔষধে সুস্থ শরীরে ঐরূপ স্নায়ু সমষ্টির নিস্তেজতা জন্মায় বলিয়া হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকেরা ওলাউঠা রোগে ঐ সকল ঔষধ প্রয়োগ করিয়া থাকেন কিন্তু এস্থলে বলা আবশ্যক যে, এর্গটে অর্থাৎ সিকেলি কর্ণিউটমে স্নায়ুর নিস্তেজতা উৎপাদন করে না, কিন্তু উভয় ধমনী ও শিরার সঙ্কোচ জন্মাইয়া থাকে। অতএব এস্থলে স্নায়ুর নিস্তেজতা না জন্মাইয়া ও ধমনী ও শিরার সঙ্কোচ জন্মে। আর ওলাউঠারোগে প্রকৃত পক্ষে স্নায়ু সমষ্টির নিস্তেজতা জন্মাইয়া কিবল ধমনীর সঙ্কোচতা জন্মায়। এই সকল কারণ জন্য অধুনা ওলাউঠারোগে সিকেলি কর্নিউটম ঔষধটীর অনাদর জন্মিয়া আসিতেছে। তবে Doctor Russel ডাক্তার রসেল সাহেব লিখিয়াছেন যে, কিবল সিকেলি কর্ণিউটম্ দিলে ওলাউঠায় বিশেষ কোন উপকার দর্শিতে দেখা যায় না বটে, কিন্তু সিকেলি কর্ণিউটম্ আর আর্সেনিক পর্য্যায় ক্রমে প্রয়োগ করিলে যথেষ্ট উপকার হয়। তিনি লিখিয়াছেন যে ইহার বিশেষ কোন কারণ তিনি নির্দ্দেশ করিতে না পারিলে ও এই দুইটী ঔষধ এটী একবার ওটী একবার প্রয়োগ করিয়া প্রত্যক্ষ ফল পাইয়াছেন।

Doctor Salzar ডাক্তার স্যালজার সাহেব কহেন যে ওলাউঠায় সিকেলি কর্ণিউটম প্রয়োগ করিবার বিশেষ কয়েকটী অবস্থা আছে। সেই অবস্থাগুলী নিম্নে বলি ;—

রোগী ওলাউঠার আশু মারাত্মক উপসর্গ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া এক রকম আধা মাধা অবস্থায় থাকে, অর্থাৎ শীঘ্র আরোগ্য ও হয় না, আর অন্য কোন মারাত্মক উপসর্গের ও

বৃদ্ধি হয় না। এরূপ অবস্থায়, অর্থাৎ প্রতিক্রিয়া হইতে আরম্ভ হইয়াছে কিন্তু টাইফয়েড অবস্থায়, বা নিউমনিয়ায়, বা প্রস্রাব না হওয়া জন্য, বা উদরের কোন পীড়ার জন্য রোগী নানা প্রকারে কষ্ট পাইতেছে। এ স্থলে সিকেলি কর্ণিউটম্ ৬ প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার হয়। এ অবস্থায় সিকেলি কর্ণিউটমে যে বিশেষ উপার হইবে তাহা এক প্রকার বুঝিতে পারা যায়, কারণ হয়ত ধমণী ও শিরার সঙ্কোচ জন্য তখন ও মস্তিস্কে, মুত্রগ্রন্থিতে বা ফুস-ফুসে রীতিমত রক্ত চলাচল হইতেছে না বলিয়া রোগী কষ্ট পাইতেছে। সিকেলি কর্ণিউটম্ প্রয়োগ করিলে ঐরূপ ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ধমণী ও শিরা সঙ্কোচন বর্জ্জিত হইয়া স্বাভাবিক মত পরিসর বিশিষ্ট হওয়াতে রক্তের চলাচল স্বাভাবিক মত হইতে থাকে অতএব ঐ সকল ভিন্ন ভিন্ন স্থানের রক্ত জমিয়া থাকা নিবারণ জন্য পীড়া সমুহের উপসম হয়।

ওলাউঠার পর (Bed sore) বেড্ সোর্ ক্ষততে রোগীর প্রাণ লইয়া টানাটানী হয়। এ পীড়ায় সিকেলি কর্ণিউ-টম্ একটী উত্তম ঔষধ। সাংঘাতিক ওলাউঠার পর হয়ত চক্ষের ভিতরে ক্ষত হয়, আর এইরূপ সাংঘাতিক হইয়া উঠে যে চক্ষুটী একেবারে নষ্ট হইবার উপক্রম হয়। এই রূপ চক্ষু রোগে সিকেলি কর্ণিউটম্ একটী চমৎকার ঔষধ। সংক্ষেপে রীতিমত রক্ত চলাচল না হইয়া যে রোগ উৎপন্ন হয় তাহাতেই সিকেলী কর্ণিউটম্ বিশেষ উপকারী। ডাক্তার স্লালজার সাহেব লিখিয়াছেন যে একটী বিবির বড় সাংঘাতিক ওলাউঠা হইবার পর তিনি কালা হইয়া যান। দুইটী কর্ণে কিছুই শুনিতে পাই-তেন না। স্লালজার সাহেব তখন প্রথম কলিকাতায় আসিয়া-

ছেন। ওদিগে বিবিটী ও নানারূপ চিকিৎসা করিয়া পবে হতাশ হইয়া বসিয়া আছেন। একদিন হঠাৎ হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার কথা মনে হওয়াতে স্থালজার সাহেবকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করেন যে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় এই পীড়ার কিছু উপকার হইতে পারে কিনা। স্থালজার সাহেব তাঁহাকে কিছু আশ্বাস দেওয়াতে চিকিৎসা আরম্ভ হয়। স্থালজার সাহেব লিখিয়াছেন ৮।৯ দিন সিকেলী কর্ণিউটম্ ৬ দেওয়াতেই বিবিটীর বিশেষ উপকার হয়। তাহার পর মাসেক দুমাসের মধ্যেই রোগীটী আরোগ্য হয়।

ডাক্তার হিউজেস্ সাহেব কহেন যে বয়সদোষ যে মূত্রাশয়ের দুর্ব্বলতা জন্য অল্প অল্প প্রস্রাব হয়, আর প্রতিবারে প্রস্রাব কবিবার সময় মনে হয় যেন সমস্ত প্রস্রাব বাহির হইল না। প্রস্রাবের কতকাংশ যেন মূত্রাশয়ে রহিয়া গেল। এ অবস্থায় সিকেলী কর্ণিউটম প্রয়োগ করিয়া হিউজেস্ সাহেব যথেষ্ট ফল পাইয়াছেন।

RICINUS রিসিনস্।

রিসিনস্ বলিলে আপাততঃ একটী নূতন ঔষধ বলিয়া মনে হয় বটে, কিন্তু ইহা একটী অনেক দিনের পরিচিত ঔষধ। ইহা অনেক দিনের পরিচিত ক্যাষ্টর অয়েল বা রেড়ীর তেল ভিন্ন আর কিছুই নয়। রিসিনস্ পূর্ব্ব হইতেই ওলাউঠা বিআরামের একটী ঔষধ হওয়া উচিত ছিল। Jatropha জ্যাট্রফা, Croton ক্রটন (জয়পাল), Veratrum Album ভেরেট্রম অ্যাল্বম, ইত্যাদি ঔষধ

সহজ শরীরে খাইলে যেরূপ পাতলা বাহ্যে হয় সেইরূপ ক্যাষ্টর অয়েল সহজ শরীরে জোলাপ লইলেও অতিশয় পাতলা বাহ্যে, পেটে বেদনা ইত্যাদি সমস্ত লক্ষণ হয়। এই সকল হিসাবে অনেক দিন পর্য্যন্ত ভেরেট্রম য়্যাল্‌বম্‌ ওলাউঠার একটী প্রধান হোমিওপ্যাথি ঔষধ বলিয়া অদ্যাবধি পরিগণিত রহিয়াছে; কিন্তু পূর্ব্বে কেহ ওলাউঠার বিআরামে ক্যাষ্টর অয়েল ব্যাবহার করেন নাই। তবে সিকাগোর Dr. Hale ডাক্তার হেল্‌ প্রথম ওলাউঠা রোগে রিসিনস্‌ ব্যবহার করেন। যাহা হউক, ডাক্তার হেলের পরে আর ও অনেকানেক হোমিওপ্যাথি ডাক্তার ওলাউঠা রোগে রিসিনস্‌ ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোন ফল দর্শে নাই। তবে পেটের দোষে, অর্থাৎ কেবল পাতলা বাহ্যে ইত্যাদি রোগে রিসিনস্‌ দিলে কথঞ্চিৎ উপকার হইয়াছে দেখা গিয়াছে।

স্থালজার সাহেব বলেন যে ওলাউঠার সমস্ত ঔষধের মধ্যে রিসিনস্‌ আর কিউপ্রমে সাদা সাদা চেলণী জলের মত বাহ্যে হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে আর্সেনিক ঔষধের বাহ্যের রং ওলাউঠার সঙ্গে ঠিক মিলে না। কিউপ্রম্‌ আর রিসিনস্‌ বেশী মাত্রায় খাইলে সাদা চেলণী জলের মতন বাহ্যে হয় বটে, কিন্তু ওলাউঠার আর আর লক্ষণে কিউপ্রমের সঙ্গে অনেকটা সাদৃশ্য আছে বলিয়া রিসিনস্‌ অপেক্ষা কিউপ্রম ঔষধটীতে অধিক উপকার হয়। রিসিনস্‌ ওলাউঠার প্রথম অবস্থায় পাতলা বাহ্যের সময় দিলে উপকার হইতে পারে বটে, কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, সকল ওলাউঠা পাতলা বাহ্যে ইত্যাদি লক্ষণ হইতে আরম্ভ হয় না। আর ওলাউঠায় পাতলা বাহ্যে

বমি তত মারাত্মক নয়। তবে, কোলাপস্ ইত্যাদি উপসর্গেই রোগীই অধিক মারা পড়ে। ওলাউঠায় যদি কিবল পাতলা বাহ্যে বমি হইত, তাহা হইলে ত ওলাউঠা একটা সাংঘাতিক রোগের মধ্যে পরিগণিত নয়। ইহা ভিন্ন পুর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, Dry Cholera অর্থাৎ শুষ্ক ওলাউঠায় পাতলা বাহ্যে ও বমির নাম মাত্র থাকে না, কিন্তু ঐরূপ ওলাউঠা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সাংঘাতিক। এই রকম অবস্থায় নিজে অধিক রিসিনস্ ব্যবহার করি নাই। তবে, রিসিনস্ ঔষধটীর কথা কতকটা না বলিলে পুস্তক খানি অসম্পূর্ণ থাকে বলিয়া অন্যের চিকিৎসা হইতে কয়েকটী দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। আনাবশ্যক কতকগুলী দৃষ্টান্ত অন্য পুস্তক হইতে উদ্ধৃত না করিলেও চলিত তবে কিনা রিসিনস্ একটী নূতন ঔষধ। আইজ কাইল ডাক্তারের মধ্যে নূতন ঔষধের কথা না জানিলে বা না লিখিলে একটী হস্তি মূর্খ বলিয়া পরিগণিত হয়। য়্যালপ্যাথি চিকিৎসক দিগের মধ্যেও যাহার পৃস্কৃপসনের মধ্যে Martindale মার্টিনডেল সাহেবের Extra Pharmacopœia র অন্ততঃ ২।৪টী নূতন ঔষধ না থাকে সে একটা ডাক্তারই নয়। পৃস্কৃপসনে রোগের উপকার হইক আর নাই হউক ২।১টা নূতন ঔষধ দিতে পারিলেই বাহাদুরীর আর সীমা থাকে না। আমাদের দেশের লোক ও চিরকালই বোকা এই ভূলেই ভূলিয়া আছেন। এখন কার পৃস্ক্রিপসন, দেখিলে জগদ্বিখ্যাত ডাক্তার ৺দুর্গাচরণের প্রেতাত্মা যে কতদূত পর্য্যন্ত সন্তুষ্ট হইতেন তাহা আর বলা যায় না। যাহাহউক, এখন রিসিনস্ দিয়া ওলাউঠার চিকিৎসা সম্বন্ধে কয়েকটী দৃষ্টান্ত নিম্নে লিখি।

নলিনী নায়ক বসুর বয়স প্রায় ২৫।৩০ বৎসর, বিলক্ষণ বলিষ্ট, হটাৎ ১১ই মাঘ তাহার বাহ্যে বমি হইতে লাগিল। দিন মানে এক রকমে গেল, সন্ধ্যা ৬টার সময় এক জন ডাক্তার ডাকা হইল, তিনি যাইয়া দেখিলেন নলিনী বাবু ভারি দুর্ব্বল, একেবারে শয্যাগত; কথা যেন হাঁড়ির ভিতর হইতে বাহির হইতেছে, হাত পায়ের চর্ম্ম যেন চোপ্সাইয়া গিয়াছে, চখ দুটী খোলে পড়িয়াছে, নাসিকাটী যেন চোপ্সাইয়া উঁচ উঁচ হইয়াছে। জিজ্ঞাসা করায় জানা গেল যে তাহার পূর্ব্ব দিন খাবার কিছু অত্যাচার হইয়াছিল; বাহ্যের কোন রং নাই, সাদা চেলনী জলের মত আর তাহার মধ্যে ছিব্‌ড়ে ছিব্‌ড়ে মাংসের টুকরা, মণিবন্ধে নাড়ী পাওয়া যায় না বলিলেও হয়। অতি সূক্ষ্ম সূতার ন্যায় কখন হাতে আসিয়া লাগে কখন কিছুই জানা যায় না। খাইল ধরা বেশী নাই, তবে মধ্যে মধ্যে এক এক বার হাত পা আঁকড়াইয়া ধরিতেছে। প্রত্যেক বাহ্যের পরে এক মাত্রা করিয়া রিসিনস্ দেওয়া হইতে লাগিল। রাত্র নয়টার সময় প্রায় ৪বার ঔষধ দেওয়া হইয়াছে তখন আর তত বাহ্যে হয় না, ও বমি আর নাই। ৬টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত চারিবার বাহ্যে হইয়াছে, শেষ বারের বাহ্যে একটু রং ধরিয়াছে, ইষদ্ হল্‌দে। তাহার পর রাত্রে বাহ্যের রং আর তত পরীক্ষা করা হয় নাই, কিন্তু বাহ্যের পরিমাণ পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক কম। রাত্র ১২টার সময় রোগী অনেকটা ভাল, তখন ও হাত পা শীতল, কিন্তু মনিবন্ধে একটু নাড়ী পাওয়া যায়। তাহার পর দিন প্রাতে বাহ্যের রং সহজ মলের মত, তবে মলের সঙ্গে একটু আম আছে। পূর্ব্বে বাহ্যের সঙ্গে প্রস্রাব মোটে হয় নাই, কিন্তু প্রাতে বাহ্যের সঙ্গে

প্রায় এক ছটাক সহজ রঙের প্রস্রাব হইল। তাহার পর নলিনী বাবুকে আর কিছুই ঔষধ দিতে হইল না। আস্তে আস্তে আরোগ্য লাভ করিলেন।

কামিনী কুমার সাহা—হটাৎ একদিন বাহ্যে বমি হইতে আরম্ভ হইল, ডাক্তার সাহেব জাইয়া দেখিলেন, কিন্তু তখন পর্য্যন্ত রোগীর কোলাপস্ (হীমাঙ্গ) হয় নাই। কামিনী বাবুর কলিকাতা সহরে একখানি মদের দোকান ছিল, টট্টা টুট্টী ইংরাজি জানা আছে, পীড়া আরম্ভ হইবা মাত্রেই তিনি পাঁচ ফোঁটা রুবিনীর ক্যাম্ফার খাইয়াছিলেন। অতএব ডাক্তার সাহেব যাইয়া দেখিলেন কামিনী বাবু তখন কতকটা রোগের লক্ষণে, কতকটা বা ক্যাম্ফারের লক্ষণে আক্রুষ্ট। কামিনী বাবু তখন শীতে কাঁপিতেছেন, নাড়ী অতি সূক্ষ্ম ও দ্রুত, চক্ষু রক্তবর্ণ, অতিশয় অস্থির, বিছানায় এক প্রকার চট্ ফট্ করিতেছেন ; ডাক্তার সাহেব পেটে হাত দিয়া টিপিবা মাত্রই কামিনী বাবু শিহরিয়া উঠিলেন, উপর পেটে বড় বেদনা। কামিনী বাবুর একেবারে হতাশ জন্মিয়াছিল। মুখে আর কোন কথা নাই, কেবল "আর আমি বাঁচিব না" পুনঃ পুনঃ এই কথাই বলিতেছেন। ডাক্তার সাহেব য়্যাকোনাইট ১X দুই ঘণ্টা অন্তর দিতে আরম্ভ করিলেন। চারিবার ঔষধ দিবার পর ডাক্তার সাহেব আবার আসিয়া দেখিলেন কামিনী বাবুর আর শীত নাই, গাত্রে বস্ত্র মাত্র নাই, তত আর অস্থির নহেন, নাড়ী সূতার ন্যায় সূক্ষ্ম, কিন্তু গতি ভাল। গাত্র গরম নয়, কিন্তু ঘর্ম্ম হইতেছে, বাহ্যে বমি সেই রূপই হইতেছে। তখন ডাক্তার সাহেব য়্যাকোনাইট বন্ধ করিয়া রিসিনস্ ৬ প্রত্যেক বাহ্যের পর একমাত্রা করিয়া খাওয়াইতে বলিলেন।

তাহার পর সন্ধ্যার সময় ডাক্তার সাহেব আসিয়া দেখিলেন কামিনী বাবুর তত রোগের অনেকটা উপসম। রিসিনস্ দুইবার খাইবার পরই বাহ্যে বমি বন্ধ হয়, নাড়ী ও একটু জোর বান্ধে, আর আর বিষয়ে ও কামিনী বাবু পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকটা সুস্থ বোধ করিতেছেন। তখন সমস্ত ঔষধ বন্ধ রাখিয়া একটু বার্লির জল দেওয়া হইল। তাহার পর দিন প্রাতে ডাক্তার সাহেবের আসিবার পূর্ব্বেই কামিনী বাবু মাছের ঝোল ভাত খাইয়া বসিয়া আছেন।

(৩) বিজলী ময়ী দাসি - বয়স ১৬ বৎসর, বিলক্ষণ বলিষ্ঠ, ছেলে পিলে হয় নাই, মাঘ মাসে হঠাৎ এক দিন জলের ন্যায় বাহ্যে হইতে আরম্ভ হইল। বিজলী ময়ী দিগম্বর বাবুর তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী। বিজলী ময়ীর ঐরূপ অবস্থা দেখিয়া দিগম্বর বাবু জ্ঞান শূন্য। বিশেষতঃ ইহার পূর্ব্বে দিগম্বর বাবুর প্রথম পক্ষের দুইটী পুত্র ঐ ওলাউঠা রোগে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন। দিগম্বর বাবু দুইটী পুত্রের বিয়োগে তত দুঃখিত বা কাতর হয়েন নাই, কিন্তু বিজলী ময়ীর পীড়ায় একেবারে আগা গোড়া ইংরাজ ডাক্তার বসাইয়া চিকিৎসা করিবার বন্দবস্ত করিয়া দিলেন। দিগম্বর বাবুর কিছু টাকা ছিল। যাহা হউক, একবার বাহ্যের পরই একেবারে ডাক্তার স্যাল্‌জারকে ডাকান হইল। ডাক্তার স্যাল্‌জার সাহেব যাইয়া দেখিলেন পেটে বেদনা নাই, বমি ও নাই, গা বমি বমি করাও নাই। স্যাল্‌জার সাহেব থাকিতেই আর একবার পাতলা জলের ন্যায় বাহ্যে হইল। স্যালজার সাহেব আর অপেক্ষা না করিয়া রিসিনস্ ৬ এক একবার প্রতি বাহ্যের পর দিতে লাগিলেন। বিজলী ময়ীর সন্ধ্যার পর পীড়ার

মূত্র, সমস্ত রাত্রে তিনবার ঔষধ দিবার পর তিন বার বাহ্যে হয়, সুতরাং ঔষধ ৩ বারের বেশী দেওয়া হয় না। তাহার পর দিন প্রাতে বিজলী ময়ী অনেকটা ভাল। বিজলী ময়ীর সর্ব্ব শুদ্ধ পাঁচবার বাহ্যে হয়, শেষ বারের বাহ্যেতে একটু পিত্তের রং আছে। অতএব এরূপ বাহ্যের পর ঔষধ বন্ধ করিয়া দিয়া একটু এরারুটের জল দেওয়া হইল। সন্ধ্যার পর ডাক্তার সাহেব পুনরায় বিজলী ময়ীকে দেখিতে আসিলেন, শুনিলেন সমস্ত দিনের মধ্যে অল্প অল্প করিয়া তিনবার মাত্র বাহ্যে হইয়াছে। তখন পুনরায় আর এক মাত্রা রিসিনস্ দেওয়া হইল। বিজলী ময়ীর পীড়া মোটেই গুরুতর হয় নাই, কিন্তু দিগম্বর বাবুর বিশ্বাস যে বিজলী ময়ী যমের ঘর হইতে ফিরিয়া আসিল।

(৪) রতি কুমার গোপ, বয়স ২৫।৩০ বৎসর, মাতালের এক শেষ। শীতের সময় হঠাৎ একদিন তাহার পাতলা বাহ্যে হইতে আরম্ভ হইল। এক জন য়্যালপ্যাথি ডাক্তার আসিয়া প্রথমে আফিম্ ও চক ব্যবস্থা করেণ। সে ঔষধ খাইয়া কিছু উপকার হইল না। ক্রমেই বাহ্যে বমি বেশী, হাতে পায়ে খাইল ধরিতে লাগিল। নাড়ী আর প্রায় মণি বন্ধে পাওয়া যায় না। স্বর চিঁ চি করিতেছে, সমস্ত শরীর যেন চোপ্সাইয়া গিয়াছে। ডাক্তার বাবু আসিয়া রিসিনস্ ৬ প্রত্যেক বার বাহ্যের পর ও কিউপ্রম্ মেটালিকম্ ১২, ঘণ্টায় ঘণ্টায় এটী একবার ওটী একবার দিবার ব্যবস্থা করিলেন। দুইবার রিসিনস্ ও দুইবার কিউপ্রম্ সেবন করিবার পর রোগী অনেকটা সুস্থ হইল। রাত্র ১০ টা হইতেই রতি কুমারের ভ্রাতার পাতলা বাহ্যে বমি হইতেছিল, রাত্র ১২টার সময় রতি কুমারের ভাইয়ের অবস্থা বড় মন্দ। পেটের

বেদনায় বিছানায় ছট্ ফট্ করিতেছে। তৎক্ষণাৎ ডাক্তার বাবু আসিয়া রিসিনস্ ৬ ব্যবস্থা করিলেন। তিন ঘণ্টা পর্য্যন্ত রিসিনস্ দিয়া কিছুই উপকার দেখা গেল না। রোগের উত্তরোত্তরই বৃদ্ধি। তখন রিসিনস্ বন্ধ করিয়া ভেরেট্রম্ ৬ দেওয়া হইল। এখন রতি কুমার নিজে অনেকটা ভাল আছেন। যাহা হউক, ভেরেট্রম ৬ প্রয়োগ করাতে রতি কুমার বাবুর ভ্রাতার যথেষ্ট উপকার হইল। এ স্থলে বলা আবশ্যক যে, পাতলা বাহ্যে বমির সহিত পেটে অসহ্য বেদনা থাকিলে রিসিনস্ দিলে কিছুই হয় না। এরূপ অবস্থায় ভেরেট্রমই তাহার এক মাত্র ঔষধ। সেই রূপ পাতলা বাহ্যে বমির সহিত যদি পেটে বেদনা কিছু মাত্র না থাকে, তবে রিসিনসের ন্যায় আর অন্য কোন ঔষধে এরূপ উপকার হয় না। রিসিনস্ সম্বন্ধে আর কিছু অধিক না বলিলেও চলে।

VERATRUM ALBUM ভেরেট্রম্ য়্যাল্বম্।

পৃথক্ পৃথক্ রকম ওলাউঠা স্থলে বলা হইয়াছে যে, এক রকম উলাউঠা আছে তাহাতে পাতলা বাহ্যে মোটেই হয় না। এক বার কি দুই বার সহজ বাহ্যে হয় আর বমি কখন হয় কখন হয় না, কিন্তু রোগীর বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম হইতে থাকে, ও অল্প সময়ের মধ্যে এমনই দুর্ব্বল, অবসন্ন হইয়া পড়ে যে চিকিৎসককে আর চোকে কানে দেখিতে দেয় না। সর্ব্ব শরীর যেন অবশ হইয়া আসে, ও জীবন যেন নির্ব্বাণ অগ্নীর ন্যায় ক্রমেই নিভিয়া যায়। হৃদ্‌পিণ্ড দেখিতে দেখিতে অচল অবশ হইয়া পড়িয়া মৃত্যু ঘটায়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি এইরূপ ওলাউঠাকে

Paralytic প্যারেলিটিক্ ওলাউঠা বলে। এরূপ ওলাউঠার ভেরেট্রমের ন্যায় আর ঔষধ নাই। Doctor Buchner ডাক্তার বক্‌নর লিখিয়াছেন যে সহজ শরীরে ভেরেট্রম্ খাইয়া নিম্ন লিখিত লক্ষণ গুলী হইয়াছে।

সমস্ত শরীরে দাহ, কতক্ষণ এই দাহের পর প্রচুর পরিমাণে ঘর্ম্ম হইতে থাকে। আর এইরূপ ঘর্ম্ম প্রায় ৪।৫ ঘণ্টা পর্য্যন্ত থাকে। ভেরেট্রম খাইবার ৬ ঘণ্টা পর রোগী আর চক্ষে কিছু দেখিতে পায় না। সূর্য্যের আলোর দিকে চাহিলে চক্ষু ফাটিয়া যায়। মাথা খাড়া করিয়া রাখিতে পারে না। ঘাড় লট্‌কাইয়া পড়ে, অসহ্য শিরঃপীড়া, নাড়ীর দ্রুতগতি, ক্ষণে শীত, ক্ষণে গরম বোধ হয়, যাহার পর নাই দুর্ব্বল, বাহ্যে বমি হইতে আরম্ভ হয়, সমস্ত মুখ খানি রক্ত শূন্য ও চোপ্‌সাইয়া যায়, দেখিলে যেন চিনা যায় না। সমস্ত মুখ খানিতে ঘর্ম্ম।

এই সকল লক্ষণে বোধ হইতেছে যে, ভেরেট্রমে বাহ্যে বমির জন্য ততদূর দুর্ব্বল না হউক, এই ঔষধে সমস্ত স্নায়ু সমূহের নিস্তেজতা জন্মায় বলিয়া রোগী এত অল্প সময়ে নিস্তেজ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। অতএব, এই সমস্ত লক্ষণে স্পষ্ট বোধ হয় যে, প্যারেলিটিক্ ওলাউঠায় স্নায়ুর নিস্তেজতা জন্মায়, আর ভেরেট্রম্‌ই তাহার একটী চমৎকার ঔষধ।

Doctor Russell ডাক্তার রসেল্ ভেরেট্রম্ সম্বন্ধে যে একটী রোগীর কথা লিখিয়াছেন, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করা আবশ্যক। এক দিন একটী ভদ্র লোক আমাকে বলিলেন ডাক্তার সাহেব আসুন একটী গরীব স্ত্রীলোককে দেখিতে যাই, তবে এখনও সে জীবিত আছে কি না বিশেষ সন্দেহ। আর জীবিত থাকিলে ও

আপনি ডাক্তারি করিয়া যে তাহার কিছু উপকার করেন তাহা বোধ হয় না, যাহা হউক রসেল্ সাহেব যাইয়া দেখিলেন একটী অল্প বয়স্ক স্ত্রীলোক নীচে মেজের উপর পড়িয়া আছে। ঘর্ম্মে শরীরের সমস্ত কাপড় চোপড় ভিজিয়া গিয়াছে। বোধ হইতেছে যেন কাপড় চোপড় সহিত স্ত্রীলোকটীকে কেহ জলে ডুবাইয়া মাটিতে শোয়াইয়া রাখিয়াছে। একেবারে স্পন্দ রহিত। আস্তে আস্তে এই মাত্র বলিতেছে "থাইল ধরা থাইল ধরা, থাইল ধরায় মরিলাম"। শরীর মৃত শরীরের ন্যায় শীতল, পাতলা বাহ্যে ক্রমাগত কাপড় চোপড়েই হইতেছে। ডাক্তার রসেল্ সাহেব মনে করিলেন, এ রোগীকে জীবন দান করা দ্বিতীয় যীশু খৃষ্টের কার্য্য। যাহা হউক, কপাল ঠুকে ভেরেট্রম্ ৩০ প্রয়োগ করিলেন। যে ভদ্র লোকটী তাঁহাকে ডাকিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, তিনি বসিয়া ঔষধ খাওয়াইতে আরম্ভ করিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, আধ ঘণ্টা অন্তর পাঁচ সাত বার এই ঔষধ খাইবার পরই স্ত্রীলোকটীর অবস্থা অনেকটা পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। দর্শক বৃন্দের মনে আশার উদ্রেক হইল। সমস্ত দিন ঐ রূপ ভেরেট্রম্ খাওয়াইতে খাওয়াইতে স্ত্রীলোকটী প্রায় বার আনা আরোগ্য হইল। তাহার পর ভেরেট্রম্ সওয়ায় আর কোন ঔষধ তাহাকে দিতে হয় নাই, উহাতেই বিশেষ রূপ আরোগ্য হইল।

ডাক্তার স্যাল্জার সাহেব লিখেন যে সংক্ষেপে ওলাউঠার নিম্ন লিখিত লক্ষণ গুলী থাকিলেই ভেরেট্রম্ দেওয়া আবশ্যক :—

কপালে শীতল ঘর্ম্ম, চক্ষের পুতলী সঙ্কীর্ণ, রোগীর অতিশয় পিপাসা, ও একেবারে অধিক জল পান না করিলে পিপাসার

তৃপ্তি হয় না। জল পান করিবার পরক্ষণেই বমন হয়, অথবা একটু নড়িলে চড়িলেই বমন হয়, রোগী অতিশয় দুর্ব্বল, বমন বা বাহ্যে করিবার পরক্ষণেই পেট যেন অনেকটা হাল্‌কা বোধ হয়। প্রতিবার বাহ্যের সময় কপালে ঘর্ম্ম হয়, ও প্রায় প্রতিবার বাহ্যের পূর্ব্বেই পেটে বেদনা ধরে, বাহ্যে জলের ন্যায় পাতলা, সবুজবর্ণ, ও বাহ্যের সহিত ছিবড়ে ছিবড়ে থাকে ; ঐ রূপ বাহ্যে ফস্‌ফরাসে ও হয় বটে, কিন্তু ফস্‌ফরাসের অন্যান্য লক্ষণ আছে। ফস্‌ফরাসে বাহ্যের পর পেট হাল্‌কা হয় না, ফুল ফুল থাকে, পেট ডাকে, আর জলপান করিবার পরক্ষণেই বাহ্যে কি বমি হয় না। Tartar Emetic টার্টার ইমেটিকেও অনেকটা ভেরে-ট্রমের মত লক্ষণ হয় বটে, কিন্তু টার্টার ইমেটিকে রোগীর জ্ঞান ভাল রূপ থাকে না, রোগী আচ্ছন্ন ভাবে থাকে। টার্টার ইমে-টিকে মস্তিষ্কের একটু আচ্ছন্ন ভাব উৎপাদন করে। যাহা হউক, টার্টার ইমেটিক ও Paralytic cholera প্যারালেটিক কলেরায় একটী উত্তম ঔষধ। টার্টার ইমেটিক সচরাচর ওলাউঠা রোগে অধিক ব্যবহার হয় না। তবে কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ ভাল রূপ লক্ষ্য করিয়া টার্টার ইমেটিক দিতে পারিলে যথেষ্ট উপকার হয়। Doctor Kafka ডাক্তার কাফ্‌কা ও Doctor Salzar ডাক্তার স্যালজার সাহেব টার্টার ইমেটিকের ভূয়ঃ ভূয়ঃ সুখ্যাতি করিয়াছেন। টার্টার ইমেটিক কি কি লক্ষণে দিতে হয় এ সম্বন্ধে একটী রোগীর লক্ষণ সমস্ত বিস্তারিত করিয়া লিখিতেছি।

১৮৭১ সালে, শীতকালে, ঢাকা নগরীর পূর্ব্বদিগে একরাম পুর নামক স্থানে বিস্তর ওলাউঠা হইতে আরম্ভ হইল। এই পীড়ায়

প্রায় সকল রোগীই মরিতে লাগিল। নানা প্রকার চিকিৎসা সত্বে ও অনেক কষ্টে অতি অল্প রোগীই রক্ষা পায়। ঐ সময় একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোককে আমি এক দিন দেখিতে যাই। প্রথন রোগীটীর লক্ষণ দেখিয়াই মনে করিলাম যাঁহারা এই রোগীর চিকিৎসা করিতে আমাকে পয়সা দিয়া ডাকিয়াছেন, তাঁহারা নির্ব্বোধের একশেষ। স্ত্রীলোকটী বোধ হয় ৫, ৭, ১০ মিনিটের মধ্যেই পঞ্চত্ত পাইবে। কথায় কথায় শুনিলাম যে এই রূপ এখন মরে তখন মরে অবস্থায় রোগী ১২ ঘণ্টার অধিক রহিয়াছে। শ্বাসের মত জোরে টানিয়া নিশ্বাস পড়িতেছে, ঘড়ি ধরিয়া নিশ্বাস গননা করিয়া দেখিলাম এক মিনিটের মধ্যে ৬ বার কি ৭ বারের বেশী নিশ্বাস পড়ে না। মধ্যে মধ্যে এক এক বার দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িতেছে। হৃদ্‌পিণ্ডের উপর Stethoscope দিয়া দেখিলাম যে হৃদ্‌পিণ্ডের ধড় ধড়ী কিছুই শুনা যায় না। তখন আমার ভ্রম হইল যে ভুলে বুঝি তাড়াতাড়ীতে বুকের ডান দিকে Stethoscope লাগাইয়াছি। পরে নিরীক্ষণ করিয়া দেখি আমার কিছু মাত্র ভ্রম হয় নাই। ঠিক হৃদ্‌পিণ্ডের উপর রাখা হইয়াছে। কিন্তু হৃদ্‌পিণ্ডের ধড় ধড়ী এত মৃদু যে অনেক নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলে একটু একটু ধুক ধুক করিতেছে বলিয়া বোধ হয়। রোগী জ্ঞান শূন্য, ও মৃতের প্রায়, কিবল মধ্যে মধ্যে একটু একটু হোয়াক্ হোয়াক করিতেছে। বাহ্যে বমি বাস্তবিক তখন কিছু হইতেছে না; কাণের কাছে জোর করিয়া ডাকিলে [illegible] যন চায়, মনে কতকটা বুঝে যে তাহাকে কে ডাকি[illegible] [illegible]গীর এই রকম লক্ষণ দেখিয়া এবং পূর্ব্বাপর সমস্ত [illegible] গত হইয়া মনে

করিলাম যে এ একটী প্যারেলিটিক ওলাউঠার রোগী। বেশী খাইল ধরা প্রথম হইতেই নাই। আর বাহ্যে বমির সঙ্গে সঙ্গেই রোগী যেন এক রকম অবশ ইন্দ্রিয় ও আচ্ছন্ন ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। বার ঘণ্টার অধিক ঐ রকম অবস্থায় বাঁচিয়া থাকা ও প্যারেলিটিক ওলাউঠার একটী প্রমাণ। অন্য রকম ওলাউঠায় ঐরূপ অবস্থাপন্ন হইলে বার ঘণ্টা দূরে থাক ২।১ ঘণ্টার মধ্যেই প্রাণ নাশ হইত। যাহা হউক, বাহ্যে বমি তখন তত নাই, আর রোগীর কোমা হইয়াছে, দেখিয়া মনে ভাবিলাম এখন ভেরেট্রম না দিয়া টার্টার ইমেটিক ৬, ১৫মিনিট অন্তর দিয়া দেখি কিরূপ হয়। রোগীর আত্মীয় দিগকে বলিলাম, রোগীর জীবন আশার লেশ মাত্র নাই, তথাপি লোকে বলে "যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ।" আর কোন কোন সময় হোমিওপ্যাথি ঔষধে বড় আশ্চর্য্য ঘটায়, দেখা যাউক, যদি কিছু উপকার হয়। হোমিও প্যাথিক ঔষধের কি চমৎকার গুণ, জগদীশ্বরের কি কৃপা, টার্টার ইমেটিক্ দিবার ৪।৫ ঘণ্টা পরে গিয়া দেখি যে রোগীটী টার্টার ইমেটিক্ খাইয়া অনেক ভাল আছে। নিশ্বাস প্রশ্বাস আর সেরূপ নয়। এক মিনিটে নিশ্বাস প্রায় ১২—১৪ বার পড়িতেছে, বিলক্ষণ জ্ঞান হইয়াছে, আমাকে কহিল "ডাক্তার বাবু আপনি বলিয়া যান, আমাকে একটু তৃষ্ণা ভরিয়া জল দেয়।" সংক্ষেপে বলি, তাহার পর ঐ বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটীকে আর কোন ঔষধই দিতে হইল না। আস্তে আস্তে টার্টার ইমেটিকেই আরোগ্য লাভ করিল।

এস্থলে আর একটী কথা বলা আবশ্যক যে, কখন কখন এক এক স্থানের ওলাউঠা এক এক রকমের হয়। ঐ একরামপুরেই দেখিলাম প্রায় অধিকাংশ লোকেরই ঐ রূপ

প্যারেলিটিক রকমের ওলাউঠা হইল। আর ঐ টার্টার ইমেটি-কেই তখন প্রায় সকলেরই বিশেষ উপকার হইতে লাগিল।

আর ও বলা আবশ্যক যে কখন কখন বসন্ত রোগের সঙ্গে সঙ্গে ওলাউঠা রোগ হইতে থাকে, এক পরিবারের মধ্যে কাহার বসন্ত রোগ কাহার বা ওলাউঠা হইয়া থাকে। ১৮৯৫ সালের প্রথমে কলিকাতা মহানগরীতে বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব হয়। আর বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাবের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বা অব্যবহিত পরেই ওলাউঠা হয়, আর উক্ত সময়ের ওলাউঠা ঐরূপ প্যারে-লিটিক রকমের হইয়াছিল। আর অন্যান্য হোমিওপ্যাথিক ঔষধ অপেক্ষা ঐ সময় টার্টার ইমেটিক্ ঔষধটীতে বিশেষ ফল দৃষ্ট হইয়া-ছিল। অন্ততঃ আমি যে কয়েকটী রোগীকে টার্টার ইমেটিক্ দিয়াছিলাম, সে কয়েকটী রোগীই সচ্ছন্দ রূপে আরোগ্য লাভ করে। চিকিৎসা শাস্ত্র অকুল সমুদ্র, এ ক্ষেত্রে কোন বিষয়ের বিশেষ নির্দ্ধারণ করা অতীব কঠিন। যাহা হউক, টার্টার ইমেটিক্ সম্বন্ধে এস্থানে বলা আবশ্যক যে বসন্ত রোগের টার্টার ইমেটিক একটী উত্তম ঔষধ। আর ঐ রকম প্যারেলিটিক ওলাউঠার ও টার্টার ইমেটিক্ একটী অদ্বিতীয় ঔষধ। অতএব হয়ত এক প্রকার বিষই শরীরে প্রবেশ করিয়া কোন স্থলে বসন্ত রোগ উৎপাদন করিয়াছিল, আর হয় ত কোন স্থলে ঐ বিষই বসন্ত রোগ উৎপাদন না করিয়া প্যারেলিটিক ওলাউঠা জন্মাইয়াছে।

Arsenic আর্সেনিক, অর্থাৎ সেঁকো বিষ অধিক পরি-মাণে খাইলে কতকটা টার্টার ইমেটিকের মত লক্ষণ উপস্থিত হয়। সেঁকো বিষ খাইয়া যে সকল রোগীর মৃত্যু হইয়াছে তাহাদের মৃত দেহ পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে আঁতুড়ির

ভিতরে ক্ষত হয়, অর্থাৎ আঁতুড়ির ভিতরে স্থানে স্থানের শ্লেষ্মা ঝিল্লি নষ্ট হইয়া গাত্রের ছাল উঠিয়া যাইবার মত আঁতুড়ির ভিতরকার আবরণে ক্ষত হয়। আর আর্সেনিকে স্নায়ুর দুর্ব্বলতা ও মস্তিষ্কের বিকৃতিও ঘটিয়া থাকে। কিন্তু টার্টার ইমেটিকের লক্ষণে বাহ্যে, বমি, পিপাসা ইত্যাদির সহিত আঁতুড়ির ক্ষত না হইয়া প্রদাহ উপস্থিত হয়, আর প্রদাহ উপস্থিত হইয়া আঁতুড়িতে ঘা হয় না, কিন্তু শ্লেষ্মা ঝিল্লি ফুলিয়া উঠে। আর টার্টার ইমেটিকে আর্সেনিকের মত মস্তিষ্কের বিকৃতি কিছুই হয় না। আর্সেনিক খাইয়া রোগীর কোমা হইয়া জ্ঞান শূন্য হয়, কিন্তু টার্টার ইমেটিকে জ্ঞানের কিছু বৈলক্ষণ্য হয় না, রোগী যাহার পর নাই দুর্ব্বল হয় বটে, এমন কি রোগী এখন মরে তখন মরে অবস্থায় ও জ্ঞানের কথা কয়। এস্থলে বলা আবশ্যক যে, ওলাউঠার কোলাপ্স্ অবস্থায় যে কোমা হয় তাহাতে আর্সেনিক দিলেই বিশেষ উপকার হইবার সম্ভব। অনেকানেক হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকেরা এই রূপ কোমায় Opium আফিম্ ব্যবহার করিয়া থাকেন। আমি প্রথম প্রথম কয়েকটী রোগীকে এই রকম অবস্থায় আফিং দিয়াছি বটে, কিন্তু আফিমে তত কায হয় না, তাহার পর আর্সেনিক দেওয়াতে বিশেষ উপকার দর্শিয়াছে দেখিয়াছি।

ACONITE য়্যাকোনাইট্।

য়্যাকোনাইট্ রীতিমত প্যারেলিটিক্ কলেরায় আর্সেনিক আর কিউপ্রমের মত একটী ঔষধ না হইলে ও সময়ে সময়ে

য়্যাকোনাইট্ দিলে বিশেষ উপকার হয়। য়্যাকোনাইট্ খাইলে সমস্ত মাংসপেশী ও স্নায়ুর দুর্ব্বলতা জন্মে। অতএব প্যারেলিটিক ওলাউঠায় স্নায়ূ ও মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতার পরিচয় পাইলে অন্য ঔষধ না দিয়া য়্যাকোনাইট্ দেওয়া আবশ্যক।

Doctor Bell ডাক্তার বেল্সাহেব লিখিয়াছেন, যে কোন প্রকারে ছর্দ্দিলাগিয়া ওলাউঠা উপস্থিত হইয়াছে জানিতে পারিলে সর্ব্বাগ্রে য়্যাকোনাইট্ দেওয়াই বিধেয়। কোলাপ্স্ অবস্থায় ও য়্যাকোনাইট্ দিলে বিশেষ উপকার হয়। তাঁহার মতে যে অবস্থায় ও যে যে লক্ষণে কোলাপ্স্ অবস্থায় য়্যাকো-নাইট্ দেওয়া হয়, তাহা নিম্নে লিখা গেলঃ—নাসিকা চোপ্সা-ইয়া যায়, চক্ষু খোলে পড়ে, রগের দুই পাশ যেন বসিয়া যায়, কাণ চোপসাইয়া শীতল হইয়া যায়, কপালের চর্ম্ম মৃতদেহের মত টান ও শুষ্ক হইয়া যায়, মুখ বিবর্ণ, ওষ্ঠদ্বয় কাল হয়, ঝুলিয়া পড়ে, ও শীতল হয়, রোগী যেন সদাই ভীত ও কম্পিত,।

Doctor Ascharumow ডাক্তার য়্যাস্কারুমো-লিখিয়াছেন যে য়্যাকোনাইট্ খাওয়াইয়া দেখা গিয়াছে যে, প্রথমতঃ য়্যাকো-নাইটে হৃদ্পিণ্ডের অবশতা জন্য প্রাণীর মৃত্যু হয়। দ্বিতীয়তঃ য়্যাকোনাইট্ খাইয়া Medulla oblongata মেডুলা অব্লঙ্গেটা উত্তেজিত হয়, ও তাহার পর ঐ মেডুলা অব্লঙ্গেটার একেবারে অবশতা জন্মে। হৃদ্পিণ্ড একটী মাংস পেশী মাত্র, মেডুলা অব্-লঙ্গেটা স্নায়ুর উৎপত্তির স্থান, অতএব সংক্ষেপে য়্যাকোনাইটের বিষে মাংস পেশী ও স্নায়ু উভয়েরই অবশতা জন্মায়। ক্যাম্ফর, হাইড্রোসিয়্যানিক্ য়্যাসিড্ ও আর্সেনিকে হৃদ্পিণ্ড ও অন্যান্য মাংসপেশী এবং স্নায়ু দুর্ব্বল হয় বটে, কিন্তু য়্যাকোনাইটের মত

একেবারে অবশ হইয়া যায় না। অতএব মাংস পেশী ও স্নায়ুর অবশতার লক্ষণের পরিচয় না পাইলে য়্যাকোনাইট্ না দিয়া ক্যাম্ফর, হাইড্রোসিয়্যানিক্ য়্যাসিড্ ও আর্সেনিকের ন্যায় ঔষধ দেওয়াই আবশ্যক। Doctor Hughes হিউজেস্ সাহেব লিখিয়াছেন "It is especially when collapse comes on very rapidly, with little or no premonitory illness, and unattended by copious evacuations, that Aconite is indicated. Arsenic is the medicine generally prescribed in such cases; but its sphere and that of Aconite intersect and overlap each other at this point, and the greater rapidity of the action of the latter would seem to turn the scale in its favour"

বাস্তবিক ওলাউঠা হইবার অতি অল্পক্ষণ পরেই কোলাপ্স্ হইলে য়্যাকোনাইটে বেশী উপকার হয়। আর য়্যাকোনাইটে বেশী উপকার ও হওয়া উচিত। কারণ প্যারেলিটিক ওলাউঠা ভিন্ন এত শীঘ্র কোল্যাপ্স্ আর কোন ওলাউঠায় হইবার সম্ভাবনা নাই। য়্যাকোনাইট্ অধিক কাল পূর্ব্ব হইতেই য়্যালপ্যাথি ডাক্তারদের মধ্যে ও প্রদাহিক জ্বরে একটা বিলক্ষণ ফলপ্রদ ঔষধ বলিয়া পরিগণিত আছে। Doctor Hughes ডাক্তার হিউজেস সাহেব লিখিয়াছেন যে রক্ত চলাচলের কোন প্রকার বৈলক্ষণ্য হইলে তাহা রীতিমত ঠিক করিবার য়্যাকোনাইটের মত আর ঔষধ নাই। কোন স্থলে প্রদাহ হইলে রক্ত চলাচলের সম্বন্ধে বৈলক্ষণ্য জন্মায়। রক্ত চলাচলের বৈলক্ষণ্য জন্মাইলে কোন স্থানে রক্ত জমিয়া প্রদাহ উপস্থিত হইতে

পারে না। রক্ত চলাচলের বৈলক্ষণ্য পূর্ব্বে হইয়া পরে প্রদাহ উপস্থিত করুক আর না করুক অন্ততঃ এ কথা সত্য বটে, যে, যে কারণে হউক শরীরের এক স্থানে অধিক পরিমাণে রক্ত জমিয়া প্রদাহ উপস্থিত হইলে তখন শরীরের ভিতরে স্বাভাবিক মত রক্ত চলাচল করিতে পারে না। প্রদাহে ও অন্যান্য রক্ত চলাচলের বিকৃতির পীড়ায় যে য়্যাকোনাইট্ একটী বিশেষ উপকারী ঔষধ তাহার কারণ এই যে, য্যাকোনাইটে রক্ত চলাচলের বিকৃতি বিনাশ করে। প্রদাহ ইত্যাদি পীড়া বাস্তবিক রক্ত চলাচলের বিকৃতি জন্য উৎপত্তি না হউক রক্ত চলাচলের বিকৃতি জন্য বৃদ্ধি হয় তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। অতএব যে ঔষধে প্রদাহ স্থানের জমা রক্ত সরাইয়া দিয়া রীতিমত রক্ত চলাচল সংস্থাপন করে তাহাই প্রদাহ ও প্রদাহিক রকমের পীড়ার একমাত্র ঔষধ। এই প্রকারের ঔষধের মধ্যে য়্যাকোনাইট্ই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। আর কোলাপ্সে ঐ জন্যই য়্যাকোনাইটের এত বিশেষ উপকারিতা দেখা যায়। ওলাউঠায় হৃদ্‌পিণ্ডের কার্য্য মৃদু করিয়া শরীরের ভিতর রক্ত চলাচল সম্বন্ধে বিঘ্ন জন্মায়। আর সেই বিঘ্নই বাস্তবিক কোলাপসের উৎপত্তি। অতএব ঐ কোলাপ্সের যে য়্যাকোনাইট্ একটী প্রধান ঔষধ ইহার প্রতি আর সন্দেহ কি হইতে পারে? তবে কথা এই যে, কোন স্থলে ওলাউঠার বিষ শরীরে প্রবেশ মাত্র অল্প ক্ষণের মধ্যেই হৃদ্‌পিণ্ড ও সমুদায় মাংসপেশীকে এক প্রকার অবশ করিয়া সমস্ত স্নায়ু মণ্ডলীর নিস্তেজতা জন্মাইয়া কোলাপ্স্ উৎপাদন করে। আর য়্যাকোনাইট্ এরূপ কোলাপ্সেরই একটী ভাল ঔষধ।

কোলাপ্সের চিকিৎসা।

ওলাউঠা রোগের কোলাপ্সই মারাত্মক। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ওলাউঠা রোগে যদি কোলাপ্স্ না থাকিত তাহা হইলে আর ভাবনা কি? কোলাপ্স্ না থাকিলে কি এত অসংখ্য লোক ওলাউঠায় মৃত্যু গ্রাসে পতিত হইত? ওলাউঠার কোলাপ্সইত রোগ! বাহ্যে বমি ছয় মাস পর্য্যন্ত হউক না কেন? কি ভয়? বাহ্যে বমিতে ত লোক মরে না, মরে কোলাপ্সে। অতএব যদিচ পূর্ব্বে কোলাপ্স্ সম্বন্ধে অনেক বলিয়াছি, তথাপি কোলাপ্স্ সম্বন্ধে যথেষ্ট বলিয়াছি বলিয়া মনে করি না। ওলাউঠার চিকিৎসার বিষয় লিখিতে গেলে প্রকৃত কোলাপ্সের কথাই লিখা উচিত। ভেদ বমির আবার চিকিৎসা কি? আর ভেদ, বমিতে এত ভয়ই বা কি? ভেদ, বমি ত টোটকা ঔষধে আরোগ্য হয়। অমনি অমনি ও আরোগ্য হয়। ভেদ, বমিতে ত ভয় নাই। ভেদ, বমির পরে যে সেই যম সম কোলাপ্স্ আসিয়া উপস্থিত হয়। ভেদ, বমি যে ঐ যম সম কোলাপ্সের অগ্রগামী সেই জন্যই ভেদ বমির কথা শুনিলেই প্রাণ একবারে উড়িয়া যায়। যাহা হউক, উলাউঠার মোটামটী চিকিৎসা পূর্ব্বে এক রকম লিখিয়াছি। এখন কোলাপ্স্ অবস্থায় কি কি লক্ষণে কোন কোন ঔষধ দিতে হয়, তাহার বিষয় পুনরায় আবার ভাল করিয়া বলি।

ইহার পূর্ব্বে ওলাউঠার তিন অবস্থা আমার বুদ্ধি মতে ভাল রকম করিয়া বলিয়াছি. কিন্তু একটা রোগী দেখিয়া প্রকৃত প্রস্তাবে ঐ তিনটী লক্ষণ পরে পরে বিভিন্ন করা যাহার পর নাই

কঠিন। খারাপ রকম ওলাউঠার সঙ্গে সঙ্গেই ভেদ, বমি পিপাসা, হাত পা ঠাণ্ডা, ইত্যাদি লক্ষণ প্রথম হইতেই হয়। আর রোগীও যাহার পর নাই দুর্ব্বল ও অস্থির হইয়া পড়ে। এমত স্থলে রোগের কোনটী যে প্রথম অবস্থা, কোনটী যে রোগের বিকাশ অবস্থা, আর কোনটী যে কোলাপ্‌স্ অর্থাৎ হিম অঙ্গের অবস্থা তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা এক প্রকার দুঃসাধ্য। আর হিসাব মত বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইলে, কোলাপ্‌সের একটা নিগূঢ় অর্থ ডাক্তারি হিসাবে কিছুই নাই। হিম অঙ্গ হইয়া রোগী ন্যাতা প্যাতা হইয়া পড়িয়া ঘণ ঘণ নিশ্বাস বহিতে আরম্ভ করিলেই কোলা-প্‌স্ হইল। অতএব কোলাপ্‌সের যে একটা কোন বিশেষ লক্ষণ তাহাও কিছু নাই। আর তা থাকাও সম্ভব নয়। কোলাপ্‌স্ কেবল ঐ রোগেরই আর একটী অবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নয়। ভেদ বমি যে রোগের বিকাশ অবস্থা সেও ঐ ওলাউঠা রোগ, কোলাপ্‌স্ ও ঐ ওলাউঠা রোগ। অতএব বিশেষ বিভিন্নতা কেন থাকিবে? ঐ যে ওলাউঠার তিনটী অবস্থার কথা বলি-য়াছি। তিনটী অবস্থায় রোগ এক। তবে ঐ এক রোগের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ দেখা যায়। প্রথম অবস্থা ও ওলা-উঠা, দ্বিতীয় অবস্থা ও ওলাউঠা, কোলাপ্‌স্ ও ঐ ওলাউঠা তবে লক্ষণে এক অবস্থা অন্য হইতে পৃথক। জ্বরে আর পেটের পীড়ায় তফাত আছে বটে, এ যে দুইটী পৃথক রোগ। কিন্তু ওলাউঠার প্রথম অবস্থা হইতে শেষের অবস্থা ত সে রূপ বিভিন্নতা থাকিতে পারে না। মানুষ বাল্যাবস্থাতে ও মানুষ, যুবাবস্থাতেও সেই মানুষ। তবে তিনটী ভিন্ন২ অবস্থার ভিন্ন২ লক্ষণ আছে বটে। কিন্তু মানুষটী ত সেই এক ঐ। ডাক্তার স্থালজার সাহেব কহিয়াছেন

"Properly speaking it is difficult to say where the stage of collapse begins. It is a state which is easier recognised as such, than defined by so many words. A low temperature 3 to 4 or 5, and even 6o F, below the normal standard, coldness all over, distinct signs of an impeded circulation and respiration, with or without purging or vomitting, constitute the chief characteristics of that stage. As a rule the evacuations are not considerable, the patient being exhausted or emptied, nausea, retching, and now and then a small discharge of a ricewater fluid from the rectum continue, however, often to the last."

স্মালজার সাহেবের এই প্রকার বর্ণনাতে কোলাপসের লক্ষণ সম্বন্ধে এক প্রকার সমস্তই বলা হইয়াছে। এ ইংরাজি গুলীর বাঙ্গালা অনুবাদ করিবার আর বিশেষ আবশ্যক নাই কারণ কোলাপ্‌সের কথা বলিবার সময় এ কথা অনেকবার বলা হইয়াছে স্মালজার সহেবের এ কথা গুলীতে নূতন কথা কিছুই নাই। যাহা হউক, কোলাপসের চিকিৎসার কথা বলিতে হইলে, কোলাপ্‌সের রক্ত কিরূপ অবস্থায় থাকে, সে সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক।

অধিক বার জলের ন্যায় বাহ্যে বমি হওয়ার জন্যই হউক, ওলাউঠার বিষের ঐ প্রকার প্রকৃতি বলিয়াই হউক, ও স্নায়ুর সমূহের নিস্তেজতা জন্য বড় বড় ধমনীর সংকোচ জন্যই হউক, কোলাপ্‌স্ অবস্থায় শরীরের রক্ত স্বাভাবিক তরল অবস্থায় থাকে

না। কোলাপ্‌স্‌ অবস্থায় রক্ত কাল ঘণ আলকাতরার মত হইয়া যায় বলিয়া শরীরের সরু সরু ধমনী বা শিরা দিয়া সঞ্চালিত হইতে পারে না। নিশ্বাস প্রশ্বাসে রক্ত পরিষ্কার হয়। কোলাপ্‌স্‌ অবস্থায় নিশ্বাস প্রশ্বাসের কার্য্য ভাল রূপ চলে না সুতরাং ঐ অবস্থায় রক্ত পরিষ্কার হইতে না পারিয়া বিবর্ণ হইয়া যায়। পূর্ব্বে যাহা বলা হইল ইহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে কোলাপ্‌স অবস্থায় হৃদপিণ্ড ও নিশ্বাস প্রশ্বাসের কার্য্য যে উপায়ে স্বাভাবিক মত চলিতে পারে তাহারই চেষ্টা প্রথমে করা আবশ্যক। কিন্তু ইহাও মনে রাখা আবশ্যক যে, অাঁতুড়ির বা পাকস্থালীর উদ্দিপনা থাকিতে যে কোন ঔষধ দেওয়া হউক না কেন? পাকস্থলী হইতে সমস্ত শরীরে যাইয়া পৌছিবে না। পাকস্থলী এখন জড় পদার্থের মত অবশ ও কার্য্য বিহীন। অতএব পাকস্থলীর উদ্দিপনা থাকিতে ঔষধ সেবন করাইবা মাত্রই হয় ত বমন হইয়া পড়িয়া যায়, আর না হয় ত বাহের দ্বার দিয়া নির্গত হয়। আর না হয় ত ঐ জড় অবশ পাকস্থলীতে জমিয়া থাকে, যাহাহউক, কোলাপ্‌স্‌ অবস্থায় পাকস্থলীর উদ্দিপনা থাকা একটী বিশেষ খারাপ লক্ষণ। অর্থাৎ যে রোগীর কোলাপ্‌স্‌ অবস্থায় ও ওলাউঠার প্রথম অবস্থার ন্যায় বাহে বমি হইতে থাকে সে রোগীর জীবন আশা খুব কম। ডাক্তার ম্যাক্‌নামার সাহেব বলিয়াছেন 'So long as the patient is not able to take, or to retain when taken, any liquid, so long must he be considered not to be out of danger, however distinctly some signs of reaction may have made their appearance."

যাহা হউক, বলিতে ছিলাম যে কোলাপসের অবস্থায় বাহ্যে বমি থাকিলে জানা উচিত যে তখন পর্য্যন্ত পাকস্থলী ও আঁতুড়ীর উদ্দিপনা সমভাবে রহিয়াছে। অতএব, এ অবস্থায় অন্যান্য ঔষধ দিবার পূর্ব্বেই পাকস্থলী ও আঁতুড়ীর উদ্দিপনা নিবারণ জন্য লক্ষণ বিবেচনায় রিসিনস্ বা কিউপ্রম্ দেওয়া আবশ্যক। এই অবস্থার কথা লিখিতে লিখিতে নবাব বাড়ীর একটী বালকের যে ওলাউঠার চিকিৎসা করিয়া ছিলাম তাহার কথা মনে পড়িল। সে আইজ ২০।২২ বৎসরের কথা। তখন রিসিনস্ ঔষধটী হোমিওপ্যাথি ভূমণ্ডলে তত প্রচলিত হয় নাই। বালকটীর নাম আজীজ জান। আজীজজানের বয়স তখন প্রায় ১২ বৎসর, আজীজ জানের ভেদ বমি হইবার ৫।৭ ঘণ্টা পরেই কোলাপ্‌স্ হইল। কোলাপ্‌স্ অবস্থাতে ও আজীজ জানের বাহ্যে ও বমি সমভাবে হইতেছে। উলটে পালটে আজীজ জানকে নানা রকম ঔষধ দেওয়া গেল। কিছুতেই কিছু হয় না। শেষে আমি বিরক্ত হইয়া মনে ভাবিলাম, যে ছেলেটীকে ত আর কোন রূপেই বাঁচান যায় না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে রিসিনসের কথা তখন হোমিওপ্যাথি মণ্ডলীতে বাহির হয় নাই। রিসিনসের কথা কেহই জানে না, অন্ততঃ আমি জানিতাম না যে ক্যাষ্টর অয়েল কখন ওলাউঠায় ব্যবস্থা হয়। যাহাহউক, নানা রকম ঔষধের কথা ভাবিতে ভাবিতে মনে হইল যে, ক্যাষ্টর অয়েল বেশী মাত্রায় খাইলে আঁতুড়ীর Irritation উদ্দিপনা হইয়া বাহ্যে বমি হয়। তবে হোমিওপ্যাথির প্রণালী যদি সত্য হয় খুব অল্প মাত্রায় ক্যাষ্টার অয়েল খাওয়াইলে ঐ (ইরিটেশন্) উদ্দিপনা কেন না কমিবে? কিন্তু, তখন প্রাণে বড় ভয়। ক্যাষ্টর অয়েল যদি দেখা-

ইয়া দি, আর ছেলেটী মরিয়া যায়, তবে নবাব বাড়ীর যে রকম গতিক, বোধ হয় আমাকে ফাঁসীই দিউক,আর না হয়ত আমাকে বিশেষ অপমান করিয়া ঢাকা হইতে দূরীভূত করুক একটা হইবে। বিশেষতঃ পূর্ব্বে যে আমার গুরুজীর কথা বলিয়াছি তিনি নবাব আবদুলগণীর নিকের ঘরের জামাই, আর ইংরাজিতে একজন লায়েক লোক, আর আমার সঙ্গে ত আদা কাঁচকলার ভাব। এ কথা যদি তাঁহার কানে যায়, তাহা হইলে আমাকে বোধ হয় শূলীতে দেওয়া হইবে। যাহা হউক, মনে ভাবিলাম কি করি গণি-মিয়া সাহেবের বড় ভগিনী, বড় খানম সাহেব ঐ ছেলেটীকে প্রতি পালন করিয়া ছিলেন, বড় ভাল বাসিতেন। মনে ভাবিলাম না বলিয়া দেওয়াতে অনেক দোষ আছে, রাত্র তখন প্রায় ২টা। বড় খানম সাহেবকে বলিলাম, "হুজুর আজীজ জান মিঞা ত আর বাঁচে না। আমিত আর কোন ঔষধ দিতে বাকি রাখিলাম না। তবে আর একটী ঔষধ আছে তাতে এদিগও হইতে পারে ও দিগও হইতে পারে, অপনি যদি হুকুম করেণ তবে আমি বাসায় গিয়া সেই ঔষধটী আনিয়া মিঞাকে দি। বাঁচন মরণ ঈশ্বর ইচ্ছা। আর আপনি যদি বিবেচনা করেন আমার গুরুজীকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। কিন্তু তখন আমার মনে যে গুরুজী আসিলে আসল কথা বলিব না, আর একটা ঔষধের নাম বলিয়া দিব। বড় খানম সাহেব বড় বুদ্ধি মতি স্ত্রীলোক, যাহা হউক, বড় খানম সাহেব উত্তর করিলেন, "বা বা, আমি কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিতে চাহি না। তোমার উপর আমার অচলা ভক্তি, ছেলের যে অবস্থা খুব মন্দ তাহা নিজে খুব বুঝি। তবে তুমি যে ঔষধের কথা বলিতেছ তাহা যদি

ভাল বলিয়া জান এখনই আনিয়া দেও।” আমি মনে করিলাম, জানাজানি ঈশ্বর জানের, ইহার পূর্ব্বে ত এ ঔষধ এ রোগে কখন দি নাই, তবে আমার অভিপ্রায় মন্দ নয় জানিয়া আপনাকে ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়া ঔষধটী আনিয়া এক ফোঁটা করিয়া আধ ঘণ্টা অন্তর দিতে লাগিলাম। এরূপ ৫।৭ বার দিবার পরেই বাহ্যে ক্রমে ধরিয়া আসিতে লাগিল, বমি, তখন ও হইতেছে। পরে বাহ্যে একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। ক্রমেই প্রাতঃকাল, সূর্য্যোদয়, আমার গুরুজী আসিয়া উপস্থিত। অমনি ঔষধের শিশিটী এমনই করিয়া লুকাইয়া রাখিলাম। যে তাঁহার চোদ্দপুরুষের বাবা ও সে শিশিটা না পান। গুরুজী আসিয়া বলিলেন হাঁ রোগী এখন অনেক ভাল আছে। কি ঔষধ দিতেছেন কার্ব্বোভেজিটেবিলিস? আমি কহিলাম হাঁ, আবার বলিলেন না.আর্সেনিক দিতেছেন? তাতে ও বলিলাম ‘হাঁ’। তার কতকক্ষণ পরেই আমার গুরুজী চলিয়া গেলেন। যাহা হউক, বাহ্যে বন্ধ হইল, বমি আর বন্ধ হয় না। তখন মনে করিলাম বমি বন্ধ সহজে হইবে। তাহার পর এপিকাকিউয়ানা ৩ আধঘণ্টা অন্তর দিতে লাগিলাম। এপিকা কিউয়ানা এ রকম বমির এক রকম ব্রহ্ম অস্ত্র। এপিকা কিউয়ানা ২।৬ বার দিবার পরই বমি ও বন্ধ হইয়া গেল। তাহার পর অন্যান্য ঔষধ দেওয়াতে ছেলেটী ৫।৭ দিনের মধ্যে বেশ আরোগ্য হইয়াগেল।

CARBO VEGETABILIS কার্ব্বোভেজিটেবিলিস্।

আমরা প্রথম প্রথম যখন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা আরম্ভ করি, প্রায় ২০।৩০ বৎসর পূর্ব্বে কার্ব্বোভেজিটেবিলিসের বড় বেশী ব্যবহার ছিল। রোগী দুর্ব্বল হইলে নাড়ী উঠাইবার নিমিত্ত কার্ব্বোভেজিটেবিলিস্ এক মাত্র ঔষধ বলিয়া তখন জানা ছিল। এখন দেখিতেছি, কার্ব্বোভেজিটেবিলিসের ধুম ধাম অনেকটা কমিয়াছে। অনেকের বিশ্বাস কার্ব্বো ভেজিটে বিলিস্ স্নায়ু সমষ্টিকে উত্তেজিত করে। কিন্তু ইটি কেবল বিশ্বাস মাত্র। কার্ব্বো ভেজিটেবিলিস্ খাইয়া যে সমস্ত লক্ষণ উপস্থিত হয় তাহাতে এ বিষয়ের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে অতিশয় মুমূর্ষু অবস্থায় দুর্ব্বল রোগীকে কার্ব্বোভেজিটেবিলিস্ প্রয়োগ করিলে নাড়ী বেশ সবল হয় দেখা গিয়াছে। Doctor Bahr লিখিয়াছেন" It has done us not infrequently good service at a period of a cholera process, where most of us are at a loss how to lay hold upon an effective remedial agent. It is indicated at the asphictic Stage, when vomitting and purging have ceased, when there are no cramps any more, the patient lying, moreover, extremely prostrated-corpse-like. Carbo follows often after Arsenic ; more frequently, however, it suits in cases void of reactionary signs from the very beginning."

Cholera Asphyxia কলারা য়্যাস্ফিকশিয়ার কথা পূর্ব্বে এক

প্রকার বলা হইয়াছে। কলারা য়্যাস্ফিকশিয়াতে রোগী নিশ্বাস প্রশ্বাস স্বাভাবিক মত লইতে পারে না বলিয়া হাঁপাইয়া মরে। ওলাউঠার এ রকম রোগী বিস্তর দেখা গিয়াছে যে, কয়েকবার বাহ্যে হইবার পরই আর কোন সাংঘাতিক লক্ষণ না হইয়া রোগী হাঁপাইতে আরম্ভ করে, আর ঐ হাঁপানিতেই হয় ত শ্বাস উপস্থিত, আর ঐ অবস্থাতেই রোগী প্রাণ ত্যাগ করে। ভাল ভাল ডাক্তা-রেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, এই রূপ অবস্থায় রোগীর হাঁপানি হইবার কারণ এই যে শরীরের সুস্থ অবস্থায় অক্‌সিজন্ নামক গ্যাস নিশ্বাসের সহিত শরীরে প্রবেশ করিয়া রক্ত পরি-স্কার করে। খারাপ রকম ওলাউঠায় ঐ রক্ত পরিস্কার কার্য্যের বিঘ্ন জন্মায়, অর্থাৎ ঐ রূপ অবস্থায় নিশ্বাসের সহিত অক্‌সিজন্ নামক গ্যাস যাওয়াতে ও শরীরের শোণিতকে রীতিমত পরিস্কার করিতে পারে না। অথবা ওলাউঠার বিষ শরীরে প্রবেশ করিয়া যেরূপ অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিকৃতি জন্মায় সেইরূপ রক্তের ও একপ্রকার বিকৃতি জন্মান স্বাভাবিক। আর সেই বিকৃতি জন্যই রক্ত নিজে সুস্থ অবস্থার ন্যায় ঐ রক্ত পরিষ্কারক অক্‌সিজন গ্যাস সমধিক পরিমাণে গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না, অর্থাৎ ওলাউঠার বিষ জন্য দূষিত রক্তে অক্‌সিজন গ্রহণী শক্তির খর্ব্বতা জন্মে। একেত পীড়ায় নিশ্বাস প্রশ্বাসের বিকৃতি জন্য সমধিক পরিমাণে অক্‌সিজন গ্যাস ফুস্‌ফুসে আসিয়া পৌছে না, তাহাতে আবার শরীরের সমস্ত রক্ত এরূপ বিকৃত ও অকর্ম্মণ্য যে, ঐ অক্‌সিজন গ্যাসের সমস্ত টুকু নিজের কার্য্যে লাগাইতে পারে না। সুতরাং শরীরে অপরিস্কার রক্ত পরিস্কার হইতে না পারায় পরিস্কার রক্তের ন্যায় স্বাভাবিক মত শরীরেরসমস্ত স্থানে পরিচালিত

হইতে পারে না। অপরিষ্কার রক্ত কাল গাঢ়, অধিক ক্লেদ মিশিলে অধিকতর গাঢ় হইয়া যায়। তরল দ্রব্য না হইলে ধমনী ও শিরা দিয়া কিরূপে প্রবাহিত হইতে পারে। ইহা ভিন্ন কতকটা হৃদ্‌পিণ্ড, ধমনী ইত্যাদির নিস্তেজতা জন্য, ও কতকটা শরীরের রক্ত রীতিমত পরিস্কৃত না হওয়া জন্য শরীরের ভিতরে ধমণীতে ও হৃদ্‌পিণ্ডে রক্ত জমিয়া থাকে। আর রক্ত জমিয়া থাকে বলিয়া শরীরের সমস্ত স্থানে রক্তের চলাচল হয় না। আর ফুফ্‌ফুসির ভিতরে ঐরূপ রক্ত জমিয়া থাকিলে ফুফ্‌ফুসের কার্য্য ও ভালরূপ হইতে পারে না। আর ফুস্‌ফুসের কার্য্য ভাল রূপ হইতে পারে না বলিয়াই শরীরে অপরিস্কার রক্তের অংশ ক্রমেই বাড়িতে থাকে। কারণ একে ত রোগ জন্যই রক্তের অক্‌সিজেন গ্রহণী শক্তির অভাব বা স্বল্পতা বিধায় রক্ত রীতিমত পরিস্কার হইতে পারে না; তাহার উপর আবার ফুস্‌ফুসে রক্ত জমিয়া ফুস্‌ফুসের কার্য্যের বিঘ্ন জন্মায়, আর ফুস্‌ফুসের কার্য্যই হইল রক্ত পরিস্কার করা, অতএব ফুস্‌ফুসের কার্য্যের বিঘ্ন জন্মাইবার জন্যই অপরিস্কার রক্ত পরিস্কার না হইয়া অপরিস্কার অবস্থাতেই থাকে। পরে অপরিস্কার রক্তের অংশ এতই বাড়িয়া উঠে যে, শরীরে রক্তের চলাচল প্রায় একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। কাযে কাযেই রোগী হাঁপাইয়া মরে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে অপরিস্কার রক্ত শরীরের ধমণী ও শিরা দিয়া সঞ্চালিত হইতে পারে না। অপরিস্কার রক্ত পরিস্কার রক্ত অপেক্ষা গাঢ় আর যত বেশী অপরিস্কার হয় তত আর বেশী গাঢ় হয়। আর ঐ রূপে গাঢ় হইতে হইতে অবশেষে এমনই গাঢ় হয়, যে সেরূপ গাঢ় রক্ত ধমনী ও শিরা দিয়া সঞ্চালিত হওয়া একেবারে অসম্ভব। রক্তের চলা-

চল না থাকিলে রোগী আর কি রূপে বাঁচে? এরূপ অবস্থায় কার্ব্বোভেজিটেবিলিস্ Carbo Vegetabilis একটী চমৎকার ঔষধ। কার্ব্বোভেজিটেবিলিসের আর কোন গুণ থাক্ আর না থাক্ শরীরের রক্তে অক্সিজন নামক গ্যাস প্রদান করিয়া ঐ রক্তকে পরিস্কার করা কার্ব্বোভেজিটেবিলিসের একটী প্রধান গুণ। বলা বাহুল্য যে, যখন পরীক্ষায় জানা যায় বা রোগীর লক্ষণে এরূপ স্পষ্ট বুঝা যায় যে, রোগীর ঐ রক্ত পরিস্কার কার্য্যের বিঘ্ন জন্মাইয়াছে ও রোগীর অধিকাংশ কষ্ট ঐ জন্যই হইতেছে তখন আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া একেবারে কার্ব্বোভেজিটেবিলিস্ প্রয়োগ করা অতীব আবশ্যক। কারণ এ অবস্থায় কার্ব্বোভেজিটেবিলিসের ন্যায় আর দ্বিতীয় ঔষধ নাই। এ স্থলে আর একটী কথা বলা আবশ্যক, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে কোলাপস্ অবস্থায় রক্তের ন্যায়, বা একেবারে রক্ত রোগীর গুহ্য দ্বার দিয়া আস্তে আস্তে চোয়াইয়া পড়ে। এ অবস্থায় অনেক হোমিওপ্যাথি ডাক্তারই Mercurius corrosivus র্মাকিউরিয়স্ করোসাইভস্ দিয়া থাকেন। অধুনা এ স্থলে কেহ কেহ রিসিনস্ ও প্রয়োগ করেন। যাহা হউক, কার্ব্বোভেজিটেবিলিসের কথা বলিতে বলিতে এই লক্ষণে সম্বন্ধে কার্ব্বোভেজিটেবিলিসের উপকারিতা বিষয় একটু না বলিয়া থাকিতে পারি না।

আমার প্রিয় বন্ধু রাধা কান্ত ঘোষ ওলাউঠার এক খানি ইংরাজি পুস্তক লিখিয়াছেন, তাহাতে র্মাকিউরিয়স্ করোসাইভসের অনেক গুণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন বটে, কিন্তু এই রূপ রক্ত বাহ্যে সম্বন্ধে মাকিউরিয়স্ একটু বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করিতে হয়। বাহ্যের সহিত আম রক্ত থাকিলে মাকিউরিয়স্

করোসাইভাস্ প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার হয় বটে, কিন্তু আমি দেখিয়াছি যে, কোলাপ্‌স্ অবস্থায় অন্যান্য লক্ষণের সহিত একেবারে ডাহা রক্ত বাহ্যে হইলে কার্ব্বোভেজি টেবিলিসের মত কোন ঔষধেই ও রূপ উপকার দর্শে না। অনেক দিন হইল কলিকাতার পাথুরিয়া ঘাটার একটী স্ত্রীলোকের চিকিৎসার কথা মনে পড়িল। পদ্মাসনা দেবী, বয়স প্রায় ১৮।১৯ বৎসর, ওলাউঠা রোগে পীড়িত হন। তখন হোমিওপ্যাথি বেশী প্রচলিত ছিল না। সুতরাং প্রথম অবস্থায় নানা রকম য়্যালপ্যাথি ঔষধ দেওয়া হয়। রোগীর যখন কোলাপস্ উপস্থিত হইল বাচিবার আর বিন্দু মাত্র আশা নাই তখন অন্যের জল সাধের হিসাবে রোগীর আত্মীয়েরা হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করিবার মনন করিলেন। ৺রাজেন্দ্র দত্ত তখন জীবিত আছেন। রোগীর পিতা রাজেন্দ্র বাবুর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়া রোগীর সমস্ত লক্ষণ বলিলেন। রাজেন্দ্রবাবু সমস্ত শুনিয়া ঐ রোগিণীর চিকিৎসা করিতে আমাকে পাঠাইয়া দিলেন আমি যাইয়া দেখিলাম রোগীটা যাহার পর নাই দুর্ব্বল, এক প্রকার আর মরা অবস্থায় পড়িয়া আছে। সর্ব্বাঙ্গই প্রায় বরফের মত শীতল, নাড়ীর নাম মাত্র নাই ঘণ ঘণ নিশ্বাস পড়িতেছে, বোধ হইল যেন ১।২ ঘণ্টার মধ্যেই জীবন শেষ হইবে। রোগীর ঐ অবস্থায় গুহ্য দ্বার দিয়া একেবারে ডাহা রক্ত পড়িতেছে। আমি প্রথম যাইয়াই মার্কিউরিয়স্ করোসাইভস্ দিলাম। তাহাতে কোন উপকার দর্শিল না। তাহার পর ২১ ডোস এপিকাকিউয়ানাও দিলাম। এপিকাকিউয়ানাও অবস্থার সহিত তত মিলে না বটে, তথাপি কি করি দেখি যদি

ইহাতে কোন উপকার হয় এই বিবেচনা করিয়া এপিকাকিউ-য়ানা দিয়াছিলাম। তাহার পর, রাজেন্দ্র বাবুর সহিত দেখা হইল। আমি যে যে ঔষধ দিয়াছিলাম তাঁহাকে বলিলাম। আর ঐ সকল ঔষধে যে কিছু উপকার হয় নাই তাহা ও বলিলাম। তিনি অনেকক্ষণ ভাবিয়া চিন্তিয়া কহিলেন, "বাবু একবার কালা-চাঁদ দিয়া দেখিয়াছিলে কি?" বলা বাহুল্য যে কার্ব্বোভেজিটে-বিলিস্ সাধারণ কাঠের কয়লা মাত্র। তাঁহার ঐ কথাতেই আমি বুঝিতে পারিলাম কালাচাঁদের অর্থ কার্ব্বো, উত্তর করিলাম "না, কার্ব্বোভেজিটেবিলিস্ দেওয়া হয় নাই" আর তৎক্ষণাৎ একখানি গাড়ী লইয়া রোগীর বাটীতে যাইয়া পৌছিলাম। ও কার্ব্বোভেজিটেবিলিস্ ৬ এক ফোটা মাত্রায় এক ঘণ্টা অন্তর দিতে আরম্ভ করিলাম আশ্চর্য্যের বিষয় হোমিওপ্যাথিক ঔষধ লক্ষণ ঠিক করিয়া প্রয়োগ করিতে পারিলে, অনেক সময় যেন ডাকিলে উত্তর দেয়। বাস্তবিক ২।৩ ঘণ্টা ঐ প্রণালীতে এই ঔষধ দিবার পরই রক্ত বাহ্যে বন্ধ হইল ও রোগীকে ও যেন একটু সবল দেখা গেল। পরে আস্তে আস্তে ব্রাহ্মণ কন্যাটী আরোগ্য হইলেন।

ওলাউঠার কোলাপ্সের অবস্থায় বেশী হউক কম হউক, নিশ্বাস লইবার কষ্ট প্রায়ই থাকে। এইরূপ শ্বাসের কষ্ট নানা কারণ বশতঃ ঘটিয়া থাকে। অতএব ঐ সকল কারণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিলেই ভাল হয়। হৃদ্‌পিণ্ড ও ফুস্-ফুসের অবস্থা ভালরূপ পরীক্ষা করিয়া না দেখিতে পারিলে এই উপসর্গের উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগ করা দুষ্কর। আর হৃদ্‌পিণ্ড ও ফুসফুসের অবস্থা পরীক্ষা করার জন্য একটু ডাক্তারী শাস্ত্রে

ব্যুৎপত্তি থাকা আবশ্যক। অন্ততঃ হৃদ্‌পিণ্ডের ও ফুস্‌ফুসীর সহজ অবস্থা মোটামাটী এক রকম জানা না থাকিলে, ঐ হৃদ্‌পিণ্ড বা ফুস্‌ফুসির কোন রকম বিকৃতি ঘটিয়াছে তাহা উপলব্ধি করা যায় না। যাহা হউক মোটামাটী হিসাবে যত দূর ঐ শ্বাসের কষ্টের পার্থক্য করা যায় তাহার বিষয় নিম্নে কিছু বলিতেছি। শ্বাসের কষ্ট সাধারণতঃ এই কয়েকটী কারণে সচরাচর হইয়া থাকে। প্রথম, হৃদ্‌পিণ্ডের দুর্ব্বলতা; দ্বিতীয়, হৃদ্‌পিণ্ডে রক্ত জমিয়া হঠাৎ অল্প সময়ের মধ্যেই রক্তের চলাচল বন্ধ হইয়া যাওয়া, তৃতীয়, ফুস্‌ফুসের ভিতর রক্ত জমিয়া ফুস্‌ফুস এক রকম নিরেট পদার্থ হইয়া যায়। তখন ফুস্‌ফুসের ভিতরে স্বাভাবিক অবস্থায় যত টুকু হাওয়া প্রবেশ করিতে পারে, ফুস্‌ফুসে রক্ত জমিয়া ফুস্‌ফুস্ এক প্রকার নিরেট পদার্থ হইলে তত খানি হাওয়া প্রবেশ করিতে পারে না বলিয়া হাঁপ উপস্থিত হয়। চতুর্থ, ফুস্‌ফুসের দুর্ব্বল ও নিস্তেজ অবস্থা জন্য, ফুস্‌ফুস একপ্রকার ন্যাতা প্যাতা হইয়া পড়ে, স্বাভাবিক অবস্থার মত হাওয়া পাইয়া সমুচিত রূপে ফুলিয়া উঠিতে পারে না। অতএব ফুস্‌ফুসে স্বাভাবিক অবস্থার মতন তত টুকু হাওয়া স্থান পায় না। বলা আবশ্যক যে পূর্ব্বে যে রক্ত জমার কথা বলিয়াছি সে স্থলে ফুস্‌ফুস রক্ত জমিয়া নিরেট হাওয়া জন্য তাহাতে কম হাওয়া প্রবেশ করে। ফুস্‌ফুস রক্ত জমা জন্য নিরেট না হইলেও নিস্তেজ হইয়া ন্যাতা প্যাতা হইলে হাওয়া প্রবেশ করিলেও স্বাভাবিক মত ফুলিয়া উঠে না। অতএব হাওয়া অধিক পরিমাণে ফুস্‌ফুসে যাই-লেও স্থান পায় না। সুতরাং কার্য্যে ফুস্‌ফুস রক্ত জমিয়া নিরেট হইয়া যাওয়াতে ও যেরূপ ফুস্‌ফুসের পরিসর অল্প হইয়া যায়

নিস্তেজ হইয়া ন্যাতা প্যাতা হইলে ও ঠিক সেইরূপ ঘটে। অত-এব, দুই অবস্থার কারণ ভিন্নরূপ হইলে ও কার্য্য একপ্রকার। ফুস্ফুসে রক্ত জমা অবস্থাতে ও যেরূপ নিশ্বাস প্রশ্বা-সের কষ্ট হয় ফুস্ফুস নিস্তেজ হইয়া ন্যাতা প্যাতা হইয়া পড়িলে ও নিশ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট সেইরূপ হইয়া থাকে। পঞ্চম, হৃদ্-পিণ্ড ও ফুস্ফুসে রক্ত জমা বা নিস্তেজ অবস্থা জন্য অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়া ভিন্ন কখন কখন কার্য্যের বৈলক্ষণ্য দেখা যায়। অর্থাৎ পরীক্ষা করিয়া দেখিলে হৃদ্পিণ্ড কি ফুস্ফুসের কোন রূপ বিশেষ বিকৃতি দেখা যায় না বটে, তথাপি যেন কার্য্যের বিঘ্ন জন্মে। ষষ্ঠ, এই সমস্ত হৃদ্পিণ্ড ও ফুস্ফুসের বিকৃতি ভিন্ন পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ওলাউঠা রোগে রক্তের স্বাভাবিক তরল অবস্থা থাকে না বলিয়া নিশ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট হয়। রক্ত স্বাভা-বিক তরল অবস্থায় থাকিলে সুন্দর রূপে ধমনী ও শিরার ভিতরে সঞ্চালিত হইতে পারে। কিন্তু ঐ শোণিত অধিকতর গাঢ় হইলে বা তাহাতে অন্যরূপ বিকৃতি জন্মিলে স্বাভাবিক মত শরীরের নানা স্থানে সঞ্চালিত হইতে পারে না। আর শোণিত শরীরের নানা স্থানে স্বাভাবিক মত সঞ্চালিত হইতে না পারিলে শরীরের অন্যান্য কার্য্য যেরূপ ভাল রূপে চলিতে পারে না, সেইরূপ নিশ্বাস প্রশ্বাসের কার্য্য ও স্বাভাবিক মত সুচারু রূপে চলে না।

Doctor Rane ডাক্তার রেণ লিখিয়াছেন যে, কখন কখন নিশ্বাস প্রশ্বাশের মাংসপেশীর আক্ষেপ জন্য কোলাপ্স্ অবস্থায় রোগীর শ্বাস উপস্থিত হইয়া থাকে। ভাল ভাল ডাক্তারেরা স্থির করিয়াছেন যে, ওলাউঠার কোলাপ্সের অবস্থায় নিশ্বাস প্রশ্বাসের মাংসপেশীর আক্ষেপ উপস্থিত হয় না। আর বাস্ত-

বিক কোলাপস্ অবস্থায় একে ত কোনরূপ আক্ষেপ প্রায় খুব অল্প ঘটিয়া থাকে, তাহাতে নিশ্বাস প্রশ্বাসের মাংসপেশীর আক্ষেপ হওয়া প্রায় অসম্ভব বলিলেও হয়। যাহা হউক, এইরূপ দুই একটী ডাক্তারের মত বলিয়া এস্থলে একথার একটু উল্লেখ করা হইল।

যে স্থলে হৃদ্‌পিণ্ড কি ফুস্‌ফুসের কোনরূপ বিকৃতির উপলব্ধি হয় না, অথচ রক্তের বিকৃতির জন্য রোগীর নিশ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট হয়, সেই স্থলে Argentum Nitricum আর্জেণ্টম্ নাইট্রিকম্ ৩ ডেসিমেল ডাইলিউসন অবস্থা বিবেচনায় ১৫ মিনিট ৩০ মিনিট বা এক ঘণ্টা অন্তর দিলে বিশেষ উপকার হয়।

হৃদ্‌পিণ্ডের দুর্ব্বলতা জন্য হৃদ্‌পিণ্ডের কার্য্যের বৈলক্ষণ্য জন্মায়। আর রোগী এক রকম যেন বোকার মত জ্ঞান শূন্য হইয়া থাকে, অনেক বকে, ভুল বকা নয়, কিন্তু অনেক কথা কয়। আর নিজে জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়া নানা প্রকার বিলাপ করে। নিশ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট ত আছেই। এ অবস্থায় একোনাইট্ মাদার এক ফোঁটা মাত্রায় আধ ঘণ্টা কি এক ঘণ্টা অন্তর দিলে যথেষ্ট উপকার হয়। একোনাইট্ সম্বন্ধে আরও বলা আবশ্যক যে, যে অতিশয় বলিষ্ঠ যুবা লোকদিগের ওলাউঠার ২।৪ দাস্তের পরেই এইরূপ অবস্থা হইয়া থাকে; এ অবস্থায় ঐ রূপ রোগীর একোনাইট্ মাদার একটী ব্রহ্মাস্ত্র।

ঢাকার পোষ্ট মাষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু বলরাম ঘোষ,তাঁহার শালী, বয়স ২০।২১ বৎসর, বিলক্ষণ বলিষ্ঠ সজোর, সধবা, সন্তানাদি কিছুই হয় নাই। কর্ম্ম কাজে খুব মজবুত, এমন কি সংসারের সমস্ত কার্য্য নিজেই করেন,তাহাতে কোন কষ্ট নাই। হঠাৎ এক

দিন তিনবার বাহ্যে, আর ৪।৫ বার বমির পর একেবারে শ্বাস উপস্থিত। রোগের আরম্ভ শেষ রাত্রে কি সকালা হইতেই হয়, স্ত্রীলোকদের যেরূপ স্বভাব পূর্ব্বে বে-আরামের কথা কাহাকেও বলে নাই, একেবারে যখন শ্বাস উপস্থিত তখন বলরাম বাবু জানিতে পারিলেন। বলরাম বাবু পোষ্ট আফি-সের অন্য প্রকোষ্ঠে পরিবার লইয়া থাকিতেন। তখন ও পোষ্ট আফিসের অন্য অন্য কর্ম্মচারীরা আসে নাই, নিজে আফিস ঘরে বসিয়া আফিসের কার্য্য করিতেছিলেন, এমন সময় হঠাৎ তাঁহার স্ত্রী চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। দ্রুত বেগে বাড়ীর ভিতরে যাইয়া দেখেন তাঁহার শালীর একেবারে শ্বাস উপস্থিত স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিলেন যে সকালা হইতেই কয়েকবার বাহ্যে হইয়াছিল ও কয়েক বার বমিও হইয়াছে কাহাকে বলে নাই। একেবারে এইরূপ অবস্থা হওয়াতে জানা গেল যে সকালা হইতেই তাহার পীড়ার আরম্ভ হইয়াছে। আমার বাসা পোষ্টাফিস হইতে অধিক দূরে নয়, বলরাম বাবু নিজেই আমার নিকট হাঁপাইতে হাঁপাইতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন, "তুমি শীঘ্র একবার আমার বাটীতে আইস, আমার শালীর ওলাউঠা হইয়াছে, শ্বাস উপস্থিত, আমরা তাঁহাকে যাইয়া জীবিত দেখিব কি না সন্দেহ।" বলরাম বাবু আমার বয়সে বড়, তাঁহাকে আমি বড় মান্য করিতাম দাদা বলিয়া ডাকি-তাম। তিনি ও আমাকে ছোট ভাইয়ের ন্যায় বড় স্নেহ করি-তেন। অতএব, আমিও তখন নবাব বাড়ী যাইতে ছিলাম. সেখানে আর না গিয়া বলরাম বাবুর বাটীতে চলিলাম। ঔষ-ধের বাক্স আমার সঙ্গেই ছিল। যাইয়া দেখি বাস্তবিক একে-

বারে শ্বাস উপস্থিত। বোধ হইল যেন আধ ঘণ্টার মধ্যেই রোগীর জীবন শেষ হইবে। ভাবিলাম কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি বলরাম বাবু আমাকে ছোট ভাইয়ের মত মনে করিতেন। অতএব বলরাম বাবুর স্ত্রী ও আমাকে ভিন্ন ভাবিতেন না। প্রথম যাইয়া ত কতক গুল বলরাম বাবুকে, কতকগুলা বলরাম বাবুর স্ত্রীকে রাগের ভরে তিরস্কার করিলাম। কহিলাম "কি আশ্চর্য্য। আমি এত নিকটে থাকি আর ছেলে পিলের মধ্যে ছর্দ্দি, কাসী হইলেও আমাকে আগে খপর দেওয়া হয়। আর এই স্ত্রীলোকটীর এমন মারাত্মক বেআরাম, ইহার কোন খপরই পূর্ব্বে আমাকে দেওয়া হইল না!" যাহা হউক, পরে মনে করিলাম আর রাগ করিলে কি হইবে? রোগীর ফুস্‌ফুস ও হৃদ্‌পিণ্ড পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম কোন খানে কিছু সাংঘাতিক বিকৃতি নাই। তাহা নওয়ায়, রোগীর এক শ্বাসের কষ্ট ভিন্ন রোগের অন্য কোন মারাত্মক লক্ষণ দেখা যায় না। নাড়ী যে একেবারে নাই, তাহাও নয়। কোলাপ্‌স্‌ হইয়া হাত পা যে একেবারে বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে তাহাও নয়। রোগীর সমস্ত শরীর, বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিলে বোধ হয় না যে এ রোগী আধ ঘণ্টা পরে মরিবে। কিন্তু শ্বাসের অবস্থা বিবেচনা করিলে এই রূপ মনে হয় যে আধ ঘণ্টা কেন? বোধ হয় দশ মিনিট ও এ রোগী বাঁচিবে না, বাহ্যে মোটে তিনবার হইয়াছে, প্রথম দুইবার বাহ্যের সহিত প্রস্রাব ও হইয়াছিল. বাহ্যে অপেক্ষা বমি অধিক হইয়াছে। প্রথম পর্য্যন্ত বমি প্রায় ৮।৯ বার হইয়াছে বলিল। মরিবার পূর্ব্বে যে এক রকম শয্যা কণ্টকীর মত হয়, রোগী ছট্‌ ফট্‌ করে,

আর রোগীর যে এক প্রকার মৃত্যু যন্ত্রণা হয় তাহা অন্য লোকেও বুঝিতে পারে, এ রোগীর সেরূপ কিছুই নাই। রোগী দিব্য সুস্থির ভাবে শুইয়া আছে। কেবল ঘণ ঘণ শ্বাস পড়িতেছে। আর লোকে ভয় পাইলে যে রূপ হাঁপাইয়া হাঁপাইয়া এক রকম যেন কত কি বলে, আর ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া থাকে, এ স্ত্রীলোকটীর ও সেইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল। কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে ঠিক উত্তর দিতে পারে না। আর পারিলেও অনেক ক্ষণ পরে যেন বুঝিয়া অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া উত্তর দেয়। কথা জিজ্ঞাসা করিলে তার পরক্ষণই উত্তর দিতে পারে না বটে, কিন্তু আপন মনে কত কি বলে। বলরাম বাবুর ছোট ছেলেটীকে প্রায় সেই মানুষ করে। সুতরাং বলরাম বাবুর অন্যান্য ছেলে অপেক্ষা ঐ ছেলেটীর প্রতি তাঁর মায়া বেশী। "নগেন রহিল, আমি আর বাঁচিব না, নগেনকে যেন কেহ মারে না, তার উপর যেন কেউ রাগ করে না, নগেন আমার মিষ্টি খেতে ভাল বাসে, ঘরে একেবারে যেন বেশী করে চিনি কিনে রাখা হয়, নগেনের আমার ফুল গাছের বড় সক নগেনের ফুল গাছ গুলিতে যেন রোজ জল দেওয়া হয়।" ইত্যাদি নানা কথা কহিতেছে। বলরাম বাবুর ছোট ছেলেটীর নাম নগেন্দ্রনাথ। যাহা হউক, এ রকম অবস্থা দেখিয়া নানারূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া মনে করিলাম যে এ অবস্থায় একোনাইট্ মাদার দেওয়াই আবশ্যক। বাঁচে যদি ত এ ঔষধেই বাঁচিবে। অতএব একোনাইট্ মাদার এক ফোঁটা করিয়া পোনের মিনিট অন্তর দিতে আরম্ভ করিলাম। দুই ঘণ্টা রোগীর নিকট বসিয়া আমি নিজেই ৮ বার ঔষধ খাওয়াইলাম। তখন দেখি রোগী যেন

অনেকটা ভাল। তাহার পর বলরাম বাবুকে বলিলাম। "দাদা আপনি নিজে বসিয়া এখন এক ঘণ্টা অন্তর এই ঔষধটী খাওয়ান, আমি দুই ঘণ্টা পরে আবার আসিতেছি।" আমার যাইতে একটু বিলম্ব হইল। আমি প্রায় ১২টার সময় যাইয়া উপস্থিত। হইলাম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি বলরাম বাবু আমাকে ছোট ভাইয়ের ন্যায় স্নেহ করিতেন, আর বলরাম বাবু নিজে লোকটী অতি সুন্দর। এত প্রসস্থ অন্তঃকরণের ভদ্রলোক বোধ হয় অতি কম আছে। আমি রোগীর ঘরে যাইয়া প্রবেশ করিবা মাত্রেই বলরাম বাবু আস্তে ব্যস্তে উঠিয়া আসিয়া বলিলেন "ভাই। তোকে একবার কোলে করি আয়! ভাই, বড় চমৎকার ডাক্তারী করিয়াছিস্। এক ঔষধেই রোগী আরোগ্য হইয়াছে। "বাস্তবিক যাইয়া দেখি, রোগীর আর সেরূপ নিশ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট একেবারে নাই। নাড়ীও বেশ সবল হইয়াছে, জ্ঞানের বৈলক্ষণ্য মোটেই নাই, তখন বেশ গায়ে মাথায় কাপড় দিয়া শুইয়া আছে। বলরাম বাবুর স্ত্রী হাসিয়া বলিলেন।" "ডাক্তার ঠাকুর পো, এখন কামিনীর লজ্জা হইয়াছে, এখন কামিনী লজ্জায় তোমাকে দেখে মাথায় কাপড় দিয়ে বউ সেজে শুইয়া আছে"। বলরাম বাবুর শালীর নাম কামিনী, কামিনী একটু মুচ্‌কে হেসে চুপ করিয়া রহিল। বলরাম বাবুর স্ত্রী কহিলেন "এতক্ষণ যে খিদে খিদে করিতেছিলি ডাক্তার বাবুকে জিজ্ঞাসা কর্ না, কি খাবি"? কামিনী খাবার কথায় একটু লজ্জিত হইয়া আর একটু ঘোমটা টানিয়া দিল! আমি পরিহাস করিয়া কহিলাম "ও যেমন সমস্ত লোককে ভয়ঃ দেখাইয়াছে। ওকে আমি ৮ দিন সাগু খাওয়াইয়া রাখিব।" যাহাহউক, ক্ষুধায়

কথা শুনিয়া আমি মনে মনে আনন্দিত হইলাম, কিন্তু এ রোগীকে আর কি খাইতে দিব একটু জল সাগু তৈয়ার করিয়া ছাঁকিয়া অল্প দিতে বলিলাম। যাহাহউক, বলরাম বাবুর শালীকে তাহার পরে আর কিছু ঔষধই দিতে হইল না, তিন চারি দিনের মধ্যেই বিলক্ষণ আরোগ্য হইয়া উঠিলেন। ভাল ভাল ডাক্তারেরা কহিয়াছেন যে, ওলাউঠা রোগ যেরূপ ভয়াবহ! ঔষধ ঠিক হইলে অল্প সময়ের মধ্যে আরোগ্য ও সেইরূপ সুন্দর রূপে হয়। আর একটা কথা বলা আবশ্যক। ওলাউঠা রোগের চিকিৎসায় কোন অবস্থা দেখিয়াই চিকিৎসকের একেবারে হতাশ হওয়া উচিত নয়। আমি বিস্তর দেখিয়াছি যে ওলাউঠায় এখন মরে তখন মরে রোগীও ঔষধ ঠিক হইলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে আরোগ্য হইয়া উঠিয়াছে অতএব ওলাউঠার রোগীর যত খারাপ অবস্থাই হউক না কেন? তথাপি আরোগ্য হইবার সম্ভাবনা আছে ও আরোগ্য হইয়াও থাকে। অতএব রোগীর খারাপ অবস্থা দেখিয়া চিকিৎসকের একেবারে হতাশ হওয়া কোন মতেই উচিত নয়। ওলাউঠার রোগী কোন অবস্থা হইতে যে একেবারে বাঁচিতে পারে না, ইহা বলা একেবারে অসম্ভব। অতএব "যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ" এই কথাটী অন্যান্য রোগে সত্য হউক না হউক, ওলাউঠা রোগে একেবারে সত্য। বাস্তবিক শ্বাস থাকা পর্য্যন্ত ওলাউঠা রোগীর বাঁচিবার সম্ভাবনা আছে। যে রোগীকে মনেকরা গিয়াছে যে তাহার আর কোন মতেই বাঁচিবার আশা নাই, সে রোগীও সুচিকিৎসায় স্বচ্ছন্দে বাঁচিয়া উঠিয়াছে।

যে অবস্থায় একোনাইট্‌ দিবার কথা লিখিলাম, অর্থাৎ শ্বাসের সহিত যদি রোগীর আক্ষেপ থাকে, সমস্ত শরীরে কাল-

ঘাম হয়, বাহ্যে বমি একেবারে বন্ধ হইয়া যায়, তবে একোনাইটের পরিবর্ত্তে ক্যামফর্ দেওয়া ভাল।

আর্সেনিক ARSENIC.

রোগী যাহার পর নাই অস্থির, নিশ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট হয়, বুকের উপর যেন একটা ভারি জিনিষ, অথবা কোন দ্রব্য যেন বুক চাপিয়া ধরিয়া রহিয়াছে বোধ হয়; হৃদ্পিণ্ড ক্রমে যেন অবশ হইয়া আইসে; কখন কখন হৃদ্পিণ্ডের ঐরূপ অবশ অবস্থার পূর্ব্বে, হৃদ্পিণ্ডের ধড়ধড়ী একটু বেশী বাড়ে, অর্থাৎ স্বাভাবিক অবস্থা হইতে হৃদ্পিণ্ডের বীট একটু দ্রুত হয়; রোগী যাহার পর নাই দুর্ব্বল; এ অবস্থায় আর্সেনিক ঔষধটী দিলে অধিক ফল পাওয়া যায়।

Hydrocyanic Acid হাইড্রসিয়্যানিক্ য়্যাসিড্ অথবা Cyanide of Potassium সাইএনাইড্ অব পোটাশিয়ম্। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে আর্সেনিকের নিশ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট হইতে হাইড্রসিয়্যানিক্ য়্যাসিড্ বা সাইএনাইড্ অব পোটাশিয়মের কষ্টের কিছু বিভিন্নতা আছে। আর্সেনিকে নিশ্বাস টানিয়া লইতে কষ্ট বেশী হয়, কিন্তু হাইড্রসিয়্যানিক্ য়্যাসিড্ বা সাইএনাইড্ অব পোটাশিয়মের নিশ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট ঠিক উহার বিপরিত, অর্থাৎ হাইড্রসিয়্যানিক্ য়্যাসিড্ বা সাইএনাইড্ অব পোটাশিয়মে নিশ্বাস ফেলিতে কষ্ট হয়। অতএব নিশ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট থাকিলে নিশ্বাস লইতে কষ্ট কি ফেলিতে কষ্ট একটু লক্ষ্য করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করা আবশ্যক। অনেকানেক ভাল

ভাল ডাক্তারেরা কহেন যে হাইড্রসিয়্যানিক্ য়্যাসিড্ একেবারে রোগের শেষ অবস্থায় দেওয়া বিধেয়। অর্থাৎ ওলাউঠা পীড়ায় একে একে সমস্ত ঔষধ প্রয়োগ করিয়া যদি কোন বিশেষ ফল না পাওয়া যায়, আর ক্রমে ক্রমে রোগ বৃদ্ধি হইয়া একেবারে যা দশা উপস্থিত করে, তখন আমাদের দেশের গোপাল বসুর নাসের মত, একবার হাইড্রসিয়্যানিক্ য়্যাসিড্ প্রয়োগ করিয়া শেষ চেষ্টা করিয়া দেখা আবশ্যক। গোপাল বসুর নাসের কথা এদানিস্তন লোকের মধ্যে কেহই বোধ হয় জানেন না। আমরা ছেলে বেলায় দেখিয়াছি যে, যে রোগীই হউক চিকিৎসক হতাশ হইয়া জবাব দিলে, অথাৎ রোগীর একেবারে মরণাপন্ন অবস্থা হইলে গোপাল বসুর নাস দেওয়া হইত। গোপাল বসুর নাস একটী পুরাতন পেটেণ্ট ঔষধ। গোপাল বসুর নাস কি পদার্থে প্রস্তুত কেহই জানিতেন না, অদ্যাবধিও জানেন না। যাহাহউক, গোপাল বসুর নাসের কথা এখন আর একেবারেই শুনা যায় না। বলিতেছিলাম, যে হাইড্রসি-য়্যানিক্ য়্যাসিড্ বা সাইএনাইড্ অব পোটাশিয়ম্ হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় ওলাউঠা চিকিৎসার একেবারে শেষ ঔষধ। অতএব হাইড্রসি য়্যানিক্য়্যাসিড্ বা সাইএনাইড্ অব পোটাশিয়ম্ প্রয়োগ করিয়া রোগী বাঁচিলে একেবারে যমের ঘর হইতে ফিরিয়া আসিল বলা যাইতে পারে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে হাইড্রসি-য়্যানিক্ য়্যাসিড্ যদিও একটী উত্তম ঔষধ, কিন্তু হাইড্রসিয়্যানিক্ য়্যাসিডের একটী বিশেষ দোষ আছে। হাইড্রসিয়্যানিক্ য়্যাসিড্ প্রয়োগ করিয়া উপকার হইলেও সে উপকার স্থায়ী হয় না। অর্থাৎ হাইড্রসিয়্যানিক্ য়্যাসিড্ ১৫ মিনিট কি আধ ঘণ্টা অন্তর

দিয়া রোগীর একটু আশু উপকার দর্শিলেও ২।৩ ঘণ্টা পরে রোগী পুনরায় ঐরূপ মরণাপন্ন হইয়া পড়ে। অতএব হাইড্রসিয়্যানিক্ য়্যাসিডের উপকার অতি অল্প কাল স্থায়ী, সে উপকার অধিকক্ষণ থাকে না। ডাক্তার স্থালজার সাহেব কহিয়াছেন, যে হাইড্রসিয়্যানিক্ য়্যাসিডের পরিবর্ত্তে সাইএনাইড্ অব পোটাশিয়ম্ তৃতীয় ট্রাইটিউরেশন (চূর্ণ) অর্দ্ধ গ্রেণ কি এক গ্রেণ মাত্রায় আধ ঘণ্টা কি এক ঘণ্টা অন্তর প্রয়োগ করিলে যে উপকার হয় তাহা স্থায়ী। ডাক্তার স্থ্যালজারের মতে হাইড্রসিয়্যানিক্ য়্যাসিড্ না প্রয়োগ করিয়া সাইএনাইড্ অব পোটাসিয়ম্ দেওয়া অনেক অংশে ভাল। অতএব এক্ষণে ভাল ভাল হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারেরা হাইড্রসিয়্যানিক্ য়্যাসিডের স্থলে সাইএনাইড্ অব পোটাশিয়ম ব্যবহার করিতেছেন। আর পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে বাস্তবিক ডাক্তার স্থালজার সাহেবের কথাটী ঠিক। হাইড্রসিয়্যানিক্ য়্যাসিড্ অপেক্ষা সাইএনাইড্ অব পোটাশিয়মেই উপকার অধিক হয় ও ঐ উপকার অধিক ক্ষণ থাকে।

কখন কখন ওলাউঠার রোগী বিকারের ঝোঁকে বিছানা হইতে উঠিয়া চলিয়া বেড়ায় অর্থাৎ এদিকে রোগী যাহার পর নাই দুর্ব্বল, সমস্ত শরীর বরফের ন্যায় শীতল, ঘন ঘন শ্বাস বহিতেছে, রোগী একেবারে জ্ঞান চৈতন্য শূন্য কিন্তু এ অবস্থাতেও রোগী বিছানা হইতে উঠিয়া কখন কখন রাস্তায় চলিয়া বেড়ায়। এরূপ অবস্থায়ও সাইএনাইড্ অব পোটাশিয়ম্ উপকারী, তবে হোমিওপ্যাথি ভাল ভাল ডাক্তারেরা কহেন যে অবস্থা বিবেচনায় এ সময় Agaricus Muscarius য়্যাগ্যারি-

কস্ মস্‌কেরিয়স্ দেওয়া ভাল। Doctor Lauder Brunton ডাক্তার লডার্‌ব্রাণ্টন্ কহেন Muscarius effects especially the heart and intestinal canal; it produces uneasiness in the stomach, vomiting, purging, a feeling of constriction in the neck, want of breath, giddiness, fainting, prostration and stupor.

Lachesis লেকেসিস্ Naja Tripudiana নেজাট্রিপিউডিয়ানা ঔষধটী আমাদিগের কবিরাজীর সর্প বিষ ভিন্ন আর কিছুই নয়। পূর্ব্বাবধি আমাদিগের মধ্যে এইরূপ মুমূর্ষু অবস্থায় সর্পবিষ প্রয়োগ করিবার প্রথা প্রচলিত আছে। যাহা হউক, লেকেসিস্ বা নেজা প্রয়োগ করিবার লক্ষণ গুলীর মধ্যে শ্বাসের কষ্টই অধিক। ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ে, আর ঘন ঘন নিশ্বাসের মধ্যে একটু প্রভেদ আছে। একপ্রকার ফুস্‌ফুসের ভিতরে স্বাভাবিক অবস্থায় যতটুকু হাওয়া যায় ততটুকু হাওয়া যাইতেছে বটে, কিন্তু যাইবার পরক্ষণেই রোগী নিশ্বাস ফেলিতেছে। অতএব ফুস্‌ফুসের ভিতর হাওয়া যাইবাব পথে কোনরূপ প্রতিবন্ধক নাই। ফুস্‌কুস ও আয়তনে কমে নাই। তবে হাওয়া স্বাভাবিক মত ফুস্‌ফুসের ভিতরে যাইতেছে বটে, কিন্তু যাইবার পরক্ষণেই যেন বাহির হইয়া আসিতেছে। অতএব, স্বাভাবিক অবস্থায় এক মিনিটে নিশ্বাস ১৪ বারের স্থলে যেন ৪০ বার পড়িতেছে। এইরূপ নিশ্বাসকে ইংরাজিতে Deep অর্থাৎ গভীর কহে। দ্বিতীয় প্রকার, ফুস্‌ফুসের আয়তন কমিয়া ফুস্‌ফুসের আয়তন অনুযায়ী স্বাভাবিক অবস্থা অপেক্ষা অল্প পরিমাণে হাওয়া ফুস্‌ফুসের ভিতরে যায়, ও তাহার পরক্ষণেই ফুস্‌ফুসের ভিতর

হইতে একটু হাওয়া বাহির হইয়া আইসে। নিশ্বাস দ্বারা বাহিরের হাওয়া টানিয়া লইলে ঐ বাতাস ফুস্‌ফুসের ভিতর যাইয়া রক্ত পরিষ্কার করে। অতএব সম্পূর্ণ রূপ হাওয়া ফুস্‌ফুসে প্রবেশ করিতে পারিতেছে না বলিয়া ফুস্‌ফুসের কার্য্যের আধিক্য হয়, অর্থাৎ একবারের কাজ যেন চারিবারে করিতে হয়। যতটুকু হাওয়া এক নিশ্বাসে ফুসফুসির ভিতরে স্বাভাবিক অবস্থায় যায়, ফুস্‌ফুসের আয়তন কমিয়া যাইলে যদি ঐ হাওয়ার চতুর্থাংশ মাত্র ফুস্‌ফুসে স্থান পায়, তবে এক নিশ্বাসে স্বাভাবিক অবস্থায় যতটুকু বাতাস ফুস্‌ফুসের ভিতর যাইত তাহার এক অংশের চতুর্থাংশ মাত্র ফুস্‌ফুসের আয়তন কম হওয়া জন্য ঐ ফুস্‌ফুসের ভিতর যাইতে পারে। প্রকৃতি কোন ইন্দ্রিয়কেই নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিতে দেন না। অতএব, ঐরূপ পীড়িত অবস্থায়, স্বাভাবিক অবস্থায় যত খানি হওয়া যায় তাহার চতুর্থাংশ ফুস্‌ফুসির ভিতরে যাইলে প্রকৃতির নিয়মানুযায়ী স্বাভাবিক অবস্থার পরিমাণানুযায়ী হাওয়া ফুস্‌ফুসের ভিতরে যাওয়া আবশ্যক বলিয়া ফুস্‌ফুসকে একবারের কাজ চারিবার করিতে হয়। অতএব ফুস্‌ফুস্ একটু ত্রস্ত কার্য্য না করিলে একবারের কার্য্য ঐ সময়ের মধ্যে চারিবার করিতে পারে না। এক সময়ের মধ্যে একবারের কার্য্য চারিবার করিতে হইলেই একটু শীঘ্র শীঘ্র কার্য্য করিতে হয়। ফুস্‌ফুস্ শীঘ্র শীঘ্র কার্য্য করিতে গেলেই শ্বাসের বৃদ্ধি হয়, কারণ ফুস্‌ফুসের কার্য্যই নিশ্বাস প্রশ্বাস লওয়া। নিশ্বাস প্রশ্বাস এইরূপ ভাবে ত্রস্ত চলিয়া উপর উপর শ্বাস চলিতেছে বোধ হইলে ইহাকে ইংরাজিতে Shallow or Superficial respiration কহে। সর্প বিষের লক্ষণ

Respiration Superficial হইয়া দ্রুত বেগে চলে। কিন্তু হৃদ্পিণ্ডের কার্য্য স্বাভাবিক মত থাকে। Superficial সুপারফিসিয়াল কথাটীর অর্থ উপর উপর অতএব যখন লোকে ভাল করিয়া টানিয়া নিশ্বাস লইতে পারে না; কিন্তু উপর উপর একটুকু নিশ্বাস লয় আর তাহার পর একটুকু নিশ্বাস ফেলে তাহাকেই Superficial respiration সুপারফিসিয়াল রেস্পিরেসন বলে।

Tartar Emetic টার্টার্ঃ—ইমেটিক টার্টার ইমেটীকের নিশ্বাসের কথা পূর্ব্বে এক রকম লিখা হইয়াছে। টার্টার ইমেটিক প্যারেলিটিক ওলাউঠার একটি বেশ ভাল ঔষধ। প্যারেলিটিক ওলাউঠায় সমস্ত ইন্দ্রিয়ের প্যারালিসিস্ হয়, অর্থাৎ অবশ হইয়া আইসে, অতএব নিশ্বাস প্রশ্বাসের মাংস পেশীর অবশতা জন্য, নিশ্বাস প্রশ্বাসের কষ্টের বাহ্যিক লক্ষণ অধিক থাকে না। সুতরাং এদিগে রোগীর শ্বাস উপস্থিত, নিশ্বাস যেন ক্রমে একেবারে বন্ধ হইয়া আসিতেছে, কিন্তু রোগীর নিশ্বাস প্রশ্বাসের কষ্টের বাহ্যিক লক্ষণ কিছু নাই। নিশ্বাস প্রসাদের কষ্টের সহিত রোগী একটু জ্ঞান চৈতন্য বিহীন দেখা যায়। মস্তিষ্ক ও স্নায়ু মণ্ডলীর অবশতা জন্য রোগীর জ্ঞান ও চৈতন্যের বৈলক্ষণ্য হওয়াই সম্ভব। এইরূপ অবস্থাতেই টার্টার্ ইমেটিক্ ঠিক ঔষধ। এ অবস্থায় Nicotine নাইকোটিন ও ব্যবহার হইয়া থাকে। নাইকোটিন্ আমাদের তামাক গাছের সার অংশ।

এ স্থলে বলা আবশ্যক যে, ওলাউঠার কোলাপ্স্ অবস্থায় মস্তিষ্কের বৈলক্ষণ্য নানা প্রকার কারণে হইয়া থাকে। ১ম।

মাথায় বেশী রক্ত জমিলে যে মস্তিষ্কের বৈলক্ষণ্য হইয়া থাকে ইহা পূর্ব্বেই ভাল করিয়া বলা হইয়াছে। ওলাউঠা রোগের কোলাপ্স্ অবস্থায় মাথায় অধিক রক্ত জমিয়া মস্তিষ্কের বৈলক্ষণ্য হওয়া খুব কম ঘটিয়া থাকে। কঠিন রকম জ্বর বিকারে মস্তিষ্কে রক্ত জমিয়া চক্ষু লাল হইয়া যে রোগী এলোমেলো বকে, ইহা ওলাউঠার কোলাপ্স্ অবস্থায় অধিক দেখা যায় না। তবে পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ওলাউঠার বিষে রক্ত চলাচলের ও রক্তের নিজের বৈলক্ষণ্য কোন না কোন প্রকার হইয়া থাকে। রক্তের চলাচল সমস্ত শরীরে সমধিক পরিমাণে হয় না বলিয়া, ওলাউঠা রোগের প্রথম অবস্থা হইতেই মস্তিষ্কে অধিক রক্ত জমিয়া থাকায় পরে কোলাপ্স অবস্থায় রক্তের আধিক্যের লক্ষণ সমস্ত হইতে পারে। কিন্তু ওলাউঠায় এরূপ অবস্থা সচরাচর ঘটে না। তবে একেবারে হয় না এরূপ নয়। ২য়। মস্তিষ্কে রক্তের স্বল্পতা হইলেও রোগীর ভালরূপ জ্ঞান থাকে না। আছে আছে ২।৪ টী ভুল কথা কয়। এইরূপ মস্তিষ্কের বিকৃতি রক্তের স্বল্পতা জন্যই হইয়া থাকে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, শরীরের সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কার্য্যের জন্য সেই সেই ইন্দ্রিয়ে রীতিমত রক্তের চলাচল থাকা আবশ্যক। যে ইন্দ্রিয় হউক না কেন? সমধিক পরিমাণে রক্ত প্রাপ্ত না হইলে ঐ ইন্দ্রিয় রীতিমত সবল থাকিয়া কার্য্য করিতে পারে না। মস্তিষ্ক ও একটী ইন্দ্রিয় বিশেষ, তাহাতে স্বাভাবিক অবস্থা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে রক্ত জমিয়া যেরূপ মস্তিষ্কের জড়তা জন্মাইয়া তাহার বিকৃতি উৎপাদন করে, সেইরূপ মস্তিষ্ক সমধিক পরিমাণে রক্ত না পাইলে রক্তের স্বল্পতা ও দুর্ব্বলতা জন্য এক প্রকার বিকৃতি

ভাবাপন্ন হয়। মস্তিষ্কের বিকৃতি হইলেই জ্ঞান চৈতন্য ঠিক থাকিতে পারে না। সংক্ষেপে মস্তিষ্কে রক্তের আধিক্য জন্য যেরূপ বিকৃতি জন্মায় রক্তের স্বল্পতা জন্য ও এক প্রকার বিকৃতি জন্মে। রক্তের স্বল্পতা জন্য যে মস্তিষ্কের বিকৃতি বা কোমা হইয়া থাকে, তাহাকে ইংরাজিতে Anæmic coma এনিমিক্ কোমা বলে। রক্তের আধিক্য জন্য কোমা হইলে তাহাকে হাইপেরিমিক কোমা, (Hyperaemic Coma) বলে। রক্তের স্বল্পতা জন্য কোমা ওলাউঠা রোগের কোলাপ্‌সে সচরাচর ঘটিয়া থাকে। ৩য়, টার্টার্ ইমেটিকের লক্ষণে বলিয়াছি যে, প্যারেলিটিক্ ওলাউঠায় মস্তিষ্কের অবশতা জন্মায়। মস্তিষ্কের অবশতা ও এক প্রকার বিকৃতি। মস্তিষ্কের কার্য্য সুস্থ শরীরে যে প্রকার সুন্দর রূপে হইয়া থাকে, সেইরূপ কার্য্য না হইলেই মস্তিষ্কের এক প্রকার বিকৃতি হইল বলিতে হইবে। অতএব মস্তিষ্কে অধিক রক্ত জমিলে যেরূপ মস্তিষ্কের জড়তা জন্মাইয়া কার্য্যের বিঘ্ন জন্মে সেই রূপ মস্তিষ্কে রক্ত কম হইলে ও কার্য্যের বিঘ্ন জন্মায়। এবং মস্তিষ্কের অবশতা জন্য ও যে কার্য্যের বিঘ্ন জন্মিবে ইহা সহজেই বুঝা যায়। যেমন হস্ত পদ ইত্যাদির অবশতা জন্মিলে এই অবশ হস্ত পদ রীতিমত কার্য্য করিতে পারে না। অবশ মস্তিষ্ক ও সেইরূপ রীতিমত কার্য্য করিতে পারে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে জ্ঞান চৈতন্য ও শরীরের কার্য্যের আধার মস্তিষ্ক। অতএব মস্তিষ্কের কার্য্য রীতিমত না হইলেই জ্ঞান চৈতন্যের অভাব হইল। সমস্ত মাংস পেশীর কার্য্য স্নায়ু দ্বারা হয়, আর স্নায়ুর শক্তি ও বলের আধারই মস্তিষ্ক, মস্তিষ্কদুর্ব্বল ও

অবশ হইলে সমস্ত স্নায়ুও সঙ্গে সঙ্গে দুর্ব্বল ও অবশ হইয়া পড়ে। অতএব স্নায়ু দুর্ব্বল ও অবশ হইলে মাংস পেসীর কার্য্য ও চৈতন্য সুবিধা মত থাকিতে পারে না। অতএব প্যারেলিটিক ওলাউঠায় মস্তিষ্কের অবশতা জন্য রোগী সমচিত জ্ঞান চৈতন্য বিহীন ও মাংস পেশীর শক্তি বিহীন হইয়া জড় পদার্থের ন্যায় পড়িয়া থাকে। পঞ্চম, ইহা সওয়ায় মস্তিষ্কের আর এক রকম বিকৃতি আছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, বিশুদ্ধ রক্ত হৃদ্‌পিণ্ডের বাঁ দিক হইতে সমস্ত শরীরে সঞ্চালন হইতে হইতে রক্তের পূর্ব্বের বিশুদ্ধ অবস্থা ক্রমে থাকে না। কারণ শরীরের নানাপ্রকার ক্লেদের সহিত মিলিত হইয়া ঐ বিশুদ্ধ শোণিত ক্রমেই অপরিষ্কার ও ক্লেদ যুক্ত হইতে থাকে। রক্তের নানা রকম ক্লেদের মধ্যে Urea ইউরিয়া নামক রক্তের ক্লেদই একটু বেশী অনিষ্টকর। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে রক্তের যে কোন প্রকার ক্লেদই হউক না কেন রক্তে থাকিলে শরীরের অনিষ্ট হয়। অতএব রক্ত পূর্ব্ব মত নানাপ্রকার ক্লেদে দূষিত হইলে রক্ত চলাচলের পথে মূত্রগ্রন্থী ইত্যাদি নানা স্থানে রক্ত পরিষ্কার হয় বটে, কিন্তু রক্ত চলাচলের পথে পথে যে সকল রক্ত পরিষ্কারক স্থান আছে এই সমস্তে রক্ত একেবারে বিশুদ্ধ হয় না। ফুস্‌ফুসীতে আসিয়া একেবারে সম্পূর্ণ রূপে ক্লেদ বর্জ্জিত হইয়া রক্ত স্বাভাবিক মত বিশুদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া হৃদ্‌পিণ্ডের বাঁদিকে যায় এবং সে স্থান হইতে শরীরের নানা স্থানে সঞ্চালিত হইয়া শরীরের নানা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পুষ্টিও বর্দ্ধন সাধন করে। রক্ত পরিষ্কার জন্য যে সমস্ত উপায় শরীরের নানাস্থানে আছে, ইহার মধ্যে কোন একটীর রীতিমত কার্য্য না হইলে রক্ত রীতিমত পরিষ্কার হয় না। মূত্রগ্রন্থি

ও ফুস্‌ফুস দুইটী রক্ত পরিষ্কাররে প্রধান অঙ্গ। সেই জন্য মুত্রগ্রন্থি বা ফুস্‌ফুসীর পীড়া বা বিকৃতিতে মনুষ্যকে অতি অল্প সময়ের মধ্যেহ অতিশয় কাতর করিয়া তুলে। যকৃত ও প্লীহা ও রক্ত পরিষ্কার করে, কিন্তু যকৃত বা প্লীহার পীড়া হইলে রোগী তত শীঘ্র অবসন্ন হয় না, কিন্তু মুত্রগ্রন্থি ও তদপেক্ষায় গুরুতর অঙ্গ ফুস্‌ফুসের পীড়ায় রোগী অল্প সময়ের মধ্যেই মৃত্যু গ্রাসে পাতত হয়। রক্ত পরিষ্কার সম্বন্ধে ফুস্‌ফুস্‌ সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, সেই জন্য নিউমনিয়া রোগ এত বেশী সাংঘাতিক ও অল্প সময়েই নিউমানিয়ায় লোক প্রাণত্যাগ করে। নিউমনিয়া ফুস্‌ফুসের প্রদাহ মাত্র। সেরূপ প্রদাহ অন্য স্থানে ও হয়, এমন কি মস্তিকের প্রদাহতে ও রোগী তত শীঘ্র মরে না, কিন্তু ফুস্‌ফুসের প্রদাহে রক্ত পরিষ্কার কার্য্যের বিঘ্ন জন্মে বলিয়া এত শীঘ্রই অনিষ্টকর হইয়া উঠে। এমন কি খারাপ রমক নিউমনিয়ায় ২৪ বা ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে মানুষ মরে। যাহাহউক বলিতেছিলাম, ইউরিয়া নামক যে রক্তের ক্লেদ তাহা মূত্রগ্রন্থিতে প্রস্রাবের সহিত বাহির হইয়া যায়। মূত্রগ্রন্থিতে প্রস্রাব প্রস্তুত হয়। অতএব মূত্রগ্রন্থির কোন পীড়া জন্য প্রস্রাব তৈয়ার না হইলে ঐ ইউরিয়া নামক ক্লেদ রক্তের সহিত রহিয়া যায়। ওলাউঠা রোগে প্রায় প্রথম হইতেই প্রস্রাব বন্ধ, আর তার সঙ্গে সঙ্গেই ইউরিয়া নামক রক্তের ক্লেদের বাহির হইবার পথও বন্ধ; সুতরাং রক্তের ক্লেদ রক্তেই রহিয়া গেল। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে রক্তের ক্লেদ বিষ সদৃশ। ঐ ক্লেদ রক্তে থাকিলে শরীরের নানা অনিষ্ট ঘটায়। অতএব, ঐ ইউরিয়া সংযুক্ত রক্ত ওলাউঠার পর প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইলে তখন

রক্তের সহিত শরীরের নানা স্থানে যাইয়া পড়ে। মস্তিষ্কের কার্য্যে সহজেই বুঝা যায় যে শরীরের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে মস্তিষ্ক সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম। দেখিতে সূক্ষ্ম নহে, কার্য্যে সূক্ষ্ম। মনের ইচ্ছার ছায়া বা প্রতিবিম্ব যে দ্রব্যে পড়িলে তাহার কার্য্য হয় সে দ্রব্য শরীরের অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অপেক্ষা যে অধিক সূক্ষ্ম তাহার আর সন্দেহ কি থাকিতেপারে। মস্তিষ্ক ও স্নায়ু সমূহ, মন (চিৎ) আর ভৌতিক শরীরের মধ্যাস্থিত। বাস্তবিক মন নিরাকার চিন্ময় ও মনের ইচ্ছাও সেই প্রকার চিন্ময় তবে যে একে অন্যের বশবর্ত্তী এবং ভৌতিক ও চিন্ময় পদার্থে যে এরূপ আশ্চর্য্য ও অবিচ্ছিন্ন পরস্পর সম্বন্ধ তাহা কিবল মস্তিষ্ক ও স্নায়ু জন্যই হইয়াছে। অতএব মস্তিষ্ক ও স্নায়ু ভৌতিক শরীরের অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অপেক্ষা অধিকতর উন্নত। অনেকটা যেন মনের সঙ্গে জড়িত ও একত্রিত। অতএব অতি সূক্ষ্ম কারণে মনের যেরূপ বিকৃতি জন্মায় সেইরূপ অতি সূক্ষ্ম কারণে মস্তিষ্কের ও বিকৃতি ঘটে। সুতরাং ইউরিয়া ক্লেদ যুক্ত রক্ত শরীরে সঞ্চালিত হইলে সর্ব্বাগ্রে মস্তিষ্কের বিকৃতি জন্মে। ইউরিয়া ক্লেদ যুক্ত মস্তিষ্কের বিকৃতির নাম Uræmia ইউরিমিয়া। এই ইউরিমিয়া যে কোন কারণে হউক শরীরে ইউরিমিয়া নামক ক্লেদ থাকিলেই ঘটিয়া থাকে। ওলাউঠার প্রথম হইতেই প্রস্রাব-বন্ধ লক্ষণ দেখা যায়, অতএব ওলাউঠার প্রতিক্রিয়ার সময় ইউরিমিয়া সহজেই হয়। কোলাপস্ অবস্থায় যে একেবারে রক্তের চলাচল বন্ধ থাকে তাহা নহে। রক্তের চলাচল একেবারে বন্ধ হইলে ত মানুষের প্রাণ নাশ হয়। তবে কোলাপস্

অবস্থায় রক্তের চলাচল এত মৃদু যে অধিক পরিমাণে রক্ত শরীরের কোন স্থানেই যাইয়া পৌছে না। এতদ্ভিন্ন পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে কোলাপ্স্ অবস্থা যেন মানুষের একটী আধমরা অবস্থা, অতএব ঐ কোলাপস্ অবস্থায় শরীরের অন্যান্য পীড়া বা বিকৃতির পরিচয় পাওয়া অতি সুকঠিন। রোগী যদি এক প্রকার মৃতবৎ হইয়া রহিল, তবে শালগ্রামের সোওয়া বসার মত শরীরের কোন অঙ্গে কি পীড়া উপস্থিত হইল কিরূপে বুঝা যাইবে? কোলাপস্ অবস্থায় যেন সকল অঙ্গেই পীড়া। অতএব কোন বিশেষ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পীড়ার কথা বুঝা যায় না। তবে কোলাপস্ অবস্থাতে ও ইউরিমিয়া হওয়া একেবারে অসম্ভব নয়। ডাক্তার স্থালজার সাহেব বলিয়াছেন যে কোলাপ্স্ অবস্থা হইতে সূতার সঞ্চারের ন্যায় কোন *সময় প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল তাহা বিশেষ নির্ণয় করা যাহার* পর নাই দুষ্কর। বাস্তবিক প্রতিক্রিয়ার প্রথম অবস্থায় বিশেষ কিছু বুঝা যায় না। তবে প্রতিক্রিয়া ভালরূপ আরম্ভ হইলে রোগীর অবস্থা ও নাড়ীর গতি, বা শরীরের উষ্ণতা দেখিয়া বলা যায় যে প্রতিক্রিয়া স্পষ্ট আরম্ভ হইয়াছে। আর অনেক সময় হয়ত প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ইউরিমিয়ার লক্ষণ সমস্ত আসিয়া উপস্থিত হয়। এ স্থলে কোলাপস্ অবস্থা হইতেই ইউরিমিয়ার আরম্ভ বা প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহার সূত্র পাত হইয়াছে, তাহা নির্দ্ধারণ করা এক প্রকার দুঃসাধ্য। যাহা হউক, ইউরিমিয়া কোলাপস্ হইতে আরম্ভ হয় কি প্রতিক্রিয়ার সূত্রপাত হইতেই ইউরিমিয়ার ও সূত্রপাত এ সম্বন্ধে বেশী বিতণ্ডার আর আবশ্যক নাই। উভয় প্রকার ইউরিমিয়া

কলে এক দাঁড়াইয়া যায়। ইউরিমিয়া হইলে রোগীর জ্ঞানের বৈলক্ষণ্য জন্মে, চক্ষু লাল হয়, রোগী ২।৪ টা ভুল বকে, সময়ে সময়ে ইউরিমিক আক্ষেপ হয়। শরীরের শোণিত ইউরিয়ার অধিকতর বিষাক্ত হইলে পুনরায় রোগীর বমন আরম্ভ হয়। এই যে বমি হইয়া থাকে এ সেই ওলাউঠার বমন নহে। এ স্থলে বলা আবশ্যক যে, অন্যান্য রোগে রক্ত বিষাক্ত হইলে অদমনিয় বমন আরম্ভ হয়। পাইমিয়া Pyœmia, Septicœmia, সেপ্টিসিমিয়াতে যেরূপ বমি হয় এ বমি ও সেইরূপ। পাইমিয়া বা সেপ্টিসিমিয়াতে রক্তে অন্যরূপ ক্লেদ মিশ্রিত হইয়া রক্ত বিষাক্ত হয়। সেপ্‌টিসিমিয়া ও পাইমিয়ার কথা যথা স্থানে ভাল করিয়া বলিব। এখন ইউরিমিয়ার চিকিৎসার কথা কিছু বলি। ডাক্তার স্লালক্কার সাহেব লিখিয়াছেন যে ইউরিমিয়া অবস্থায় Opium, অপিয়ম্, Belladonna বেলেডোনা, Hyoscyamos হাইঅসাইয়েমস্ Stramonium ষ্ট্রেমোনিয়ম্ দেওয়া বড় ভুল। আমার বন্ধু রাধাকান্ত ঘোষ যে ওলাউঠার পুস্তক লিখিয়াছে, তাহাতে লিখেন যে এ অবস্থায় বেলেডোনা দিয়া ফল পাইয়াছেন। অহিফেন সম্বন্ধে ডাক্তার হিউজেস্ সাহেব লিখিয়াছেন যে Doctor Druri ডাক্তার ড্রুরি Finds it helpful in Uræmic coma, ডাক্তার হিউজেস্ সাহেব লিখিয়াছেন Carbolic Acid might be useful in Uræmic coma, Doctor Buchner ডাক্তার বক্‌নার বলেন যে ইউরিমিয়ার আর্সেনিকের মত ভাল ঔষধ আর নাই তবে ইউরিমিয়া জন্য আক্ষেপ হইলে কিউপ্রম্ দেওয়া ভাল। এবং ইউরিমিয়া জন্য নিশ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট হইলে Hydrocyanic acid হাইড্রসিয়্যানিক্ য়্যাসিড্ ও

Nicotine নাইকোটিন্ প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার হয় ও নাইকোটিনের লক্ষণে যে সকল বিভিন্নতা আছে তাহা বলা আবশ্যক। হাইড্রসিয়্যানিক্ য়্যাসিডের লক্ষণ হৃদ্‌পিণ্ডের ধড় ধড়ী স্বাভাবিক অপেক্ষা একটু বেশী, নাড়ী পুষ্টি, কিন্তু নরম ও ঐ নাড়ী ক্রমে মৃদু ও সূতার ন্যায় হইয়া আইসে। হৃদ্‌পিণ্ড ফুস্‌ফুসিতে রক্ত জমিয়া যায়, বুকের ভিতর ধড় ধড় করে। নিশ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট হয়, স্নায়ু সমস্ত একেবারে যেন অবশ হইয়া আইসে। স্নায়ুর দুর্ব্বলতা জন্য প্রথমতঃ আক্ষেপ হয়। ক্রমে সমস্ত মাংসপেশী মৃত শরীরের ন্যায় অবশ হইয়া আইসে, সমস্ত শরীর যেন কাল নীলবর্ণ হইয়া যায়, গলা ঘড় ঘড় করে, এ সমস্ত শরীর একেবারে নিস্তেজ হইয়া যায়।

নাইকোটিনের লক্ষণ।

নাইকোটিনের লক্ষণে ও হৃদ্‌পিণ্ডের অবশতা জন্মে ও হৃদ্‌পিণ্ডের অবশতার সঙ্গে সঙ্গে স্নায়ু সমষ্টির অবশতা হয়। নাইকোটিনের লক্ষণে পিপাসা একেবারেই থাকে না। প্রতিক্রিয়ার লক্ষণের একেবারেই অভাব, রোগী যেন মৃতপ্রায় রোগীর কপাল ও মুখ বরফের ন্যায় শীতল। পেট ফুলিয়া থাকে কিন্তু বাহে বমির নাম মাত্র নাই। প্রস্রাব এক বিন্দু ও হয় না, আর ইউরিমিয়ার লক্ষণ বানের জলের ন্যায় অতি শীঘ্র শীঘ্রই বাড়িতে থাকে। এইরূপ অবস্থায় নাইকোটিন দিবার পর প্রতিক্রিয়া কথঞ্চিত পরিমাণে আরম্ভ হইলে লক্ষণ বিবেচনায় ওপিয়ম্ ও হাইওস সাইএমস্ দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু প্রতিক্রিয়ার

সমস্ত লক্ষণ হইয়া প্রস্রাব মোটে না হইলে Cantharidis, Terebinthina ক্যান্থেরাইডিস্, টেরিবিনথিনা, ক্যাম্ফর Camphor, Secale cornutum সিকেলি কর্ণিউটম্, Tartar Emetic টার্টার্ ইমেটিক্, প্রয়োগ করিলে বিস্তর উপকার হয়।

ইউরিমিয়ার অবস্থায় কখন কখন বমি তত না হইয়া হিক্কাতে রোগীকে বড় কষ্ট দেয়। ডাক্তার স্থালজার সাহেব লিখিয়াছেন যে অনেকানেক হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারেরা হিক্কার জন্য Ignatia ইগ্নেসিয়া Nux vomica নকস্ ভমিকা Cicuta সাইকিউটা Belladonna বেলেডোনা প্রয়োগ করিয়া থাকেন। কিন্তু এ সকল ঔষধে হিক্কার কিছুই উপকার হয় না, আর উপকার হওয়াও উচিত নয়। তিনি কহেন যে ইউরিমিয়ার অবস্থায়ই হউক আর হিক্কার অবস্থায়ই হউক রোগী যে, তখন ঐ ওলাউঠা রোগে আক্রষ্ট তাহা মনে রাখা আবশ্যক। অতএব লক্ষণ বিবেচনায় Veratrum ভেরেট্রম, Cuprum কিউপ্রম্, Secale সিকেলি, Carbo vegetabilis কার্ব্বোভেজিটেবিলিস্, Arsenic আর্সেনিক্, Tabacum টেবেকম্, Hydrocyanic Acid হাইড্রসিয়্যানিক্ য়্যাসিড্, যে কয়েকটী ওলাউঠার প্রসিদ্ধ ঔষধ আছে, লক্ষণ বিবেচনায় এই সমস্ত ঔষধ প্রয়োগ করিলেই হিক্কা নিবারণ হয়! আমি দেখিয়াছি যে, অন্যান্য ঔষধে তত হউক না হউক, আর্সেনিকে অনেক সময় হিক্কার উপকার হয়। আমার সলিম দর্জ্জির দুইটী ছেলের একত্রে বড় সাংঘাতিক ওলাউঠা হয়। তাহার মধ্যে একটীর পীড়ার ক্রমেই বৃদ্ধি. নানা প্রকার ঔষধ প্রয়োগ করিয়া কিছু উপকার হইল না। পরে কোলাপ্স্ হইল। অল্প সময়ের মধ্যেই কোলাপ্সের পর একটু

যেন প্রতিক্রিয়ার লক্ষণ উপস্থিত হইয়াই ইউরিমিয়া ও তৎপরে অদমনিয় হিক্কাতে ছেলেটী যায় যায় হইল। আর ক্রমান্বয়ে অনেক ঔষধ প্রয়োগ করিলাম, কিছুতেই কিছু হইল না, তার পর মনে করিলাম "অসারে জল সার" বিবেচনায় একবার আর্সেনিক্ দিয়া দেখি। তখন হোমিওপ্যাথি কোন ঔষধের বেশী ডাইলিউশনের তত ব্যবহার ছিল না। কাজে কাজেই আর্সেনিক ৬, একটী ছ আউন্স শিশিতে তিন ফোঁটা দিয়া, অর্দ্ধ আউন্স অর্থাৎ এক কাঁচ্চা পরিমাণে আধ ঘণ্টা অন্তর ঐ ঔষধ সেই ছেলেটীকে দিতে আরম্ভ করিলাম। আশ্চর্য্যের বিষয় ৫।৭ বার ঐরূপ আর্সেনিক দিবার পর ছই ঘণ্টার মধ্যে ছেলেটীর গুহ্যদ্বার দিয়া বাইটটা মোটা মোটা কেঁচর ন্যায় কৃমি বাহির হইল। আর তাহার পরে হিক্কার নাম মাত্র নাই। পাঠকগণ মনে করিবেন না যে, ছেলেটীর পেট ফুলা ফুলা দেখিয়া আমি সাইকিউটা ইত্যাদি দি নাই। সাইকিউটা, সিনা ইত্যাদি কৃমির প্রসিদ্ধ ঔষধ ইহার পূর্ব্বে অনেকবার দেওয়া হইয়াছিল তাহাতে একটীও কৃমি বাহির হয় নাই। ঐরূপ কৃমি বাহির হইবার পর ছেলেটীর ক্রমেই উত্তরোত্তর প্রতিক্রিয়ার লক্ষণ বিশিষ্ট রূপ প্রকাশ পাইতে লাগিল। আর একা আর্সেনিকেই ছেলটী ভালরূপ আরোগ্য হইল। অপর ছেলেটীর পীড়া তত সাংঘাতিক হয় নাই। অতএব অন্যান্য ঔষধেই সহজে আরোগ্য হইল।

বাবু নফরচন্দ্র ভট্ট তখন ঢাকার ছোট আদালতের জজ। ইন্দুভূষণ বিন্দুভূষণ নামে তাঁহার দুইটী যমজ ছেলে। উভয়েরই একত্রে ওলাউঠা রোগ হইয়া ক্রমে বড় সাংঘাতিক হইয়া উঠিল। তথাকার আর একটী হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার বাবু কুঞ্জবিহারি

ভট্টাচার্য্য ঐ দুইটী যমজ বালকের চিকিৎসা করিতে ছিলেন। দুইটী ছেলেরই একত্রে পীড়া ক্রমে সাংঘাতিক হইয়া উঠিল। কোলাপ্‌স হইয়া তাহার পর ইউরিমিয়া ও ইউরিমিয়ার সহিত হিক্কা। কুঞ্জ বাবু নফর বাবুর একটী আত্মীয়। কুঞ্জ বাবুর চিকিৎসায় কিছু উপকার না হইয়া ছেলে দুটীর পীড়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হওয়াতে, নফর বাবু ক্রমে বড় ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। নফর বাবু তখন নূতন ঢাকার ছোট আদালতের জজ হইয়া সে স্থানে গিয়াছিলেন, আমার সহিত তত আলাপ ছিল না। সে সময়ে তাঁহার বন্ধু বাবু গঙ্গাচরণ সরকার সব্ জজ ও বাবু রাখালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এক্‌জেকিউটিভ্ এঞ্জিনিয়ার বাবুদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করেন যে ঢাকায় আর হোমিওপ্যাথি ডাক্তার ভাল কে আছেন। আমি প্রকৃত ভাল হই মন্দ হই গঙ্গাচরণ বাবু, রাখাল বাবু ও আর আর ঢাকার অনেক ভদ্র লোকের আমার প্রতি একটু ভক্তি ও বিশ্বাস ছিল। অতএব সকলেই এক বাক্যে বলেন যে এ অবস্থায় একবার কেদার বাবুকে আনিয়া দেখাইলে ভাল হয়। যাহাহউক, নফর বাবু সকলকার কথা শুনিয়া নিজে আসিয়া আমার বাসায় উপস্থিত হইলেন। আমি তৎক্ষণাৎ তাঁহার সহিত যাইয়া দেখিলাম ছেলে দুটীর অবস্থা বাস্তবিকই বড় সাংঘাতিক। মনে মনে বিবেচনা করিলাম সর্ব্বাগ্রে হিক্কার চিকিৎসা করা আবশ্যক। ছেলে দুটীর হিক্কাতে যেরূপ কষ্ট হইতেছে, বোধ হয় ঐ হিক্কাতেই দম আট্‌কাইয়া প্রাণত্যাগ হইবে। ছেলে দুটীর অবস্থা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত মনোনিবেশ করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম যে তাহাদের হিক্কা যেন অনেকটা Spasmodic আক্ষেপিক গতিকের হইতেছে। কুঞ্জ বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম

এই হিক্কার অবস্থায় কিউপ্রম্ ২।১ ডোস্ দিয়া দেখিয়াছিলেন কি ? কুঞ্জ বাবু উত্তর করিলেন। কিউপ্রম্ ত ওলাউঠার প্রথম অবস্থায় প্রয়োগ করা যায়। এরূপ ইউরিমিয়া জন্য হিক্কায় কে আবার কখন কিউপ্রম্ দিয়া থাকে ? কুঞ্জ বাবুর উত্তরে আমি একটু চিন্তিত হইলাম। তাহার পর অনেকক্ষণ ভাবিয়া চিন্তিয়া কহিলাম, "কিউপ্রম্ প্রয়োগ করিতে আপনার আপত্তি কি ?" কুঞ্জ বাবু উত্তর করিলেন "আপত্তি বিশেষ কিছু নাই, তবে কিনা কিউপ্রম্ এ অবস্থায় আমি কখন দি নাই। আপনার ইচ্ছা হয় কিউপ্রম্ দিতে পারেন, কিন্তু আমি জানি কিউপ্রমে কিছু হইবে না। নিরর্থক সময় নষ্ট করা মাত্র।" এই সকল কথা বার্ত্তায় আমি একটু বিপদে পড়িলাম। রাখাল বাবু ও গঙ্গাচরণ বাবুকে সমস্ত কথা বলিয়া তাঁহাদিগকে কহিলাম, কুঞ্জ বাবু ও আমার মতের একটু অনৈক্য হইতেছে। অতএব রোগীদিগের যে রূপ অবস্থা সকলই ত আপনারা বুঝিতে পারিতেছেন। এখন নফর বাবুকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করুন যে, ইহাদিগের ঔষধ আমার মতে দেওয়া হইবে কি না ? তাঁহারা তাহাই করিলেন। পরে নফর বাবু আমার নিকট আসিয়া স্পষ্ট কহিলেন "কুঞ্জ বাবু গতকল্য হইতে ইহাদের চিকিৎসা করিতেছেন। পীড়ার গতিকেই হউক, আর কুঞ্জ বাবুর চিকিৎসার গতিকেই হউক, ছেলে দুইটী ক্রমেই মরণাপন্ন হইয়া পড়িল। অনেকে আপনার চিকিৎসার সুখ্যাতি করেন। আমার অদৃষ্টে যাহা ঘটিবে তাহা ত বুঝিতেই পারিতেছি। তবে কি না, মনের একটা ক্ষোভ থাকিবে যে আপনার মতে চিকিৎসা করাইলাম না। অতএব কুঞ্জ বাবু আমার আত্মীয়, কুঞ্জ বাবু ও থাকুন, ঔষধ

আপনার মতে দেওয়া হউক। দেখা যাউক সে ঔষধে কি হয়” এই সমস্ত কথার পর, আমি ঈশ্বরের নাম লইয়া কিউপ্রম্ ৬, তিন ফোঁটা ছয় আউন্স আন্দাজ জলে দিয়া ঐ ঔষধের আধ আউন্স অর্থাৎ এককাঁচ্চা আন্দাজ মাত্রায় আধ ঘণ্টা অন্তর দিতে বলিলাম। প্রাতে আটটার সময় এই ঔষধ প্রথম দেওয়া হইল। আমি কুঞ্জ বাবুকে কহিলাম “ভাই, তুমি কিছু মনে করিও না, তুমি নিজে বসিয়া এই ঔষধ দেও, আমি পুনরায় ১১টার সময় নবাব বাড়ী ও বাহিরের অন্যান্য রোগী দেখিয়া পুনরায় আসিব।” ১১টার সময় ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম দুইটী ছেলে প্রায় সেই রকমই আছে। তবে আন্দাজি আধ ঘণ্টা কি তিন কোয়াটার ছেলে দুটীর নিকট বসিয়া দেখিলাম যে, হিক্কা যেন একটু কম। নাড়ীর আবস্থা ও একটু যেন ভাল। যাহা হউক, একটু ভাল যাহা বিবেচনা করিলাম তাহার কথা নফর বাবুকে আর তত না কহিয়া এই মাত্র বলিলাম যে ছেলে দুটী যখন কোন রকমে কিছু বেশী খারাপ হয় নাই তখন ঐ ঔষধই দেওয়া হউক। আবার আমি অপরাহ্ন ২টার সময় আসিয়া দেখিব। পরে প্রায় আড়াইটার সময় ছেলে দুটীকে দেখিতে উপরে উঠিতেছি, নফর বাবুর সঙ্গেই প্রথম সাক্ষাৎ। নফর বাবু এদিকে লোকটী বড় সুরসিক। একটু হাসিয়া আমাকে কহিলেন। “আপনার পীরই-সিন্নি খাইয়াছে বই কি? আমার ইন্দু বিন্দু আপনার ঔষধে অনেক ভাল আছে। হিক্কা আর মোটে নাই। একটু কথা বার্ত্তাও কহিতেছে, আর একটু যেন ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছে। আসুন, দেখুন, ইন্দু বিন্দুর বাহ্যিক চেহারা পর্য্যন্ত অনেকটা ভাল।” যাইয়া দেখিলাম বাস্তবিকই ছেলে দুইটী অনেক ভাল আছে।

কুঞ্জ বাবু ছেলে দুটীর নিকটে বসিয়া আছেন, কিন্তু একটু যেন লজ্জিত। যাহা হউক, কুঞ্জ বাবু নিজে তত লোক খারাপ নয়। কুঞ্জ বাবু বলিলেন "হিক্কা ত এখন কমিয়াছে তবে কিনা আবার না হয় তাহার কিছু উপায় করা উচিত।" আমি উত্তর করিলাম "তাহার এই উপায় যে ৪টা ৫টা পর্য্যন্ত একেবারে ঔষধ বন্ধ থাকুক, কিছু ঔষধ আর দিবেন না। ৪টা ৫টার সময় আমি আবার আসিতেছি। ঔষধ যদি কিছু পরিবর্ত্তন করিতে হয় আপনার সহিত পরামর্শ করিয়া সেই সময় করা যাইবে।" পরে ৫টার সময় যাইয়া দেখি, নফর বাবুর বাসায় সমস্ত বড় লোক একেবারে গিস্ গিস্ করিতেছে। ৫টার সময় কাছারি বন্ধ হওয়াতে সমস্ত হাকিম ও বড় বড় আমলায় নফর বাবুর বাসা একেবারে ভরিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নফর বাবু বড় সুরসিক লোক। আমি বাড়ীতে যাইবা মাত্রই কহিলেন "আপনি আবার কেন? আপনাকে আর আবশ্যক নাই। আমার ইন্দু বিন্দু ভাল হইয়াছে।" তখন রাখাল বাবু আর গঙ্গা চরণ বাবু আমার সাক্ষাতেই আমার অনেক সুখ্যাতি করিতে লাগিলেন, সে কথা আর এ স্থলে বলিবার আবশ্যক নাই। যাহা হউক, ইন্দুবিন্দু তাহার পরে ৫।৭ দিনের মধ্যেই আরোগ্য হইয়া উঠিল। কিউপ্রমের পর ২।১ মাত্রা Carbo vegetabilis – কার্ব্বো-ভেজিটেবিলিস্ মাত্র দিতে হইয়াছিল। নফর বাবুর ঐ দুইটী সন্তান এখন বাঁচিয়া আছে বিলক্ষণ লেখা পড়া করিতেছে। সে দিনেও হুগলীতে নফর বাবুর নিকট যাইয়া দেখিয়া আসিয়াছি। নফর বাবু এখন হুগলীর প্রথম সব জজ। ছেলে দুই-টীর যখন ঐ বেআরাম হয়, তখন তাহাদিগের বয়স ৮।১০ বৎ-

সর। বলা আবশ্যক, যে নফর বাবু এখন প্রধান একজন Advocate of Homoeopath. তিনি সেই পর্য্যন্ত হোমিওপ্যাথির একজন প্রধান পক্ষপাতী। এখন নফর বাবু নিজে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা শিখিয়াছেন। অনেক দরিদ্র লোককে হোমিওপ্যাথি ঔষধ বিতরণ করিয়া থাকেন। ঐ পর্য্যন্ত নফর বাবু আমার একটী পরমাত্মীয় বন্ধু! আমিও নফর বাবুর দ্বারা অনেক উপকার পাইয়াছি।

ইংরাজি ১৮৬৭ সালে আমি যখন কলিকাতায় হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করিতাম, তখন একবার একটী কলিকাতার বড় লোকের রাখিত বেশ্যার পালিত কন্যাকে ওলাউঠা বেআরামের চিকিৎসা করিতে যাই। আমি প্রাতে ঐ রোগীটীকে দেখিতে যাইয়া শুনিলাম পূর্ব্বদিন রাত্র হইতে ঐ স্ত্রীলোকটীর সাংঘাতিক রকম ওলাউঠার পীড়া হইয়াছে। স্ত্রীলোকটীর নাম নিতম্বিনী দাসী, বয়স প্রায় ১৭।১৮ বৎসর, একেবারে পূর্ণযৌবনা। বেশ্যার পালিত কন্যা বটে, কিন্তু একটী গরিব লোকের ছেলের সহিত কন্যাটীর বিবাহ হইয়াছিল। বাস্তবিক স্ত্রীলোকটী কদর্য্য বেশ্যার ব্যবসা কখন করে নাই। একেবারে রীতিমত গৃহস্থের স্ত্রীলোকের মত স্বামির সহিত ঘর করিতেছিল। স্ত্রীলোকটীর স্বামী বাবুর আফিসের একটী সরকার। নিতম্বিনীর তখনও ছেলেপিলে হয় নাই, দেখিয়া বোধ হইল যে ইহার পূর্ব্বে সে বিলক্ষণ বলিষ্ঠ ও সুস্থ শরীরে ছিল। যাহা হউক, আমি যাইয়া দেখিলাম নিতম্বিনী একেবারে মরণাপন্ন। সমস্ত শরীর বরফের মত শীতল, ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতেছে, বাহে বমি বন্ধ হইয়া গিয়াছে। নাড়ী একেবারে বগলেও পাওয়া যায় না। পূর্ব্বে

হাতে পায়ে খাইল ধরা ছিল, এখন তাহার কিছুই নাই। চক্ষু লাল, জ্ঞানশূন্য, প্রস্রাব মোটেই হয় নাই, কতকটা ইউরিমিয়ার লক্ষণ উপস্থিত, আর অধিক হিক্কা হইতেছে। নিতম্বিনী একেবারে পূর্ণযৌবনা, স্ত্রীলোকদিগের হৃদ্‌পিণ্ড একেবারে বাঁদিগের স্তনের নীচে। নিতম্বিনী পূর্ণযৌবনা বিধায় পীনস্তনা, অতএব আমি লজ্জাবশতঃ নিতম্বিনীর হৃদ্‌পিণ্ডের অবস্থা স্তনের উপর ষ্টেথস্‌কোপ বসাইয়া পরীক্ষা করিতে কিছু কুণ্ঠিত হইলাম। আর মনে করিলাম তাহাতে আর বেশী কি ফল হইবে? স্ত্রীলোকটীর বাঁচিবার আশা মাত্র নাই। অতএব নিরর্থক স্বামির সমক্ষে ঐ স্ত্রীলোকটীকে বেপর্দ্দা করিয়া হৃদ্‌পিণ্ড পরীক্ষা করা মাত্র। ভাবিলাম অনেক আকিঞ্চন করিয়া শেষ অবস্থায় হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করিবার জন্য আমাকে লইয়া গিয়াছে, অতএব একটা না একটা কোন ঔষধ দেওয়া আবশ্যক। বলা অনাবশ্যক যে, ইহার পূর্ব্বে নিতম্বিনীর আগাগোড়া য়্যালোপ্যাথি চিকিৎসা হইয়াছিল। অতএব আমাকেই নিতম্বিনীর হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার সূত্রপাত করিতে হইবে। আর কেবল সূত্রপাত করিতে হইবে এরূপ নহে, এখন বাঁচা মরার দোষ গুণ আমার ঘাড়ে। হোমিওপ্যাথি ঔষধ এক মাত্রা খাওয়াইবার পর ও আধ ঘণ্টা পরে রোগী মরিলেও হোমিওপ্যাথির দোষ। আর তখন সহরে হোমিওপ্যাথি আইজ কাইলের মতন প্রচলিত হয় নাই। হোমিওপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকদিগের গুণগ্রাহী লোক অপেক্ষা ছলগ্রাহী লোকের সংখ্যা অধিক। যাহা হউক, এই সকল বিবেচনা করিয়া একবার মনে করিতেছি যে ঔষধ দিবার আর আবশ্যক নাই, কেন

আর এ অবস্থায় ইচ্ছা করিয়া কলঙ্কের ডালি মস্তকে লইব। এমন সময় হঠাৎ দেখা গেল রোগীর নিতম্বের বস্ত্র রক্তে আবৃত হইল। আমি মনে করিলাম নিতম্বিনী বুঝি পূর্ব্ব হইতেই রজঃস্বলা ছিল। যাহা হউক, একবার জিজ্ঞাসা করা উচিত। নিতম্বিনীর স্বামীকে একটু আড়ালে লইয়া জিজ্ঞাসা করাতে জানা গেল যে, পীড়ার ১০।২০ দিন পূর্ব্বে নিতম্বিনীর ঋতু হইয়া গিয়াছে। নিতম্বিনীর স্বামিকে আমার এই কথা জিজ্ঞাসা করা শেষ না হইতে হইতেই একজন বৃদ্ধা চাকরাণী আসিয়া কহিল "ডাক্তার বাবু, কিছু ঔষধ দেও না, নিতম্বিনীর একে-বারে ডাহা রক্ত বাহে হইতেছে।" বৃদ্ধা চাকরাণীটী আগা-গোড়া নিতম্বিনীর নিকট বসিয়া ছিল। শুনিলাম ঐ চাকরাণীটী নিতম্বিনীকে শৈশবাবস্থা হইতে মানুষ করিয়াছে। যাহা হউক, নিতম্বিনীর স্বামীর ও অন্যান্য লোকের অনুরোধে ভাবিলাম একেবারে ঔষধ না দেওয়াও যুক্তিসিদ্ধ নয়। পূর্ব্বে যে সমস্ত লক্ষণ কহিয়াছি সে সমস্ত কার্ব্বো ভেজিটেবিলিসের (Carbo-vegetabilis) লক্ষণের সঙ্গে মিলে। তবে কার্ব্বো ভেজি-টেবিলিস্ কি Hydrocyanic acid-হাইড্রসিয়্যানিক্য়্যাসিড্ কি একোনাইট্ দিব ইতস্ততঃ করিতেছিলাম; কিন্তু যখন দেখিলাম ডাহা রক্ত বাহে হইল তখন মনে করিলাম কার্ব্বো ভেজিটেবিলিস্ই ইহার ঠিক ঔষধ। অতএব কার্ব্বো ভেজি-টেবিলিস্ ৬, তিন ফোঁটা ছয় আউন্স আন্দাজ জলে ঢালিয়া উহার আধ আউন্স অর্থাৎ এক কাঁচ্চা মাত্রায় আধ ঘণ্টা অন্তর দিতে আরম্ভ করিলাম। আমি প্রায় ১১টা পর্য্যন্ত বসিয়া চারি-বার ঔষধ দিলাম। রোগীর কোনদিগেই কিছু পরিবর্ত্তন নাই,

যাহা হউক, তখন তাহাদিগকে বলিলাম- এই প্রকারে ঔষধ দেওয়া হউক, আমি আবার ১টা দুটার সময় আসিব। এই কথা বলিয়া চলিয়া আসিলাম। পরে প্রায় ৩টার সময় যাইয়া দেখি যে পূর্ব্বে যে নাড়ী একেবারে বগলেও পাওয়া যায় নাই, এখন মণিবন্ধে সূতার সঞ্চারের মত কিছু নাড়ী পাওয়া যায়। একটু যেন জ্ঞান হইয়াছে। ফ্যাল ফ্যাল করিয়া আমার দিকে চাহিতে লাগিল, যেন মনে ভাবিতেছে "এ আবার কে?" ইহাতেই বিলক্ষণ বুঝা গেল যে, ইহার পূর্ব্বে আমি যে ২ ঘণ্টার উপর নিতম্বিনীর কাছে বসিয়া নিজ হস্তে তাহাকে ঔষধ খাওয়াইয়াছিলাম, নিতম্বিনী তাহার কিছুই জানে না, সে কথা কিছুই মনে নাই। সেই জন্যই অপরিচিতের ন্যায় আমার প্রতি ঐরূপ ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাকাইতে লাগিল। অতএব নিতম্বিনীর এখন কিছু জ্ঞান হইয়াছে। হিক্কা আর একেবারে নাই। রক্ত বাহে ঐ যে একবার হইয়াছিল তাহার পর আর হয় নাই। শ্বাস তত ঘন ঘন পড়িতেছে না। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত প্রস্রাব হয় নাই। কার্ব্বো ভেজিটেবিলিস্ এখন ২ ঘণ্টা অন্তর দিতে কহিয়া আসিলাম। পুনর্ব্বার রাত্র ১০টার সময় যাইয়া দেখি, নিতম্বিনী অন্যান্য বিষয়ে অনেকটা ভাল আছে। শরীর তত শীতল নয়, কিন্তু প্রস্রাব তখন পর্য্যন্ত হয় নাই। একটু গায়ের দাহ ও পিপাসা হইয়াছে। তখন মনে করিলাম ২।১ মাত্রা আর্সেনিক্ দিলে ভাল হয়। অতএব ২ ঘণ্টা অন্তর কার্ব্বো ভেজিটেবিলিসের মাত্রায় একবার আর্সেনিক্ ৬, আর একবার কার্ব্বোভেজিটিবিলিস্ উল্টা পাল্টী করিয়া দিতে কহিলাম। পরদিন প্রাতে যাইয়া শুনিলাম রাত্র চারিটার

সময় একবার একপোয়া আন্দাজ প্রস্রাব হইয়াছে, তখন নিতম্বিনী বেশ ভাল। তাহার পর সমস্ত দিন রাত্রে ২ বার কার্ব্বো-ভেজিটিবিলিস্ ও ২ বার আর্সেনিক্ দেওয়াতেই নিতম্বিনী ৫।৭ দিনের মধ্যে বেশ আরোগ্য হইল।

ইউরিমিয়া সম্বন্ধে আর একটী কথা বলা বড় আবশ্যক। নিম্নে যে অবস্থাটীর কথা বলিব, তাহা ওলাউঠার অনেক পুস্তকে নাই। আর সে অবস্থা বোধ হয় অনেক হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের দৃষ্টিগোচর হয় নাই। এমন কি, ডাক্তার শ্যাল-জারের সুদীর্ঘ ওলাউঠার পুস্তকেও এ অবস্থার কথা কিছু উল্লেখ নাই। অতএব আমার বিশেষ অনুরোধ এই যে, এইটী পাঠকগণ একটু মনোনিবেশ করিয়া পাঠ করিয়া সযত্নে স্মরণ রাখেন। ওলাউঠার চিকিৎসায় সচরাচর এ অবস্থাটী না ঘটিলেও কোন কোনস্থলে এরূপ ঘটিয়া থাকে।

ইউরিমিয়ায় প্রস্রাব হয় না ও প্রস্রাব না হওয়া জন্য ইউ-রিমিয়া ঘটিয়া থাকে, এই কথাই প্রায় সকলে জানেন। কিন্তু কোন কোনস্থলে প্রস্রাব হইয়াও ইউরিমিয়ার সমস্ত লক্ষণ উপস্থিত থাকে। ডাক্তার শ্যালজার সাহেব ও আরও অনেকা-নেক ডাক্তার কহেন যে, যে প্রস্রাব ইউরিমিয়ার অবস্থায় নির্গত হইয়াও ইউরিমিয়ার অবস্থা সমভাবে উপস্থিত থাকে সে প্রস্রাব ওলাউঠা রোগ উৎপত্তি হইবার পূর্ব্ব হইতেই মূত্রাশয়ে ছিল, ইউরিমিয়া অবস্থায় ঐ মূত্রাশয় হইতে স্বাভাবিক প্রস্রাবের মত প্রস্রাবের দ্বার দিয়া নির্গত হয়। অতএব ঐ প্রস্রাব নির্গত হওয়া জন্য ইউরিমিয়ার লক্ষণের কিছু উপশম হওয়ার কিছু সম্ভাবনা নাই। এ কথা এক রকম যুক্তিসঙ্গত। কারণ ওলাউঠা অবস্থায়

রক্তে যে ইউরিক্‌য়্যাসিড্‌ বা ইউরিয়া জমিয়া রক্তকে দূষিত করিতেছে, সেই ইউরিয়া ও ইউরিক্‌য়্যাসিড্‌ নির্গত না হইলে ঐ দূষিত রক্ত পরিষ্কার হইবার সম্ভাবনা কিছুই নাই। ওলাউঠার সূত্রপাত হইবার পূর্ব্বে মূত্রাশয়ে যে প্রস্রাব ছিল তাহা নির্গত হইলে পূর্ব্বকার ইউরিয়া ও ইউরিক্‌য়্যাসিড্‌ নির্গত হইল বটে, কিন্তু ওলাউঠা আরম্ভ হইবার পর যে ইউরিয়া ও ইউরিক্‌য়্যাসিড্‌ রক্তে জমিয়াছে ঐ ইউরিয়া আর ইউরিক্‌য়্যাসিড্‌ নির্গত হইল কোথায়? অতএব মূত্রাশয়ের পূর্ব্বস্থিত প্রস্রাব নির্গত হইলেও ইউরিমিয়ার উপশম হয় না বলা আবশ্যক যে প্রতিবার শরীরে রক্ত সঞ্চালন হইবার সঙ্গে সঙ্গে ইউরিয়া ও ইউরিক্‌য়্যাসিড্‌ সর্ব্বদা রক্তের সহিত মিলিত হয় সুতরাং ওলাউঠা রোগের প্রস্রাব বন্ধ হওয়া পর্য্যন্ত শরীরে রক্ত সঞ্চালনের সহিত রক্তের ক্লেদ্‌ ইউরিয়া ও ইউরিক্‌য়্যাসিড্‌ প্রতিবারই রক্তের সহিত মিলিত হইতেছে। অতএব প্রস্রাব বন্ধ হইয়া রোগী যতক্ষণ বাঁচিয়া থাকে, রক্তের চলাচলের সঙ্গে সঙ্গে রক্তের ক্লেদ্‌ ইউরিয়া ও ইউরিক্‌য়্যাসিড্‌ মিলিত হয়। অতএব প্রস্রাব বন্ধ হইয়া রোগী যত অধিকক্ষণ বাঁচিবে তত অধিক পরিমাণে ইউরিয়া ও ইউরিক্‌য়্যাসিড্‌ রক্তে উপস্থিত হইয়া রক্ত দূষিত করিবে। আর এমত অবস্থায় রোগী প্রস্রাব বন্ধ হইয়া ১২ কি ৪৮ ঘণ্টা বাঁচিয়া থাকিলে ঐ ইউরিয়া ও ইউরিক্‌য়্যাসিডের পরিমাণ ক্রমেই অধিক হইয়া রক্তকে অধিক পরিমাণে দূষিত করিয়া ইউরিমিয়া জন্মায়। মূত্রাশয়ের পূর্ব্বস্থিত প্রস্রাব নির্গত হইলে ওলাউঠায় প্রস্রাব বন্ধ হইবার পর যে ইউরিয়া ও ইউরিক্‌য়্যাসিড্‌ রক্তে আসিয়া মিলিত হইয়াছে তাহা নির্গত হয় না।

আর সেই জন্যই রক্তের ক্লেদ ঐ ইউরিয়া ও ইউরিক্য্যাসিডে রক্ত দূষিত হইয়া ইউরিমিয়া জন্মে।

কিন্তু এ সম্বন্ধে আমার একটু কথা আছে। এরূপ ইউরিমিয়ার অবস্থায় একবার কি দুইবার প্রস্রাব হইয়া ইউরিমিয়ার লক্ষণ উপস্থিত থাকিলে স্বভাবত মনে করিতে পারা যায় বটে যে সে প্রস্রাব পূর্ব্ব হইতেই মূত্রাশয়ে ছিল। অতএব ওলাউঠার জন্য প্রস্রাব বন্ধ হইয়া যে ইউরিয়া আর ইউরিক্ য়্যাসিড্ জন্মিয়াছে তাহার সঙ্গে এ প্রস্রাবের কোন সংশ্রব নাই। কিন্তু মূত্রাশয়ে পূর্ব্বস্থিত প্রস্রাব আর কতই থাকিতে পারে? একবার কি দুইবার প্রস্রাব হইলেই মূত্রাশয়ে পূর্ব্বস্থিত সমস্ত প্রস্রাব নিঃশেষ হইল বলিয়া মনে করা যুক্তি সঙ্গত। কিন্তু আমি দেখিয়াছি যে, রোগী ঘণ্টায় ঘণ্টায় সরা সরা প্রস্রাব করিতেছে, কিন্তু তথাপি ইউরিমিয়ার লক্ষণ সমস্ত উপস্থিত আছে। যাহা চক্ষে দেখিয়াছি তাহার বিপরীত অন্য কথা বিশ্বাস করিতে মন চাহে না। বড় বড় ডাক্তারেরা যাহাই বলুন আমার বোধ হয় যে ঐ রূপ সরা সরা প্রস্রাব হয় বটে, কিন্তু ঐ প্রস্রাবের সঙ্গে ইউরিয়া ও ইউরিক্ য়্যাসিড্ রীতিমত নির্গত হয় না বলিয়া, অত অধিক পরিমাণে প্রস্রাব হওয়া সত্ত্বেও ইউরিমিয়ার লক্ষণ সমস্ত উপস্থিত থাকে। এ সম্বন্ধে নিম্নে যে রোগীর কথা প্রকাশ করিতেছি তাহাতেই সমস্ত কথা ভাল রূপ বুঝা যাইবে।

ঢাকার উত্তর পশ্চিম কাশিমপুরের বাবু শ্যামা প্রসাদ রায় চৌধুরীর ছেলের একবার ঢাকায় ওলাউঠা হয়। ছেলেটীর বয়স তখন ১০ কি ১২ বৎসর। ঢাকা কালেজে পড়িবার জন্য তখন ঢাকা সহরে ছিল। সেই সময় ঐ ছেলেটীর ওলাউঠা

হইয়া ইউরিমিয়া হয়। বাবু পরেশ নাথ মুখপাধ্যায়, একটী হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ছেলেটীর রোগের সূত্রপাত হইতেই চিকিৎসা করিতেছিলেন। পরে ইউরিমিয়ায় ছেলেটীর অবস্থা ক্রমেই মন্দ হইতে আরম্ভ হইল দেখিয়া ছেলেটীর আত্মীয় ও তৎকালে ঢাকা সহরের অভিভাবক, বান্ধব পত্রিকার সম্পাদক, প্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত বাবু কালি প্রসন্ন ঘোষ ছেলেটীর ঐ রূপ অবস্থা দেখিয়া রোগের দুদিনের দিন প্রাতে আমাকে ডাকাইয়া চিকিৎসা করিতে অনুরোধ করেন। ছেলেটীর ঘণ্টায় ঘণ্টায় সরা সরা প্রস্রাব হইতেছে,. তথাপি ইউরিমিয়ার সমস্ত লক্ষণ উপস্থিত। আমি যাইয়া নানা রকম বিবেচনা করিয়া ছেলেটীকে নক্স্ ৩০, প্রথমে ঘণ্টায় ঘণ্টায় দিতে ব্যবস্থা করিলাম। পরেশ বাবুর সহিত এ বিষয় লইয়া আমার বিশেষ মত ভেদ হইল। পরে নানা প্রকার বিতণ্ডার পর স্থির হইল যে, ঐ প্রস্রাব রীতিমত পরীক্ষা করা হউক। পরেশ বাবু কহিলেন যে তাঁহার বিশেষ সন্দেহ হয় এই যে, ঐ প্রস্রাবের সহিত Sugar অর্থাৎ চিনি আছে। আমি কহিলাম "এরূপ অবস্থায় প্রস্রাবের সহিত চিনি বাহির হওয়া এক রকম অসম্ভব।" আমি অনুমান করিলাম যে প্রস্রাবে চিনি বাহির হওয়া দূরে থাক এ প্রস্রাবের Specific gravity একেবারে জলের ন্যায় হইবে। বলা অনাবশ্যক যে, প্রস্রাবে চিনি মিশ্রিত থাকিলে প্রস্রাবের Specific gravity স্বাভাবিক প্রস্রাবের Specific gravity অপেক্ষা অধিক বেশী হয়। যাহা হউক, তৎকালিন ঢাকা কালেজের chemistry র অধ্যাপক বাবু প্রিয় নাথ বসুর নিকট প্রস্রাব একেবারে analyze করিবার জন্য পাঠান হইল। এদিকে ছেলেটীকে প্রাতে,

আন্দাজ ৮টা হইতে নক্স্‌ভমিকা ৩০, বেলা ১১টা পর্য্যন্ত ঘণ্টায় ঘণ্টায় প্রয়োগ করাতে ছেলেটীর অবস্থা ক্রমেই ভাল হইতে লাগিল। তখন ও প্রিয়নাথ বাবুর প্রস্রাব পরীক্ষার ফল পাওয়া যায় নাই। তখন পর্য্যন্ত পরেশ বাবু বলিতেছেন যে, প্রস্রাব বারে কমিল বটে, আর রোগীর অবস্থা ও একটু ভাল দেখা যাইতেছে বটে তথাপি প্রস্রাবে চিনি নিশ্চয়ই আছে, ছেলেটীকে বাঁচান এক প্রকার দুঃসাধ্য। আমি ১১টার সময় যাইয়া ছেলে-টীর ভাল অবস্থা দেখিয়া একটু আশ্বস্থ ও আনন্দিত হইলাম কিন্তু পরেশ বাবুর ঐ কথায় মনটা আবার খারাপ হইয়া গেল। যাহাহউক, মনে করিলাম প্রস্রাবের সহিত যাহাই বাহির হউক, রোগীর অবস্থা যখন ক্রমেই ভাল, তখন বেশী চিন্তিত হইবার কোন কারন নাই। এইরূপে উত্তরোত্তর ইউ-রিমিয়ার অবস্থাটী কাটিয়া রোগীর জ্ঞান ও ক্রমে ক্রমে রোগী সবল হইলে অনেকটা বাঁচিবার সম্ভব তাহার আর সন্দেহ কি? ছেলে-টীর পীড়ার সময় ছেলেটীর মা বাপ কেহই ঢাকায় ছিলেন না। ছেলেটীর এইরূপ সাংঘাতিক বেআরামের উপলক্ষ দেখিয়াই, ছেলেটীর বাবার নিকট কালিপ্রসন্ন বাবু লোক পাঠাইয়াছিলেন। এ সময় পর্য্যন্ত তাঁহারা কেহই আসিয়া পৌছেন নাই। যাহা হউক, আমি এ ছেলেটীকে দেখিয়া বাটী ফিরিয়া আসিলাম। পরেশ বাবু ছেলেটীর বেআরামের সূত্রপাত হইতেই যে রূপ তাঁহাদিগের বাটীতে বসিয়া চিকিৎসা করিতে ছিলেন সেই রূপই রহিলেন। পরে অপরাহ্ন ২টার সময় পুনরায় যাইয়া দেখিলাম ছেলেটী তখন অনেক ভাল। পূর্ব্বেই বলা উচিত ছিল যে, ১১টার পর হইতে ঘণ্টায় ঘণ্টায় আর ঐ ঔষধ প্রয়োগ না করিয়া দুই ঘণ্টা

অন্তর দিতে কহিয়াছিলাম। যাহা হউক আমার সে স্থানে উপস্থিত হইবার ক্ষণকাল পরেই কালেজের একটী চাপরাসী প্রিয়নাথ বাবুর প্রস্রাব একজামিন করিবার ফল লইয়া আসিল। তিনি লিখিয়াছেন "Specific gravity ১০০৩ প্রায় Diabetes Insipidus এর প্রস্রাবের মত। চিনি মোটে নাই, ইউরিয়া ও ইউরিক্‌য়াসিড্‌ ও স্বাভাবিক প্রস্রাব অপেক্ষা কম। প্রিয়নাথ বাবুর প্রস্রাব পরীক্ষার ফল দেখিয়া আমার মনে বড়ই আনন্দ হইল। আমি ও ঠিক ঐ রূপ মনে করিয়াছিলাম। এ সময় ছেলেটীর পিতা, বাবু শ্যামাপ্রসাদ রায় স্বয়ং ও শ্যামাপ্রসাদ বাবুর মাতা আসিয়া পৌছিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে উভয় কালিপ্রসন্ন বাবু ও ছেলেটীর পিতা শ্যামাপ্রসাদ বাবু পীড়ার নিরুপণ জন্য আমার অনেক প্রসংশা করিতে লাগিলেন। যাহা হউক. সে কথা এস্থলে বলা অনাবশ্যক। এখন এস্থলে দেখা উচিত যে রোগীর ব্যাপারটী ঘটিয়াছিল কি? নক্‌স্‌ ভমিকা দিয়া কেন এত উপকার হইল? এস্থলে বলা আবশ্যক যে, Diabetes Insipidus এ মূত্রগ্রন্থির রক্তের শির সকল পরিসরে বড় হয়, আয়তনে বাড়ে, আর আয়তনে বাড়িলেই অধিক পরিমাণে রক্ত সে স্থানে যাইয়া থাকিবার স্থান হয়। অতএব শির সকলের ভিতরে স্বাভাবিক অবস্থায় যত টুকু রক্ত থাকিতে পারে ভিতরের আয়তন বৃদ্ধি হইলে রক্তও বেশী পরিমাণে থাকে আর সেই কারণেই প্রস্রাবের পরিমাণ ও বাড়ে। কারণ রক্ত হইতে প্রস্রাব হয়। আধ পোয়া রক্ত মূত্রগ্রন্থির সমস্ত শিরে থাকিলে যদি একছটাক প্রস্রাব হয়, তবে এক পোয়া আন্দাজ রক্ত ঐ সকল শিরে থাকিলে অবশ্য দুই ছটাক প্রস্রাব তৈয়ার হইবে। অতএব রক্তের পরিমাণ অনুসারে

প্রস্রাবের পরিমাণ কম বেশী হয়। মূত্রগ্রন্থির শির সকলে রক্ত যত বেশী জমে প্রস্রাব ও তত বেশী হয়। আমার বোধ হইল যে, Diabetes Insipidus এ যেরূপ প্রস্রাব বেশী হয় এ ছেলেটীর ও তাহাই ঘটিয়াছে। ছেলেটীর মূত্রগ্রন্থির ধমনী ও শিরা সমস্ত আয়তনে বৃদ্ধি হইয়াছে। প্রতি-ক্রিয়া আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই রক্তের চলাচল শরীরের সর্ব্বস্থানে পূর্ব্বমত হইয়া থাকে। আর যখন রক্তের চলাচল হইতেছে তখন ভিতরের আয়তনে বৃদ্ধি হওয়া শির সকলের মধ্যে অধিক পরিমাণে রক্তও সঞ্চালিত হইতেছে। আর যেরূপ অধিক পরিমাণে রক্ত সঞ্চালিত হইতেছে, সেরূপ অধিক পরিমাণে প্রস্রাবও হইতেছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ওলাউঠার বিষে যেরূপ শরীরের অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিকৃতি জন্মায়, সেইরূপ রক্ত নিজেও এই বিষে এক প্রকার বিকৃত ভাবাপন্ন হয়। আর ইহাও বলা হইয়াছে যে, কোলাপ্‌স্ ও তৎপরে ইউরিমিয়ার অবস্থায় প্রস্রাব নিঃসরণ্ না হওয়া জন্য ইউরিয়া ও ইউরিক্‌য়্যাসিড্ নামক রক্তের ক্লেদ অধিক পরিমাণে রক্তে জমিয়া যায়। অতএব অধিক পরিমাণে ইউরিয়া ও ইউরিক্‌য়্যাসিড্ জমিয়াছে বলিয়াই হউক, রক্তের নিজের বিকৃতি জন্যই হউক, স্নায়ু সমুহের দুর্ব্বলতা জন্যই হউক, স্বাভাবিক অবস্থায় যতটুকু পরিমাণে ইউরিয়া ও ইউরিক্‌য়্যাসিড্ প্রস্রাবের সঙ্গে নির্গত হয়, এ ছেলেটীর প্রস্রাবে তখন তত পরিমাণে ইউরিয়া ও ইউরিক্‌য়্যাসিড্ নির্গত হইতেছে না। সেই জন্যই, ছেলেটীর এত অধিক প্রস্রাব হওয়া সত্ত্বেও ইউরিমিয়ার লক্ষণের বিশেষ উপশম হয় নাই। ডাক্তার হিউজেস্ বলিয়াছেন "Modern experimentation has confirmed

THE DYSENTERY CHARM.

রক্ত আমাশয়ের মন্ত্রপূত ঔষধ।

রক্ত আমাশয়ের এমন চমৎকার ঔষধ পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় দেখা যায় না, বাস্তবিক দুই এক মাত্রা সেবন করিলেই এই সাংঘাতিক পীড়ার মূলচ্ছেদন হইবে, এমন আশু উপকার আর কোন ঔষধে দেখা যায় না, ঔষধ ডাকিলে উত্তর দেয় যদি কোন স্থলে ঠিক হয় সে এই ঔষধ সম্বন্ধে। মন্ত্রে বা ভেল্কীতে যেরূপ অসহ্য কষ্টের একেবারে উপশম হয় এই ঔষধেও সেইরূপ, সেই জন্যই ইহার নাম "রক্ত আমাশয়ের মন্ত্রপূত ঔষধ" দেওয়া গিয়াছে। মূল্য একবাক্স ১৲ টাকা। ডজন ১০৲ টাকা। অর্দ্ধ ডজন ৫।০ টাকা।

ডাক্তার শ্রীকেদার নাথ ঘোষ।

২৮ নং দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট, দর্জিপাড়া, কলিকাতা।

DR. ROBINSON'S

PANCREATIC POWDER.

অম্লপিত্ত রোগের অমোঘ ঔষধ।

(এই ঔষধটী অম্লরোগের একটী চমৎকার ঔষধ)

ইহাতে অসহ্য যন্ত্রণা আশু নিবারণ হয় ও কিছুদিন নিয়মিত সেবন করিলে অম্লরোগের মূলোৎপাটন হইয়া যে[illegible] পূ[illegible]রূপ সুস্থ হয়। মূল্য প্রতি কৌটা ১।০ টাকা, ডজন ১[illegible]৲ টাকা, অর্দ্ধ ডজন ৮।০ টাকা। ডাকমাশুল পৃথক।

পুস্তক খানি প্রকাশ করিতেছি। ইহাতে য়্যালপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, ইনানি, হাকিমি, আয়ুর্ব্বেদীয় কবিরাজী, গৃহিণী গুর্ব্বিণীদের টোট্‌কা ঔষধ, সংক্ষেপে সমস্ত বর্ণিত আছে। ইহাতে ঔষধ আবশ্যক অনাবশ্যক না বিবেচনা করিয়া ঔষধের সংখ্যা বাড়ান হয় নাই। প্রকৃত পক্ষে যে গুলি উপকারী তাহাই লিখা হইয়াছে।

প্রতি খণ্ড ১৲ এক টাকা। প্রথম খণ্ড প্রকাশ হইয়াছে মূল্য ১৲ টাকা। ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র। পরের খণ্ড মাসে২ প্রকাশ হইবে।

ঢাকার নবাবের ভূতপূর্ব্ব ফ্যামিলি

ডাক্তার শ্রীকেদারনাথ ঘোষ।

২৮ নং দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট, দর্জ্জীপাড়া, কলিকাতা।

চিকিৎসা-সংগ্রহ।

ইহাতে রোগের উৎপত্তির কারণ, লক্ষণ, নিদান ইত্যাদি সমস্ত আছে। ইহা সওয়ায় সাধারণের সুবিধার জন্য ডাক্তার ৺দুর্গাচরণ বন্দোপাধ্যায়, ডাক্তার ৺এড্‌ওয়ার্ডগুডিভ্, ডাক্তার ৺গুডিভ্ চক্রবর্ত্তী ও বিলাত ও এখানকার অনেকানেক প্রধান প্রধান ডাক্তারের প্রায় ১ হাজার পৃস্ক্রপ্সন প্রত্যেক ঔষধের মাত্রা সহিত উদ্ধৃত করা হইয়াছে। এবং কোন রোগের স্থলে কোন পৃস্ক্রপ্সন খানি ব্যবহার করিতে হয়, তাহাও রোগের লক্ষণ বিবেচনা করিয়া উপযুক্ত স্থানে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। এই পুস্তক একখানি হাতে লইয়া রোগীর নিকটে বসিয়া ঐ সমস্ত পৃস্ক্রপ্সন অনুযায়ী ঔষধ প্রয়োগ করিয়া একজন আনাড়িতেও সমস্ত রোগের চিকিৎসা করিতে পারে। ইহাতে কোন ডাক্তারের উপদেশের আবশ্যক নাই। ভাষাও এত সরল ও রোগের লক্ষণ পরে পরে এরূপ করিয়া লিখা আছে যে, বোধ হয় যেন কোন উপদেষ্টা চিকিৎসক রোগী ও পাঠকের নিকটে বসিয়া প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দিতেছেন যে কোন অবস্থায় কোন ঔষধটী দিতে হয়। পুস্তক দুই খণ্ডে

[illegible] যুক্ত একত্রে [illegible]
[illegible] পাওয়া [illegible]
[illegible] টাকা [illegible] যাইবে। [illegible]
[illegible] প্রকাশ হইতে [illegible] রাজার [illegible]
[illegible] হইবে। [illegible]

ওলাউঠা।

ওলাউঠার [illegible]
[illegible] অতি সরল ভাষ [illegible]
[illegible] জন্য চিত্র [illegible] রোগীর [illegible]
[illegible] হইয়াছে [illegible] পুস্তক [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] ও [illegible]
[illegible] মত [illegible]
[illegible] সন্নিবেশিত [illegible]
ওলাউঠার [illegible]
যদি ওলাউঠার [illegible]
[illegible] ইহা [illegible] কোন [illegible]
[illegible] চিকিৎসার সুবিধার জন্য পুস্তকের [illegible]
[illegible] বিক্রয়ার্থে [illegible]
[illegible] যায়।

[illegible] ডাক্তার [illegible]

শ্রী কে [illegible] নাথ ঘোষ

[illegible] নং [illegible] ষ্ট্রীট, [illegible] কলিকাতা।